সাগরময় ঘোষ

প্রিয়বরেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

কিছু গোয়ালার গলি (২য় সংস্করণ)

নানা রঙের দিন (২য় সংস্করণ)

শ্রেষ্ঠ গল্প

চীনে মাটি

শুকসারী

পারাবত

২৩

হয়ত মত বদলাত অতসীর। আদিত্যের পক্ষত্যাগে তার বিশেষ দ্বিধা হবার কথা নয়। সে তো চাকরি ছাড়তেই প্রস্তুত ছিল। কেতকীর কাছে সে তার রুক্ষ দিকটাই উন্মোচন করেছিল, কিন্তু সেও বুঝি অভিনয় মাত্র। মনে মনে এই অসহায় ভীরু মেয়েটিকে ভাল না বেসে পারেনি। আহা, এখনও ঝড়-ঝাপটা খায়নি, আকাশে কালো মেঘ দেখেই ভয় পেয়েছে। সবে জলে নেমেছে, এখনও লোনা জল পেটে যায়নি, দূরে বড় ঢেউ দেখেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেছে অতসীকে। হায়রে, সারা জীবন যার হাবু-ডুবু খেয়ে কেটেছে, তার কাছেও কিনা একটি অনভিজ্ঞ কুমারী ভরসা খোঁজে, আশ্রয় চায়।

কেতকী কেঁদেছিল। টপ টপ কয়েক ফোঁটা জল, অতসীর করপল্লবে এখনও তার উষ্ণ স্পর্শ টুকু লেগে আছে। তার নিজের জীবনে কোন স্বপ্নকুঁড়ি ফুল হয়নি, হয় ঝরেছে, নয় শুকিয়েছে, কেতকীরও কি তাই হবে। এই একটি লক্ষণ দিয়েই অতসী কেতকীকে তার নিজের দলের ব'লে চিনতে পারল। এক ধরনের ভাগ্যবিড়ম্বিত মেয়ে আছে, তাদের বলে মৃতবৎসা। অতসী-কেতকীরাও তাই, হয়ত অন্য অর্থে, যাদের সব কামনা, বাসনা, কল্পনা আর আশার শিশুরা চোখ মেলবার আগেই, ছোট ছোট হাত-পা তুলে খেলা শুরু করবার আগেই, আঁতুড়েই মরে।

যে-মুহূর্তে কেতকীকে অতসীর আপন মনে হল, অমনিই করুণার কুয়াসা কোথা থেকে এসে যেন তার চিত্ত ঢেকে দিল। কেতকী আর সে তো আলাদা নয়, সে-ই কেতকী, কেতকীই অতসী। নাই বা হ'ল সে নিজে সুখী, কেতকী হোক। সুখী হোক, পরিপূর্ণ হোক, সুন্দর হোক, প্রার্থনার মত ক'রে বার বার মনে মনে উচ্চারণ করল অতসী, একটা পূত অনুভূতি কণা কণা জল হয়ে চোখের পাতা ছাপিয়ে পড়ল। চির-অতৃপ্ত, বঞ্চিত একটি মেয়ে তার সুখ-

কুঠুরির চাবি খুঁজে পেয়েছে। তারই মত আরেকজনের মধ্য দিয়ে, তার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে, সে সার্থক হবে। অনেক, অনেকদিন পরে অতসী অলক্ষ্য বিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করল, তার সব কেড়ে নিয়েছেন, একটুখানি বাকি রেখেছেন তবু। করুণা। পরের জন্যে এখনও চোখে জল আনতে পারে অতসী, এই ক্ষমতাটুকুই বা কম কী। এটুকুও খোয়ালে বেঁচে থাকাটা একেবারেই মিছে হয়ে যেত।

শশাঙ্কর জন্যে অতসীর ভাবনা নেই। দায়িত্বজ্ঞানহীন তার এই ভাইটি, বরাবরই পরিবার সম্পর্কে উদাসীন। যতদিন বাবা ছিলেন, ততদিন বিশেষ সমস্যা ছিল না। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, কলেজের খাতায় নাম উঠেছে, সে একটু-আধটু পলিটিক্স বা দেশোদ্ধার করবে বৈকি। শশাঙ্ককে বাড়ির সকলে একটু প্রশ্রয়ের চোখে দেখত। আহা, করুক, যে ক'দিন বাবা বেঁচে আছেন। সময়মত শুধরে গেলেই হল। বড়লোকের ছেলের চরিত্রদোষ ঘটেছে শুনলে পাড়ার মুরুব্বিরা যে-স্বরে বলেন, 'বিয়ে দিন, ঠিক হয়ে যাবে', এ-ও কতকটা তাই।

বাবা মারা গেলেন, শশাঙ্কর তবু মতি ফিরল না। আগে তবু ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরত, এখন তাও ছেড়ে দিল। অথচ পলিটিক্সেও শশাঙ্ক সুবিধে করতে পারেনি। ও ছিল সেই জাতের কর্মী, যারা দাদাদের ছাতাটা ছড়িটা ধরতেই অভ্যস্ত, সেই ছড়ির মাথা কবে সোনাবাঁধান হয়ে গেছে লক্ষ্য করেনি।

বাবা মারা যাবার পর একদিন কোথা থেকে এসে উদয় হল, বলল, কিছু টাকা দাও তো। বিজনেস্ করব। মা'র ইচ্ছে ছিল না, তবু ভয়ে ভয়ে কিছু টাকা দিয়ে দিলেন। কী বিজনেস্ কেউ জানল না, লাভ হল, না লোকসান তাও না। ওদিকে সংসার খরচে একটি একটি করে টাকা কমছে। মা প্রমাদ গণলেন। অল্প-স্বল্প যা কিছু জড়ো করে অতসীকে বিয়ে দিলেন। শশাঙ্ককে বললেন, 'এবার তুই একটা চাকরি নে।'

শশাঙ্ক বলল, 'রোসো, নিচ্ছি।'

শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে এসে অতসী দেখে, সব বদলে গেছে। সংসারে হাঁড়ি চড়া দায়, কিন্তু সেটাই একমাত্র পরিবর্তন নয়। একটাও আস্ত শাড়ি নেই, মা'র গায়ে ছেঁড়া-ময়লা ন্যাকড়া উঠেছে—তাও নয়। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ঘটেছে মা'র অন্তরে। এই কি সেই মা, যিনি একবার, অতসীর বড় একটা অসুখের সময়, ওর শিয়রে সমানে সাতদিন বসে ছিলেন? খাওয়া না, নাওয়া না, শেষ পর্যন্ত ফিট হয়ে পড়েছিলেন নিজে? অতসী সুখী হবে ব'লে সর্বস্ব বাঁধা রেখে তাকে বিয়ে দিয়েছিলেন?

অল্প বয়স থেকে বার বার অতসী মন্ত্রের মত আবৃত্তি করেছে, ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসম গুরু—সেই মন্ত্রে বিশ্বাস টলে গেল।

শুধু তো দু' বেলা দু' থালা ভাতের অভাব, তাই কি এত বদলে দেয় মানুষকে।

মাকে অতসী একদিন বলল, 'আমি চাকরি করব।'

মারও মনের কথা বোধ হয় তাই। বললেন, 'কর।'

বয়স হবার পর থেকে চোখে-চোখে যাকে রেখেছেন, নীলাদ্রির সঙ্গে সিনেমা দেখে ফিরতে একদিন রাত হয়েছিল বলে যাকে নির্মমভাবে মেরেছিলেন, সেই অতসী স্কুলের কাজ সেরেও বাড়ি ফেরেনি, তবু কিছু বলেননি মা। খুশীখুশী গলায় বলেছেন, 'তোদের সেক্রেটারি তোকে এম্পায়ারে নাচ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল,—বলিস কী। অন্য মাস্টারনীদের চোখ টাটায়নি?'

জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে শ্রান্ত গলায় অতসী বলেছে, 'টেরই পায়নি আর কেউ।'

একটা লোভের সাপ ছোবল তুলেছে মা'র চোখে, স্পষ্ট অনুভব করেছে অতসী। মা এগিয়ে এসে ওর মাথায় হাত রেখেছেন, আশীর্বাদের গলায় বলেছেন, 'তোর উন্নতি হবে দেখিস।' সেই স্পর্শে অতসীর অশুচি মনে হয়েছে নিজেকে। এক পো ক'রে দুধ বরাদ্দ হয়েছে অতসীর, দোকান থেকে মা নিজে ওর জন্যে পছন্দ করে শাড়ি এনেছেন, প্রসাধনের সরঞ্জামও। অতসী

আপত্তি করলে বলেছেন, 'আহা, এ-সবের দরকার হবে বৈকি। কী-ই বা এমন বয়স তোর।'

দুধের স্বাদ তিতো হয়ে গেছে, গ্লাসটা মুখের কাছ থেকে নামিয়ে রেখেছে অতসী। মাইনে বেড়েছে বৈকি, পরের মাসেই বেড়েছে। খুশীতে ছোট খুকিটির মত মাকে সারা বাড়ি ছটফট করে বেড়াতে দেখে অতসীর গায়ে কাঁটা দিয়েছে। পাল্লার একদিকে নীতিবোধ, শুচিতা, সন্তানের কল্যাণ, আরেকদিকে গোটাকতক কাগজের নোট,—জীবনের মূল্যনিরূপণের মান কি এই, শুধু এই!

এই, শুধু এই। নইলে হাসিমুখে মা ওকে আদিত্য মজুমদারের সঙ্গে গিরিডি যেতে দিতেন না। শাড়ি ব্লাউজ স্নো-পাউডার মা নিজ-হাতে স্যুটকেসে তুলে দিচ্ছিলেন, অতসী চোখের জল লুকোতে মুখ ফেরাল। চকিত হয়ে মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাঁদছিস যে।' আঁচলে চোখ মুছে হাসল অতসী। —'কই কাঁদছি না তো। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি যাবার দিনে তুমি আমার বাক্স গুছিয়ে দিয়েছিলে, মনে আছে, মা? আজও দিচ্ছ। দুটোর মধ্যে মিল বেশি, না তফাৎ বেশি, ভাবছি।'

মা রাগ করলেন।—'তোর যত সব বাঁকা-বাঁকা কথা।'

অতসী আর প্রশ্ন করেনি। ধীরে ধীরে তৈরি করেছে নিজেকে। পূজার ফুল যেমন নদীর জলে লোকে ভাসিয়ে দেয়, তেমনি ভাসিয়ে দিয়েছে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, ভয়, বিবেক, কোমলতা, সন্দেহ। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফুলগুলি স্রোতের টানে ভেসে গেছে, ঘাটে ব'সে নির্নিমেষ, নির্বিকার চোখে দেখেছে অতসী।

আরতীর সবটুকু সুরভিত ধূপ উপে গিয়ে অঙ্গারের মত শুধু দাহ, শুধু জ্বালা, শুধু ছাই তখন অবশিষ্ট আছে।

সেদিন কেতকী যাবার আগে প্রণাম করবে ব'লে ওর পায়ের পাতা ছুঁতেই চোখে জল এসেছিল অতসীর। সব তো তবে যায়নি, ভাসিয়ে দেওয়া ফুলগুলির কয়েকটি বুঝি আবার উজান ব'য়ে ঘাটে এসে লেগেছে।

শশাঙ্কর জন্যে নয়, কেতকীর মুখ চেয়ে অতসী হয়ত মত বদলাত, যদিনা 'জনদর্পণ' সম্পাদক জীবনতোষ ওকে হঠাৎ ডেকে পাঠাতেন।

বাড়ি ফিরে অতসী সেদিন স্লিপ পেল। জীবনতোষ বিশেষ প্রয়োজনে পরদিন ওকে বেলা দশটায় অফিসে দেখা করতে বলেছেন।

আবার সেই 'জনদর্পণ' অফিস, কিন্তু এবারে আর অতসীর পা কাঁপেনি, সোজা উঠে এসেছে ওপরে, এমন কি স্লিপ না দিয়েই সম্পাদকের কামরার কাটা-দরজা ঠেলেছে।

জীবনতোষ আজও চুরুট টানছিলেন, তবে হাতে কলম নেই, টেবিলে কাগজপত্রের স্তূপ, দু' পেয়ালা গরম চা পাশের দেয়ালে অলস-মলিন ধোঁয়ার আল্পনা আঁকছে।

দু' পেয়ালা চা, কেননা ঘরে দ্বিতীয় এক ব্যক্তি ছিল। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে জীবনতোষ তাঁর সঙ্গে ফিস্ ফিস্ ক'রে কী বলছিলেন, কাটা-দরজার কব্জায় শব্দ হ'তেই চকিত চোখ তুললেন, উষ্ট্রবৎ প্রলম্বিত কণ্ঠ সংবরণ ক'রে চেয়ারের পিঠের কাছে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'আসুন।'

টেবিলের সামনে আর একটিমাত্র আসন, আগন্তুকের পাশেই। অতসীকে সেখানেই বসতে হ'ল।

আগন্তুককে দেখিয়ে সম্পাদক বললেন, 'এঁকে চেনেন?'

অতসী এক্ষেত্রে ভদ্রতার কোড যা বলে, অর্থাৎ না-জানাটা যেন অপরাধ, এমনভাবে মাথা নাড়ল।

'প্রভাত মল্লিকের নাম শুনেছেন?'

'শুনেছি।'

অতসী প্রথামত হাত তুলে নমস্কার করল, প্রভাত মল্লিকও করলেন। অতসী বিব্রত বোধ করল, আদিত্য মজুমদারের এই এক নম্বর শত্রুর মুখোমুখি বসতে হবে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি!

প্রভাত মল্লিকের বয়স যতটা অনুমান করেছিল তার চেয়ে কম, হয়ত ত্রিশের কোঠায়। মাথাটাকে একটি টেড়ি ঠিক সমান দু'ভাগে ভাগ করেছে, দু' পাশে ঢেউয়ের পর ঢেউ কুঞ্চিত কেশদাম। ধবধবে ফরসা হাতের নিচে নীল কয়েকটা স্পষ্ট রেখা—অভিজাতদের এই জন্যেই বুঝি

নীল রক্ত বলে। চওড়া কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটার ফিতে সোনার, ডিবেটা হয়ত মহার্ঘতর কোন ধাতুর, পাশে-রাখা ছড়িটাকে আলগাভাবে স্পর্শ করে আছে দু'টি আঙ্গুল, সে দু'টিতে দামী পাথরের ঝিকমিক। বড়লোকদের চোখে অতসী এক সময়ে দেখেছে সোনা-ফ্রেম চশমা, এখন বুঝি ফ্রেম না-পরাটাই দস্তুর। ফিনফিনে পাঞ্জাবীর হাতা কনুইয়ের কাছে উঁচু হয়ে উঠেছে, অতসীর বিশ্বাস, আস্তিন সরালে ওখানে গুটিকয় মন্ত্রপূত কবচের সন্ধান পাওয়া যাবে।

মসৃণ একটি কেস থেকে প্রভাত সিগারেট বার করলেন, একটা বাড়িয়ে দিলেন জীবনতোষের দিকে, জীবনতোষ নিলেন না, বললেন, 'চুরুটের নেশা যে পেয়েছে, এসব জোলো জিনিসে সে সুখ পায় না।'

'খেজুরগুড়ের পাটালির পাশে চকোলেট?' খুব একটা বাহাদুরির উপমা হয়েছে ভেবে প্রভাত মল্লিক নিজেই হাসলেন, সিগারেটটা ধরিয়ে বললেন, 'কী দেখছেন বলুন তো। খবরের কাগজে আমার এমন পরিপাটি ছবি ছাপা হয়নি,—তাই?'

'আপনার ছবি আমি দেখিনি', অতসী বলল।

'ছবি দেখেননি? বলেন কী। আদিত্য মজুমদারের ওখানে আমার কুশ-পুত্তলিকা দাহ পর্যন্ত হয়েছে শুনেছি, আর আপনি ছবিও দেখেননি?'

অতসী দৃঢ়স্বরে বলল, 'না।'

প্রভাত কিছুক্ষণ অপ্রতিভের মত বসে রইলেন, হাতটা অকারণেই নাড়ালেন, বোধহয় পরখ করলেন আলোর সমুখে, ঠিক কীভাবে ধরলে আঙ্গুলের হীরেগুলো ঝিলিক দেয়।

সম্পাদকের দিকে চেয়ে অতসী বলল, 'কেন ডেকেছেন এখনও বলেননি।'

জীবনতোষ অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে চাইলেন প্রভাত মল্লিকের দিকে, প্রভাত ছড়িটা বার দুই মেজেয় ঠুকলেন। সিগারেটে জোর টান দিলেন, বোধ হয় আত্মপ্রত্যয় ফিরে পেতে, বললেন, 'জীবনবাবু নন, অতসী দেবী, আপনার সঙ্গে

দেখা করতে আমিই চেয়েছি। আমি এবার ইলেকশনে নেমেছি, এটুকু বোধ হয় জানেন?'

'জানি।'

'আমাদের পরিবারের কথাও শুনেছেন?'

'বিশেষ কিছু না, শুনেছি খুব প্রাচীন'—

প্রভাত হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, সেই জব চার্নকের আমল থেকে। আমার পূর্বপুরুষেরা গত শতাব্দীতে কলকাতার সমাজপতি ছিলেন। বাংলা থিয়েটার, বাংলা সাহিত্য—আজকাল আপনারা যাকে সংস্কৃতি বলেন—তার প্রতিটি আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষণ করেছেন, উনিশ শতকের যে-কোন ইতিহাসের পাতা ওল্টালেই দেখতে পাবেন।' ছাই ঝেড়ে উদাস ধোঁয়া ছড়িয়ে প্রভাত বললেন, 'সংস্কৃতিটা এখন আর আমাদের হাতে নেই অতসী দেবী, ওখানে এখন প্লীবিয়ান অল্পবিত্তরা মুরুব্বিয়ানা করছে,—বার ভূতের রাজত্ব। আমি····· আমি তাই রাজনীতিতে নেমেছি; এখানে হয়ত আমাদের কিছু আশা আছে।'

অতসী কিছু বলে কিনা দেখে নিয়ে প্রভাত মল্লিক ফের বললেন, 'আমি একেবারে সেকেলে, দশ শালা বন্দোবস্তের আমলের জমিদার বাবুটি আছি ভাববেন না। শোনেননি, পৈতৃক প্রাসাদ ভেঙে হালফ্যাসানের ম্যানসন করেছি। বাগানবাড়ি তুলে দিয়ে সেখানে তুলেছি ছোট ছোট ফ্ল্যাট, শস্তার কলোনি। আস্তাবলে চাবি দিয়ে কিনেছি শেষ-মডেলের মোটর, এককথায় এ-কালের সঙ্গে সন্ধি করতে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। এখন আমার প্রশ্ন এ-কাল আমাকে নেবে কিনা।'

কিছু একটা বলতেই হয়, তাই অতসী বললে, 'আপনার সন্দেহ আছে নাকি।'

প্রভাত বললেন, 'আছে, যুগটাই যে ইতর জনের অতসী দেবী। নইলে, নইলে আদিত্য মজুমদারের মত লোক আমার সঙ্গে যুঝতে ভরসা পায়।' বলতে বলতে কেমন একটা উত্তেজনা এল প্রভাত মল্লিকের কণ্ঠে, হিংস্রভাবে

ছড়ি দিয়ে মেজেয় ঘা মেরে বললেন, 'আপনি জানেন, আদিত্যর ঠাকুরদা আমাদের সেরেস্তায় খাতা লিখে খেত?'

'জানি না।' প্রতিষ্ঠাপিপাসু অভিজাতনন্দনটির উত্তেজনা লক্ষ্য করে অতসী কৌতুক বোধ করল।

'জানেন না, আপনি অনেক কিছুই জানেন না। আপনাকে কিছু কিছু জানাব বলেই ডেকে এনেছি। আদিত্য নিজেকে প্রচার করছে ত্যাগী দেশকর্মী বলে। আপনি জানেন, আদিত্য শেষবারে বণ্ড লিখে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিল?'

অতসী বলল, 'বামপন্থীরা তাই রটায় বটে।'

বিদ্রূপের সুরে হেসে উঠলেন প্রভাত। 'আদিত্যর প্রতি আপনার নিষ্ঠার প্রশংসা করি অতসী দেবী। কিন্তু আদিত্যর প্রতি যারা বাম, তারাই বামপন্থী, আপনার এই যুক্তি মেনে নিতে পারলাম না।' আয়েস করে আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে প্রভাত বললেন, 'সাধে কি আদিত্যকে হিংসে করি অতসী দেবী। নেহাৎ আমার কুলজ্যোতিষী কোষ্ঠী বিচার করে পরামর্শ দিয়েছেন, নইলে আমি এই অসম সমরে নাবতুমই না।'

'অসম সমর বলছেন কেন?'

'অসম নয়তো কী। কর্মী কোথায় আমার। টাকা ছড়ালে কিছু লোক পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আপনার মত নিঃস্বার্থ কর্মী কোথায় পাব বলুন। আমার লোক নেই অতসী দেবী, বিশেষ, মেয়ে ভোটারদের মধ্যে কাজ করবার মত লোক একেবারে নেই।'

'দু একজনকে এ-কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন বললেন না?' জীবনতোষ এতক্ষণ কথা বলেননি, এবারে মুখ খুললেন।

'দিয়েছি তো'। অসন্তুষ্ট কণ্ঠে প্রভাত বললেন, 'আমার নায়েবের সুপারিশে তারা বাড়িউলিকে এ-কাজে লাগিয়েছি। কিন্তু কী-জানেন জীবনবাবু, ওসব হল একেবারে ফেল-কড়ি-মাখ-তেল ব্যাপার। তা-ছাড়া, তারা হল অন্য টাইপের মেয়েমানুষ। সব সার্কেলে যেতে পারে না তো।

সেখানে অন্যরকম পোজ চাই।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রভাত মল্লিক বললেন, 'ভদ্রঘরের কর্মী আমি একটিও পাইনি।'

তারা বাড়িউলির সঙ্গে তার তুলনার খোঁচাটা অতসীর গায়ে লেগেছিল, সে চোখমুখ লাল করে বসে রইল।

সম্পাদকও বোধ হয় অস্বস্তি বোধ করছিলেন। বললেন, 'ওসব থাক। মিস মিত্রকে আপনি কাজের কথাটা এখনও বলেননি প্রভাতবাবু।'

'বলব, এইবারে বলব।' টিপে টিপে পিঁপড়ে মারার মত করে প্রভাত ছাইদানীতে হাতের সিগারেটটা নেবালেন। এতক্ষণ কণ্ঠ ভাবালুতায় আর্দ্র হয়ে এসেছিল, হঠাৎ চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না মিস মিত্র, আপনাকে সোজাসুজি একটা প্রশ্ন করছি। আদিত্য মজুমদার আপনাকে কত টাকা দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে?'

একেবারে সামনাসামনি আঘাতে অতসীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। কোন-মতে সামলে বলল, 'কোন কথা হয়নি তো,—মানে,—'

অবিশ্বাসী গলায় প্রভাত মল্লিক বললেন, 'বলেন কী। একেবারে বিনে মাইনে, শুখো কাজ। দেশের কাজে বেগার খাটছেন,—নাকি?'

অতসী বলতে গেল 'বেগার নয়,' কিন্তু কী ভেবে কিছুই বলল না, চুপ করে রইল। টাকা নয়, কিন্তু আদিত্য তাকে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেটা এদের বলা যাবে না কিছুতে।

প্রভাত গম্ভীর গলায় বললেন, 'টাকার পরিমাণটা জানতে চাই না। এই পরিশ্রমের বিনিময়ে আদিত্য আপনাকে নিশ্চয়ই পুরস্কৃত করবে কথা দিয়েছে। কিন্তু অতসী দেবী, আমাদের অফারটা যদি মেনে নেন, তবে, তবে হয়ত আমরা আপনাকে ঢের বেশি দিতে পারি।'

তীব্রস্বরে অতসী বলে উঠল, 'মানে?'

প্রভাত বললেন, 'ব্যস্ত হবেন না, বলছি। অতসী দেবী, আপনার কাছে আমরা কয়েকটা খবর চাই।'

'কী খবর।' অতসী রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করল।

ওর দিকে এক নজর চেয়ে প্রভাত বললেন, 'রাজী আছেন তা হলে। ছাটস্ এ রীজনেবল্ এ্যাটিট্যুড। আদিত্যর অনেক দুষ্কৃতির কথা লোকের কানে গেছে। কিন্তু সেসব শুধু গুজব, ছাপলে মানহানি। আমরা কিছু প্রমাণ চাই—ডকুমেন্টারী এভিডেন্স।'

'প্রমাণ, কিসের প্রমাণ।' জালে জড়িয়ে পড়া প্রাণীর মত পাণ্ডুর অতসীর মুখ, অসহায় আর্তস্বর।

'সুবিধে পেয়ে কত পার্টনারকে ফাঁকি দিয়েছে আদিত্য, কোন ব্যাঙ্কে লাল-বাতি দিতেও কাউকে বাকি রাখেনি। তা ছাড়া কত মেয়ের সর্বনাশ—'

ভীত, ত্রস্ত, দ্রুত কণ্ঠে অতসী বলে উঠল, 'আমি এসব কিছুই জানি না।'

সম্পাদকের ইঙ্গিতে প্রভাত মল্লিক এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল বাড়িয়ে দিলেন অতসীর দিকে। অতসী অভ্যাস বশে অন্যমনস্কভাবে সেটা তুলে নিল, কিন্তু ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করল শুধু।

প্রভাত মল্লিক ধীরে ধীরে বললেন, 'জানেন, কিন্তু জানাবেন না। ভুল করছেন অতসী দেবী। আগেই বলেছি, আমরা উপযুক্ত মূল্য দিতে রাজী আছি।'

'মূল্য ?' শ্রান্ত, বিবশ অতসী শুধু একটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারল।

প্রভাত বললেন, 'মূল্য! নথি, প্রমাণ, বিবরণ আমাদের হাতে তুলে দিন, আমি আপনাকে পাঁচশো টাকা দেব।'

অতসী বলল, 'না।'

'সাতশো টাকা—হাজার ?'

দৃঢ়স্বরে অতসী বলল, 'না।'

'তবে দু' হাজার ? হেলায় সুযোগ হারাবেন না অতসী দেবী।'

'না, না, না।' স্থানকাল ভুলে চীৎকার করে উঠল অতসী, দৃঢ়তর কণ্ঠে বলল, 'টাকা নিয়ে কলঙ্কের বেচা-কেনা আমি করি না।' তারপর বিমূঢ়, স্তম্ভিত প্রভাত মল্লিক বাধা দেবার আগেই উঠে দাঁড়াল।

অপ্রতিভ মুখের রেখা ক'টিকে ঢাকতে সম্পাদক চুরুট ধরালেন, সামনেই

টেবিলের উপর কেস, তবু প্রভাত মল্লিক এ-পকেট ও-পকেটে সিগারেট খুঁজলেন, না পেয়ে দেশলাইয়ের একটা কাঠি নিয়ে মাথা নিচু করে বারুদটাই ভাঙলেন।

অতসী দরজা পর্যন্ত এগিয়েছিল, প্রভাত মল্লিকও উঠে দাঁড়ালেন, একবার মনে হল অতসীর পথ রোধ করবেন বুঝি। কিন্তু সেসব কিছু না, হাত নেড়ে নেড়ে প্রভাত ধীরে ধীরে শুধু বললেন, 'খুব ভুল করলেন, খুব ভুল করলেন। হয়ত কোনদিন এ-কথা বুঝবেন। আদিত্য মজুমদারকে আজ পর্যন্ত যে বিশ্বাস করেছে, সেই ঠকেছে অতসী দেবী।'

আদিত্য শুনে বললেন, 'ক্রিমিনাল। এই গ্যাংস্টারিজমের শোধ আমি নেব। ওদের পুলিশে দেব।'

অতসীর শরীর এখনও ঠকঠক কাঁপছে, ম্লান হেসে বলল, 'ওরা কিন্তু আপনাকেই পুলিশে দিতে চাইছে।'

'চাইছে, কিন্তু পারেনি। পারবে না। কোন প্রমাণ ওদের হাতে নেই।' আদিত্যর কণ্ঠ গাঢ় হয়ে এল, একটি বেপথু দেহকে দুহাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিলেন, কানের কাছে মুখ নিয়ে লতিতে প্রায় ঠোঁট ছুঁইয়ে বললেন, 'ওদের হাতে প্রমাণ তুমি তুলে দাওনি। এ-কথা কখনও ভুলব না অতসী। উপকারীকে আদিত্য মজুমদার ভোলে না।' রুদতীর মুখ থেকে সিক্ত কয়েক গাছি চুল সরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'এই কুৎসিত নাটকটা শেষ হতে দাও। তারপর নতুন জীবন রচনা করব। সেদিন, আমার কামনা আর কিছু নয়, শুধু আমার পাশে থেক, অতসী।'

২৪

টক, টক, টক।

ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসল সুধা, তরতর করে নিচে নেমে বলল, 'কে।'

জবাবে আরও তিনবার অঙ্গুলিসঙ্কেত শুনল। ছিটকিনি খুলে সুধা সরে দাঁড়াল। ভিজে বর্ষাতিটি খুলতে খুলতে নিশীথ বলল, 'চিনতে পারছ না?'

সুধা অস্ফুট গলায় বলল, 'আপনি।'

নিশীথ বলল, 'সশরীরে। তোমার চিঠি আমি কাল পেয়েছি। কলকাতা ছিলাম না। ফিরে এসে দেখি প্রিমিয়ম নোটিশ, মেডিকেল জার্নাল, চাঁদার রসিদের নিচে চাপা—তোমার চিঠি।'

'চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন। ভেতরে আসুন।'

আকাশের দিকে চেয়ে নিশীথ বলল, না, বৃষ্টি আর নেই। অকালে কী উৎপাত বল দেখি। আকাশে মেঘ দেখে ভাগ্যিস ওয়াটারপ্রুফটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম। যাক, ডেকেছ কেন।'

সুধা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করল, 'নিশীথবাবু, নূপুর কোথায়।'

'নূপুর নূপুর?' এমনভাবে নিশীথ নামটার পুনরাবৃত্তি করল, যেন সুধা একটা দুর্বোধ্য সঙ্কেত-শব্দ উচ্চারণ করেছে।

কিন্তু সুধা শুনল না, না-ছোড় হয়ে জিজ্ঞাসা করতে থাকল, 'সত্যি করে বলুন নিশীথবাবু, নূপুরেরা কোথায়।'

তবু ধরা দিল না নিশীথ, অল্প অল্প হেসে বলল, 'কেন, এখানে নেই?'

'নেই সে তো আপনিও জানেন।' অসহিষ্ণু গলায় সুধা বলে উঠল, 'মিছিমিছি আপনি লুকোচ্ছেন নিশীথবাবু, আপনি আমাকে ভোলাতে চাইছেন। দেখছেন না আমি আর সেই খুকিটি নই।'

কয়েক মাস আগেকার তুলনায় এখন অনেক রোগা সুধা, কিন্তু ঢের লম্বা হয়েছে। পাণ্ডুর কপোল আর নীরক্ত নীল চোখের তারায় এসেছে পরিণত শ্রী। সেই কৃশ-সুন্দর দেহভঙ্গিমার দিকে বিমোহিত চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে নিশীথ শুধু বলল, 'দেখছি।'

সুধা বুঝল না, অবুঝ কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'কী দেখছেন।'

'তুমি আর খুকিটি নও।'

পাণ্ডুর মুখ ভরে রক্ত ছড়িয়ে পড়ল, সুধা রাগ দেখাতে গিয়ে এক ঝলক হেসে ফেলল, সেই হাসি লুকোতে নিচু করতে হল চোখ। নত-বিব্রত মুখখানিকে দেখে নিশীথের মনে হল ছুঁতে গেলে গুটিয়ে যায়, এ যেন সেই লতা।

ব্রীড়াবীর ছড়ান মুখ কিছুক্ষণ পরে তুলে সুধা বলল, 'কই, বললেন না, নূপুরেরা কোথায়?'

নিশীথ বলল, 'আমি বুঝি শুধুমাত্র ডাক হরকরা সুধা, সকলের খবর বয়ে নিয়ে বেড়াই? কই, আমার খবর তো জিজ্ঞাসা করলে না তুমি?'

সুধা বলল, 'কী আবার জিজ্ঞাসা করব, দেখতেই তো পাচ্ছি, ভাল আছেন।'

নিশীথ হেসে বলল, 'একেবারে ছেলেমানুষের মত কথাটা বললে। চোখে ধরা পড়ে না এমন অনেক অসুখ মানুষের শরীরে লুকোন থাকে। শরীরের নিচে আরেকটা জিনিস আছে, তার নাম মন। তারও অনেক রোগ আছে। আমরা ডাক্তার, আমরা এ-সব জানি। যাক সে কথা। আমার চিঠি পেয়েছিলে?'

'পেয়েছিলাম' সুধা মৃদুকণ্ঠে বলল, 'কিন্তু আপনি ও-চিঠি কেন লিখেছিলেন নিশীথবাবু। মা আমাকে ভী—ষণ বকেছিল। বাবাও রাগ করেছিলেন।'

নিশীথ সকৌতুকে বলল, 'তুমি রাগ করনি তো?'

'আমি?' একটু ইতস্তত করল সুধা, বোধ হয় ভেবে দেখল সে-ও রাগ করেছিল কিনা—'না আমি রাগ করিনি। খুব ভয় পেয়েছিলাম। খুব কেঁদেছিলাম।'

'শুধু ভয় পেয়েছিলে ? শুধু কেঁদেছিলে ?'

সুধা চুপ করে রইল।

নিশীথ এগিয়ে এসে ওর পিঠে হাত রেখে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল, 'কেন ভয় পেয়েছিলে সুধা। ভেবেছিলে গ্রামের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে যাব ?'

সুধা বলল, 'না। ওখানে আমার কেবলই ভয় হত, আর বুঝি এখানে ফিরে আসা হল না। জানেন নিশীথবাবু ভেবে ভেবে আমার অসুখ করেছিল ?'

'ওখানে ভাল লাগত না তোমার ?'

সুধা নিঃসঙ্কোচে জবাব দিল, 'না।'

'আর এখানে ?'

'এখানেও ভাল লাগে না' সুধা ধীরে ধীরে বলল, 'তবু মনে হয় এখানে অন্তত বেঁচে আছি।' বলেই সুধার মনে হল কথাটা হয়ত ঠিক বোঝান হল না। ওর নিজেরই অনেকদিন পুরনো একটা স্মৃতি মনে পড়ে গেল। ওর বাবার মুখে শোনা। একবার এক বাড়িতে উনি মুমূর্ষু এক বুড়ির শুশ্রূষা করতে গিয়েছিলেন। বুড়ির কেউ নেই, মাঝরাত্রে সে-তো মরে গেল। তারপর সারারাত বাবাকে একা সেই মড়া আগলে রাত জাগতে হয়েছিল। গ্রামে থাকতে মাঝে মাঝে সুধা ভেবেছে ওখানকার জীবনটাও যেন সেই মড়ার শিয়রে রাত জাগার মত। নিশুতি রাত, মাঝে মাঝে নিজেরই বুকে হাত দিয়ে পরখ করতে হয় বেঁচে আছি কিনা।

সুধা খানিক পরে আর কিছু খুঁজে না পেয়েই যেন বলল, 'নূপুরের ঠিকানাটা দিন ?'

অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে গেল নিশীথ।—'নূপুরের তুমি সত্যিই খোঁজ চাও ?'

উৎসুক সুধার মুখের দিকে চেয়ে নিশীথ ধীরে ধীরে বলল, 'নূপুর কার্শিয়াংয়ে আছে।'

কার্শিয়াং অনেক দূরে সুধা এইটুকু মাত্র জানত। জিজ্ঞাসা করল, 'আর, ওর মা ?'

'সে-কথা তোমার না জানাই ভাল।'

সুধা ছাড়ল না, নিশীথের হাত দু'টি চেপে বলল, 'বলুন, নিশীথবাবু বলুন। আমি সব বুঝি। আপনি নিজেই তো বলেছেন, আমি আর খুকিটি নই।'

হ্যাট নিয়েই নিশীথ জানালার পাশে একটা তাকে বসে পড়ল। রুমাল বার করে মুছল কপালটা।—'তোমার দেহের পরিবর্তন দেখে বলেছিলাম। কিন্তু সুধা, পরিণত শরীরে অনেক সময় অপরিণত মন থাকে। আবার অপরিণত শরীরেও থাকে পরিণত প্রবীণ মন, যেমন নূপুরের ছিল। প্রথমটাকে আমরা বলি ন্যাকা, দ্বিতীয়টাকে পাকা।'

'আমি দুটোর কোনটাই নই, নিশীথবাবু। বলুন না আমাকে। নূপুরের মা কি ডাক্তার চৌধুরীর সঙ্গে—'

'ডাক্তার চৌধুরী আমার সিনিয়র, সুধা। তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু জানি তা হল এই যে, তিনি মাসখানেক হল কলকাতা নেই। ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে চাকর খানসামা বাবুর্চি সব আছে। আরও কেউ আছে কিনা জানি না। অন্তত আমার জানবার কথা নয়।'

অরুচিকর প্রসঙ্গটা চাপা দিতে নিশীথ বলল, 'বৃষ্টি ধরেছে। আমার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে সুধা? নতুন একটা মোটর বাইক কিনেছি, চক্কর দিতে খুব চমৎকার লাগবে, দেখো।'

সুধা বলল, 'ফুলমাসি এখুনি হয়ত ফিরবে। আজ থাক নিশীথবাবু, আরেক দিন।'

আশাহত স্বরে নিশীথ বলল, 'বেশ।'

বর্ষাতিটা এবার আর পরল না নিশীথ, ভাঁজ করে মোটর বাইকের উপর রাখল। ঘড়িতে সময় দেখল একবার, স্পর্শমাত্র স্পন্দিতপ্রাণ ইঞ্জিনটা গর্জন করে উঠল। দরজার ভিতর থেকে সুধা উঁকি দিল যখন, বাইকটা আর নেই, তার সওয়ার নিয়ে পলকে অদৃশ্য হয়েছে, পিছনে একটা ঘন ধোঁয়ার রেখা শুধু রেখে গেছে।

সব ঠিক তেমনি আছে, নিশীথ, ফুলমাসি, আদিত্য মজুমদার। একটি মেয়ে শুধু হারিয়ে গেছে। কলকাতা আছে নূপুর নেই, এর চেয়ে অদ্ভুত কিছু সুধা ভাবতে পারে না। এখনও নূপুর মাঝে মাঝে ওর কাছে আসে, স্বপ্নে। মাথা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা, সেই ঢাকনা মাঝে মাঝে সরিয়ে ওকে হাতছানি দেয়। জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় সুধা, চোখ দুটোকে বিশ্বাস হয় না, চেঁচিয়ে বলে, 'তুই এসেছিস, নূপুর, সত্যি?' চাদরটাকে এবার নূপুর পা অবধি ঠেলে দেয়। ভাঙা বাঁকা অপুষ্ট দুটি জানু, সেখানে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে নূপুর বলে, 'দেখেও চিনতে পারছিস না? এমন পা এ-শহরে আর ক'টি আছে।' তারপর এক সময় সুধা নিজেই যেন নূপুরের পাশে চলে গেছে, পিঠের নিচে বালিশ নিয়ে নূপুর তখনও আধশোয়া, পিঙ্গল চুলের রাশ ছড়িয়ে পড়েছে। সেই চুলের পাশে, বালিশের নিচে কত যে বই ছড়ান, একটু একটু পড়ে নূপুর, মুচকি হেসে বলে, 'শুনবি, একটু?' শোনায় না কিন্তু, হাসতে হাসতেই বইয়ের পাতা মুড়ে রাখে। বলে, 'কাজ নেই বাবা। তোমরা আবার ভা—লো মেয়ে।' 'ভাল' কথাটা বলবার সময় দুষ্টু-দুষ্টু চোখ দুটো বিস্ফারিত করে, ঠোঁট দুটোকে প্রথমে বিবৃত, পরে গোল করে আনে।

ভয়ে ভয়ে সুধা বলে, 'তুমি বুঝি ভালো মেয়ে নও ভাই?'

'ভাল মন্দ জানিনে, আমি এই শহরের মেয়ে। এই শহরের পনের আনা মানুষকে দেখিসনে, ভোগের শখ ষোল আনা, কিন্তু পারে না, পায় না? শেষ পর্যন্ত নিজের কড়ে আঙুল কামড়েই খুশী থাকে? অক্ষম, বিকলাঙ্গ, অথচ লোলুপ। আমি তাদের সকলের প্রতিনিধি। সকলের পাপ মাথায় নিয়ে যীশু ক্রুসে উঠেছিলেন, শুনেছিস তো, আবার সকলের বিষ গলায় নিয়ে শিব নীলকণ্ঠ—আমিও তাই। আমাকে দেখলেই এই কলকাতাটাকে দেখা হয়ে যায় সুধা।' একটু দম নেয় নূপুর, বিস্ফারিত চোখ দুটিতে হঠাৎ চকমকি জ্বলে ওঠে।—'ডাক্তার চৌধুরী আমাকে সারাতে এসেছিলেন, মা নিয়ে এলেন তাকে। নিশীথ এল, কত ভরসা দিলে, কিন্তু সে পেয়ে গেল তোকে। কিন্তু তোকে বলে রাখি সুধা, আমাকে শুইয়ে রাখার এই ষড়যন্ত্র আমি ব্যর্থ করবই।

সেরে উঠব, উঠব, উঠব। লুডো খেলতে বসে আজ পর্যন্ত দুরি তিরির ওপর দান পড়ল না, ঘর থেকে বেরুতেই পারলুম না। একবার একটা ছক্কা তুলবই—সেদিন আমাকে তোরা কেউ রুখতে পারবি না।'

ব্যস্ত হয়ে সুধা বলতে চায়, 'কেন তোমাকে রুখব নূপুর'—কিন্তু কোথায় নূপুর। আহত অভিমানী মেয়েটা আবার পা থেকে মাথা অবধি সাদা চাদরে ঢেকে দিয়েছে, ডেকে ডেকেও তার সাড়া পাওয়া যায় না। অপরাধীর মত আচ্ছন্ন হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে থেকে সুধা সম্বিৎ ফিরে পায়। কোথায় নূপুর। সুধা উঠে বসেছে তার নিজের বিছানায়, ও-বাড়ির জানালা তেমনি বন্ধ, অলঙ্ঘ্য একটা নিষেধের মত। মাঝে মাঝে দরোয়ান খৈনি টিপে কর্কশ একটা গান গেয়ে ওঠে, নারকেল গাছের পাতায় জড়িয়ে গিয়ে অন্ধ একটা পাখি ছটফট করে, ডানা ঝাপটায়।

সেই জানালা একদিন সুধা সত্যিই খোলা দেখল। যেমন দেখেছিল স্বপ্নে। ও-বাড়ির জানালা খোলা, কিন্তু জানালার পাশে আধশোয়া সেই মেয়েটি নেই। গোড়ালি তুলে উঁকি দিলে সুধা নিদ্রামগ্ন একটি মহিলাকে দেখতে পেত।

কেউ এসেছে সন্দেহ কী। সকাল থেকেই দুমদাম শব্দ, বোঝা যায় বাক্স পেঁটরা নিয়ে টানা হেঁচড়া চলেছে। রকে ঠেস দিয়ে যে-দরোয়ানটা অলস হাতে খৈনি টিপত সেও অদৃশ্য।

দুপুরের দিকে সুধা আর কৌতূহল সামলাতে পারল না, ও বাড়ি চলে গেল। উপরে নূপুরের ঘরের দরজা খোলা। কিন্তু নূপুর নেই। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে কে-একজন শুয়ে, বুক অবধি চাদরে ঢাকা, কিন্তু রক্তপদ্মাভ দুটি পায়ের পাতা খোলা। পা টিপে টিপে ফিরে আসবে, কিন্তু সিঁড়ির কোণে, নিচের ঘরটির কাছাকাছি আসতেই মনে হল কে যেন ওকে শিস দিয়ে ডাকলে। প্রথমে ভাবল পাড়ার কোন অসভ্য ছেলে, হয়ত পড়ো বাড়ির বসবার ঘরটা দখল করেছে। উপেক্ষা করে চলে আসবে, আবার শিসের ইসারা শুনল, সঙ্কেতটা এবার আরও স্পষ্ট।

উঁকি দিয়ে দেখল, নূপুর।

অল্প-আলোয় ধূসর-ঘেঁায়াটে ঘর, ভিতরটা ভাল দেখা যায় না। এই ঘরে নরম সোফায় সুধা একদিন ডাক্তার চৌধুরী আর নূপুরের মাকে গল্প করতে দেখেছে। সেই সোফার একটিতে এখন পুরু ধুলোর আস্তর, আরেকটিতে নূপুর। স্পষ্ট বোঝা যায় না, কিন্তু চকচকে সেই চোখ দুটিকে সুধা অমাবস্যার রাতেও বুঝি চিনে নিতে পারে।

চৌকাঠে দাঁড়াতেই নূপুর ওকে ডাকল। ভিতরে গিয়ে সুধা বলল, 'কবে এলে ভাই নূপুর?'

নূপুর সোফার এক পাশে আঙুল দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ব'স। জানালাটা খুলে দিতে পারিস, আলো আসুক। কাল এসেছি, রাত্রে। আবার কালই চলে যাব ভাই।'

'কালই চলে যাবে কেন?'

নূপুর বলল, 'সে অনেক কথা। বলব, সব বলব। ওপরে গেছলি? মাকে দেখলি?'

'বিছানায় একজন ঘুমিয়ে আছেন দেখলুম। তোমার মা বুঝি?'

চাপা, সাবধান গলায় নূপুর বলল, 'তুলে দিসনি তো। মার ভারি অসুখ ভাই। এখন শুধু রেস্ট চাই। যেটুকু ঘুমিয়ে থাকেন সেটুকুই ভাল।'

'অসুখ নূপুর?'

'শরীরের অসুখ, মনের অসুখ। আমার নিজের শরীরের অবস্থা তো এই। কত দিক সামলাব বল তো।'

জানালা দিয়ে জুড়ন্ত রোদ পড়েছে সুধার মুখে। মুগ্ধ চোখে সেদিকে চেয়ে নূপুর বলল, 'কিন্তু তুই কী সুন্দর হয়েছিস সুধা!' লিকলিকে হাত দিয়ে নূপুর সুধার কোমর জড়িয়ে ধরল।

নিশীথের মুখে স্তব শুনে সুধা আরক্ত হয়েছিল, কিন্তু নূপুরের কাছে লজ্জা নেই। সরু দুটি হাত কোলে টেনে নিয়ে সুধা বলল, 'তুমিও তো সুন্দর নূপুর।'

আর তখুনি দপ্‌ করে জ্বলে উঠল নূপুরের দুটি চোখ। সুধা স্বপ্নে যেমন দেখেছিল। দাঁতে দাঁত ঠেকিয়ে নূপুর বলল, 'কোথায় সুন্দর। আমাকে ওরা সুন্দর হতে দিল কই। আমার বাইরেটা কালো, ভেতরটা তার চেয়েও কালো সুধা। অথচ', দীর্ঘশ্বাস ফেলে নূপুর বলল, 'আমি সুন্দর হতে চেয়েছিলাম।'

'তুমি এখনও সুন্দর হতে পার, নূপুর।'

ক্লান্ত ভঙ্গীতে দু'হাতে চোখ ঢাকা দিয়ে নূপুর বলল, 'পারি না, আর পারি না। আমি হেরে গেছি, ফুরিয়ে গেছি সুধা।'

সেই হাত দু'টি সুধা যদি সরিয়ে দিত, দেখতে পেত, ঘাসের শীসে শিশিরের মত পল্লবপ্রান্তে উষ্ণ কয়েক ফোঁটা জল। ঝুঁকে পড়ে সুধা বলল, 'কী হয়েছে আমাকে এখনও কিন্তু বলনি নূপুর।'

নূপুর বলল, 'বলব। কাউকে না কাউকে একদিন সব কথা বলতেই হয়। নইলে মানুষ মরেও শান্তি পায় না। খৃষ্টানেরা তাই শেষ দিনে ডেকে আনে পাদ্রীকে।' পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে সুধার দিকে চেয়ে নূপুর বলল, 'পাদ্রীর চেয়ে তোমাকে বলে আমি বেশি শান্তি পাব ভাই।'

নূপুরের পক্ষে বলাটা সহজতর করতে সুধা বলল, 'তুমি তো কালিম্পং গিয়েছিলে।'

'গিয়েছিলুম', নূপুর বললে, 'ওরা আমাকে পাঠিয়েছিল।'

'ওরা কারা ভাই', সুধা সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করল, 'ডাক্তার চৌধুরী আর তোমার—'

নূপুর অনায়াসে বলল, 'আর আমার মা। কিন্তু ওদের জন্যে তো ভাবিনে, ওরা যে এমন করবে সেজন্যে আমি তো তৈরী ছিলুম। কিন্তু নিশীথ এমন করল কেন?'

'কী করেছেন নিশীথবাবু', সুধা সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু প্রয়োজন ছিল না, নূপুর নিজেই বলত। শুয়ে শুয়ে দু-হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি রাখল নূপুর, অনেকটা বক্তৃতা দেবার ভঙ্গীতে। ধীর, অকম্পিত কণ্ঠে বলল, 'নিশীথ আমাকে ঠকিয়েছে।'

সুধা অস্বস্তি বোধ করল, গোপন একটু অপরাধ বোধ ওর মর্মে যেন হঠাৎ বিদ্ধ হল তপ্ত সূচীমুখের মত, চমকে উঠল। কিন্তু সুধার মুখে রক্ত আছে কি নেই, চেয়ে দেখবার অবসর নূপুরের ছিল না, সে ছাতের দিকে একাগ্র লক্ষ্য রেখে বলে গেল, 'নিশীথ আমাকে ঠকিয়েছে। মা আর ডাক্তার চৌধুরী মিলে ঠিক করলে আমাকে কার্শিয়াং পাঠাবে। কত প্ল্যান ওঁদের, কত উপদেশ। ওখানে কীভাবে থাকতে হবে, কত করে মাসোহারা পাব, এই সব। ওঁদের মাসোহারার জন্যে চিন্তা ছিল না, বাবা আমাকে আলাদা করে অনেক টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। মা আর ডাক্তার চৌধুরী প্ল্যান আঁটছে, আমি ওদিকে নিজের বন্দোবস্ত করছি। ঠিক জানি, আমাকে কার্শিয়াং যেতে হবে না। আমি আর নিশীথ পালিয়ে যাব, প্রথম বোম্বাইয়ে, সেখান থেকে সুযোগমত জাহাজে। বিদেশে পাড়ি দেব। সুস্থ হয়ে ফিরে আসব। নিশীথ আমাকে বিলিতি মেডিকেল জার্ণালগুলো পড়তে দিত, দেখেছি তো ওদেশে আমার চেয়ে অনেক শক্ত কেস একেবারে সেরে গেছে।'

নিষ্ঠুরভাবে আঙুলের একটা ফোসকা নখে খুঁটতে গিয়ে নূপুর রক্ত বের করে ফেলল, সুধার দিকে চেয়ে ক্ষতের বেদনা লুকোতে ক্লিষ্ট হাসল। অবসন্ন কণ্ঠে বলল, 'নিশীথ এল না তো। সন্ধ্যার পর মা বাড়ি থাকে না, ফোন করে ট্যাক্সি আনালুম, কাঠের পায়ে ভর দিয়ে দিয়ে কোনমতে নীচে নামলুম, ড্রাইভারকে বললুম, দমদম। কিন্তু সেখানে নিশীথ ছিল না। পূর্বনির্দিষ্ট জায়গায়, মিনিটের পর মিনিট ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে, অসহিষ্ণু ইঞ্জিনটা ঘসঘস করছে। ঠাণ্ডা অন্ধকার, কনকনে হাওয়া। মাঝে মাঝে চড়া আলো জ্বেলে দু-একটা গাড়ি পাশ কাটিয়ে ছুটে যায়, সাদা সবুজ আলোর ফোঁটা-পরা দু-একটা প্লেন আকাশে উড়ে কাকে ধমকায়, দূরে দূরে লালচোখো ওয়্যরলেসের ভুতুড়ে খুঁটিগুলো। ড্রাইভারকে নিশীথের বর্ণনা দিয়ে বললুম, খুঁজে আন। একটু পরে খোলা প্রান্তরে লাউডস্পীকার থেকে থেকে নিশীথের নাম হেঁকে গেল, কিন্তু নিশীথ এল না। ড্রাইভার ফিরে এসে বসল ওর আসনে, গাড়িটার চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল, আবার বাড়ির পথ। চোরের মত

বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম, ফিরে এলুম চোরের মত। পরদিন সকালেই ওরা আমাকে কার্শিয়াং পাঠিয়ে দিলে।'

বিশ্রাম নিতে নূপুর দু'পল চোখ বুঁজে রইল, একটু পরেই অলস আরক্তিম দৃষ্টি মেলে বলল, 'তুমি ভাবছ কী লজ্জা, কী লজ্জা। কিন্তু লজ্জার তখনও একটু বাকি ছিল। কার্শিয়াং গিয়ে নিশীথের চিঠি পেলুম, লিখেছে, আইনের চোখে আমি বয়স্থা নই, পুলিশের হাঙ্গামা হত, সেই ভয়েই সে আসেনি। ভয়, ভয়। একরত্তি মেয়ের যে-সাহস আছে, এই অক্ষম পুরুষগুলোর সেটুকুও নেই কেন। মনে মনে বললুম, তোমাকে আর দরকার নেই নিশীথ, আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নিতে পারব। তুমি তোমার স্ক্যাণ্ডালের ভয় আর কেরীয়ারের মোহ নিয়ে থাক। তখনও আমার রোখ যায়নি, সেরে ওঠার পণ ভূতের মত ঘাড়ে চেপে আছে। লজ্জার কথা কী বলব ভাই, স্যানাটোরিয়ামের একজন ক্লার্ককে ভর করলুম। মাঝবয়সী টাক-পড়া হ্যাংলা একটা লোক, আমার বেডের আশেপাশে ঘুরঘুর করত, যে-কোন ছুতোয় আলাপ করতে পেলে বেঁচে যেত। ভাবলুম, মন্দ কী, আমার ভাল হয়ে ওঠা নিয়ে কথা। সীতা উদ্ধার হলেই হল, সহায় যে-কেউ হক না কেন, বানর কি, আর রাক্ষস কি। কিন্তু সে-ও আমাকে ঠকালে।'

প্রথম সন্ধ্যায় ছায়া নেমেছে ঘরে, কাদের বাড়ির কাঁচা কয়লার ধোঁয়ায় বাতাস কালো, ভারী। নূপুর কাশতে শুরু করল। হাপরের মত তলপেট ওঠা নামা করছে, নাসারন্ধ্র স্ফীত; কণ্ঠায়, গালে জমাট রক্তের ছোপ। সুধা ওর বুকে হাত দিয়ে মালিশ করতে লাগল, নূপুর প্রবল বিতৃষ্ণায় ওকে ঠেলে দিল। —'থাক, থাক, আর দয়া দেখাতে হবে না।' পরিপূর্ণ নিঃশ্বাসে ফুসফুস ভরে নিয়ে বলল, 'সে-ও আমাকে দয়া দেখাতে এসেছিল। ভরসা দিলে, অনেক পাহাড়ীর সঙ্গে ওর জানাশোনা, টোটকা ওষুধে আমাকে সজীব করে তুলবে। বিলিতি চিকিৎসায় কিছু হবে না। সেরে ওঠার লোভে তখন আমি যে-কোন পাঁকে নামতে রাজী। ভগবান আমার শরীরের আধখানা নিয়ে রেখেছেন, বাকি আধখানা ওর কাছে তুলে ধরলুম, পুরোটা ফিরে পাব এই আশায়। ছুটো

নোট পাবে বলে একখানা নোট লোকে জোচ্চোরের হাতে তুলে দেয়, শোননি? এই সেই নোট ডবল করার বাজি। হারলুম সে বাজি। নিশীথের মত এ-ও আমাকে নিয়ে শুধু খেলা করতে চেয়েছিল, আর কিছু না।'

তার দিয়ে মোড়া জানালা, ছোট ছোট চাকার মত রেখায় ভরে গেছে মেজে, দেয়াল, নূপুরের চাদর। আড়াল থেকে শিকারীরা যেন জাল ছুঁড়ে দিয়েছে ঘরে, ধরা প'ড়ে দু'টি কিশোরী ছট্‌ফট্‌ করছে। থম্‌থমে অন্ধকার, চুপ। আলো যদি কোথাও থাকে, তবে নূপুরের আঁখিকোটরের দু'টি বিন্দুতে, শুকনো, প্রখর ছটায়।

হঠাৎ খিল খিল ক'রে হেসে উঠল নূপুর, বলল, 'মা-ও কিন্তু জেতেনি। আমার চেয়েও ঠকেছে।' বিকারগ্রস্ত হাসির সেই তোড়ে সুধার গায়ে কাঁটা দিল, দম বন্ধ ক'রে চুপ ক'রে রইল, নূপুর এর পর কী বলে শুনতে।

নূপুর বলল, 'ডাক্তার চৌধুরীর কীর্তি তোমাকে গোড়া থেকে বলি, শোন। মাকে নিয়ে তুলল শহরতলীরই সাজান একটা বাড়িতে। বলল, এই আমার নতুন কুটির, তোমাতে আমাতে থাকব ব'লে তৈরি করিয়েছি। মা-র খুশী ধরে না, এক সপ্তাহ ধরে শুধু বাগান সাজালে, প্রাণ ভ'রে ফার্ণিচারের অর্ডার দিলে। ডাক্তারকে বলল, এবারে চল ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে যাই। ডাক্তার বলল, সবুর। নোটিশ দিয়েছি কাল, পিরিয়ডটা মেচিওর করুক। পিরিয়ড কেটে গেল, মা আবার ডাক্তারকে সেটা মনে করিয়ে দিল। এর পর দু'জনের দেশ ভ্রমণে যাবার কথা, সেটাও বাকি যে। ডাক্তার এবারেও বলল, সবুর। হাতে জরুরী কেস আছে কটা, সেরে নি। ধন্দ লাগল মা'র, ডাক্তারের সঙ্গে একদিন কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। সেদিনই বিকেলে ডাক্তার এসে বলল, সুচারু, তোমার সঙ্গে সোসাইটির অনেক মেয়ের মাখামাখি, তাদের ক'জনকে একদিন ডাক না। আমার জনকয় বন্ধুকেও তাহ'লে ডাকি। মা বললে, বেশ ত। বিয়েটা হয়ে যাক, তারপরে। ডাক্তার জেদ ধ'রে বললে, না আগেই। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের পেড়াপীড়িতে মা রাজী হ'ল। একদিন সন্ধ্যাবেলা গান বাজনার নাম ক'রে নিয়ে এল কয়েকটি মেয়েকে। ডাক্তারের বন্ধুরাও এল।

খাওয়া দাওয়া শেষ হ'তে অনেক রাত হয়ে গেল। মা বললে, এবার ওদের ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। ডাক্তার বললে, ব্যস্ত কী। আরেকটু গান-বাজনা চলুক না। আমার বন্ধুদের গাড়ি আছে, তারাই সানন্দে ওদের বাড়ী পৌঁছে দেবার ভার নেবে। ত্রস্ত হয়ে মা বলল, না না। সে হয় না। আমরা ওদের এনেছি, আমাদেরই কর্তব্য ওদের পৌঁছে দিয়ে আসা। ডাক্তার খট্‌খটে হেসে বলল, আমার কর্তব্য আমি জানি। আমার বন্ধুরা কি জানোয়ার না রাক্ষস, যে মেয়েগুলোকে খেয়ে ফেলবে। মা ভয়ে ভয়ে বলল, কী জানি।

ডাক্তার বলল, বেশ ত, এতই যদি তোমার ভয়, ওদের কেউ কেউ এখানেই রাতটা থাকুক না।

আতঙ্কে দু' হাত মাথায় তুলে মা বলল, না না, তা হয় না।

রুষ্ট হয়ে ডাক্তার বলল, বেশ, আজ তবে ওরা থাক, আসছে শনিবার ওদের আবার ডাকা যাবে। ব'লে দিও, সেদিন এখানেই থেকে যাবে।

—ওরা আসবে কেন।

—আসবে, আসবে। সোসাইটিতে তোমার এত প্রতিপত্তি, সবার তুমি পাইকারি মাসিমা, তোমার ডাকে আসবে না? মুচ্‌কি হেসে ডাক্তার বলল, জিজ্ঞেস করে দেখো, ওদের বাঁধা-ধরা নিয়মের বাইরের এই সন্ধ্যাটা নেহাৎ মন্দ লাগে নি।

মা'র বুকের ভিতরটা তখন বরফের মত জ'মে গেছে, কিন্তু আগুন ঝরছে চোখ দিয়ে। বলল, এই জন্তেই আমাকে এখানে এনেছ তুমি, আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠা এক্সপ্লয়েট করতে? এ-তো বেনামীতে একটা ব্রথেল—

কঠিন গলায় ডাক্তার বললে, যদি বলি তাই। তুমি কি ভেবেছিলে, শুধু ভালবেসে ঘর বেঁধেছি তোমার মত একটা বুড়িকে নিয়ে?

রুদ্ধশ্বাসে মা বলল, আমি বুড়ি!

ডাক্তার হো-হো ক'রে হেসে উঠল, নয় তো কী। ভেনীসীয়ান কাচের আয়না আছে তোমার ঘরে, চেহারাটাও একবার দেখনি? আমাদের দেশে মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি, দ্বিতীয়বার কুড়ি ছুঁতে তোমার ক'বছর বাকি আছে সুচারু?'

নূপুরের গল্প শেষ হয়ে গেছে, সুধা টেরও পায়নি।

অনেকক্ষণ কোন সাড়া না পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তারপরে, নূপুর ?'

নূপুর বলল, 'আরও শুনবি ? মা'র টেলিগ্রাম পেয়ে ফিরে এলাম, এসে দেখি এই অবস্থা। ডাক্তার চৌধুরী উধাও, মা'র ঘন ঘন মূর্চ্ছা হয়, মাঝে মাঝে বেহুঁশের মত পড়ে থাকে। শুনলুম, নার্ভাস ব্রেকডাউন। দরোয়ানের ওপর কড়া হুকুম দিয়ে গেছে ডাক্তার চৌধুরী, মা'র ওপর নজর রাখতে, কোথাও যেন যেতে না পারে। তাকে ঘুষ খাইয়ে কাল রাত্তিরে আমরা দু'জনে পালিয়ে এসেছি।'

রুগ্ন ধুকধুক বুকে একখানি হাত রাখল নূপুর, ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, 'কিন্তু এখানেও আমরা থাকব না, সুধা। কাল সকালেই চ'লে যাব। এই পা নিয়ে ওঠা-নামায় নানা ঝামেলা, তাই আর ওপরে যাইনি। দু'দিনের ব্যাপার তো, নিচের ঘরেই বিছানা পেতেছি।'

'কোথায় যাবে নূপুর ?'

'আপাতত চেঞ্জে। সেখান থেকে হয়ত বিদেশে।' ক্লান্ত হেসে নূপুর বলল, 'এই শহরটা তো আমাকে সারিয়ে তুলল না, আমার মাকেও ঘর দিল না। এখানে আমাদের মায়ে-ঝিয়ের ঠাঁই হয়নি, দেখি অন্য কোথাও যদি হয়।' অবসাদে চোখের পাতা দু'টি নেমে এল, নিমীলিত নয়নেই নূপুর ব'লে গেল, 'আমি ঠিক জানি সুধা, কোন একটা জায়গায় সুস্থ, পুষ্ট, স্বাভাবিক একটি নূপুর আছে ; হাসিমুখে আমার অপেক্ষা করছে। তার খোঁজে দরকার হয় তো পৃথিবীর শেষ প্রান্ত অবধি যাব।'

'আর ফিরবে না নূপুর ?' আস্তে আস্তে সুধা জিজ্ঞাসা করল, উত্তর পেল না। শুয়ে পড়ে দেখল, শপথ কঠিন দুটি ঠোঁট ঈষৎ-স্ফুরিত, অভিমানী একটি বুক অতি ধীরে ধীরে ওঠা-নামা করছে।

নূপুর ঘুমিয়ে পড়েছে। গলা পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা, ঠিক সুধা স্বপ্নে যেমন দেখেছিল।

২৫

নূপুরের বাসা থেকে সুধা সেদিন যখন বাইরে এল, তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ তখনও মোছেনি; জানত না, বিচিত্রতর একটা ঘটনা তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

চৌকাঠে সবে পা দিয়েছে, হঠাৎ অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কে ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। মাথায় ওর প্রায় সমানই হবে, ওরই মত রোগা কিন্তু বড় নোংরা শাড়ি, হাতদুটোও তেল-চিটচিটে, ময়লা। সুধার শরীর ঘিন ঘিন করে উঠল, দু-পা পিছিয়ে গিয়ে তীব্র গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'কে?'

'দিদি।'

গলির গ্যাসের আলোর জোর বেড়ে গেছে, নাকি অন্ধকার চোখে সয়ে এসেছে, সুধা চিনতে পারল ঠিক।

'পীতু?' একটু আগে ঠেলে দিয়েছিল, এবার সুধা নিজেই ছুটে গিয়ে নোংরা শাড়ি আর ধুলোভরা হাতশুদ্ধ বোনকে জড়িয়ে ধরল—'পীতু তুই? কী করে কলকাতায় এলি পীতু, কার সঙ্গে এলি? কতক্ষণ এলি?'

একসঙ্গে তিনটে প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না, পীতু শেষেরটাই বেছে নিয়ে বলল, 'এই খানিকক্ষণ।' একটু নড়ে সরে সুধার স্নেহপাশ থেকে নিজেকে চেষ্টা করল মুক্ত করতে।

'ভিতরে গিয়েছিলি?'

পীতু ঘাড় নাড়লে।

'কারও সঙ্গে দেখা হয়নি?'

'না তো!'

'সব ঘর দেখেছিলি? দিদিমা তবে বোধ হয় পুজো দিতে গেছে। একলাটি বাইরে বসে আছিস? সেই থেকে? আয় ওপরে আয়।'

দিদিমা বাড়ি ফিরে জপে বসেছিলেন, ওদের দেখতে পেলেন না। সুধা পীতুকে নিয়ে একেবারে শোবার ঘরে এল, বিছানাটা দেখিয়ে বলল, 'বস।'

ধবধবে চাদর পাতা, পীতু সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সুধা ফের বলল, 'বস না।'

'শাড়িটা যে বড্ড ময়লা, দিদি!'

সুধা আজ উদার হয়ে গেছে, বলল, 'তা হক, তুই ওখানেই বস।'

পীতু তবু রাজী হল না—'এখানে তো ঘাট-টাট নেই দিদি, না? হাত-পা, মুখটুক ধুতে পেতাম যদি—'

সুধা হেসে বলল, 'ঘাট না থাক, কল আছে। চল তোকে হাত-মুখ ধুইয়ে আনি।'

নিজের ফর্সা একটা জামা দিল পীতুকে, ভাঁজ-করা একটা শাড়ি বার করল। তখনও অবাক ঘোর কাটেনি। কলঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, 'কিন্তু আমি ভাবতেই পারছি না পীতু, তুই এখানে এসেছিস। কী করে এলি, কে পৌঁছে দিয়ে গেল?'

পীতু বলল, 'বলব দিদি, সব বলব। আগে একটু ঠাণ্ডা হয়ে আসি।'

কলঘর থেকে পীতু যেন একেবারে নূতন হয়ে বেরিয়ে এল। পথশ্রমের চিহ্ন এখন শুধু সিক্ত, কিন্তু সঙ্কুচিত দুটি চোখ। অনভ্যস্ত হাতে মাখা সাবানের ফেনা লেগে আছে ঘাড়ের নিচে, গলার ভাঁজে, কানের গোড়ায়। এসেই বিছানায় গড়িয়ে পড়ল পীতু, দু হাতের পাতা চোখের উপরে রেখে আলোটা আড়াল করল। কিছুক্ষণ পরে হাতটা সরিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'দিদি, বাবা আসেনি?'

বাবা? সুধা কথাটা ভাল বুঝল না, 'বাবা এখন আসবে কী রে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না যে পীতু, সব খুলে বল।'

'এখানেও নেই!' ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল পীতু, সুধা দেখতে পেল, ওর মুখের রঙ মিলিয়ে যাচ্ছে, থরথর কাঁপছে দুটি ঠোঁট।—'এখানেও নেই' পীতু আবার বলল, 'কিন্তু আমি যে বাবাকেই খুঁজতে বেরিয়েছি দিদি।'

কয়েক মাস আগে হলে সুধা বিহ্বল হত, ভয় পেত, কিন্তু আবেগের বাড়াবাড়ি, বিকার দেখে দেখে স্নায়ু কঠিন হয়েছে, এই খানিক আগেও তো এমনি একজনকে ঘুম পাড়িয়ে এল। শরীরের সবটুকু জোর দিয়ে সুধা টেনে তুলল পীতুকে, বিছানায় বসিয়ে দিল, কাঁধ ধরে পীতুকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'এসবের মানে কী, পীতু! বাবাকে খুঁজতে দেড়শো মাইল পাড়ি দিয়ে এই শহরে একা এসেছিস? বাবা ওখানে নেই?'

সুধার কাঁধে মাথা রেখে পীতু বলল, 'নেই। পনের-কুড়ি দিন থেকে নেই।'

'পনের-কুড়ি দিন!' আরেকবার কথাটা উচ্চারণ করে সুধা যেন সময়টার পরিমাপ নিতে চাইল। তারপর পীতুকে, হয়ত নিজেকেও, সান্ত্বনা দিতে বলল, 'তাতে কী হয়েছে। বাবা তো মাঝে মাঝে এমন যান। হয়ত পালা-টালা নিয়ে কোথাও গেছেন, গিয়ে আটকে পড়েছেন সেখানে। হয়ত ফিরে গিয়ে দেখবি ফিরেও এসেছেন, অনেক মেডেল, টাকা আর মালা নিয়ে।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল পীতু। —'না দিদি পালা নয়। পালা-টালার খাতা তেমনি বাড়িতেই বাঁধা আছে। ওসব লেখার পালা বাবা ক—বে চুকিয়ে দিয়েছেন, জানিস নে।'

লেখার পালা চুকিয়ে দিয়েছে নীরদ! চকিতে সুধার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল তাদের গ্রামের বিষণ্ণ একটি সন্ধ্যার ছবি। ঝিঁঝিঁ একটানা ডেকে যায়, শেয়ালেরা থেকে থেকে। বারান্দার কোণে মাদুরের ওপর আসীন একটি লোক নুয়ে পড়ে পাতার পর পাতা লিখে চলে, সামনে একটি নিস্তেজ লণ্ঠনের আলো হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে ওঠে, দু-একটা বা পাতা উড়ে যায়। দু-হাত বাড়িয়ে লোকটি কুড়িয়ে নেয় সেগুলো, এদিক-ওদিক চায়, নিজের মনেই সদ্য-লেখা একটা গানের কলি গুন গুন করে ওঠে। তার দেহে শ্রান্তি, কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম, যত আনন্দ, যত জ্বালা, যত বেদনা শুধু চোখের পাত্রে সঞ্চিত রেখেছে। অন্ধকারে দরজার আড়ালে কাকে দেখতে পেয়ে গুন গুন থেমে যায়, নীরদ ডাকে, 'কে, সুধা? আয়, একটু শুনবি।'

জড়োসড়ো সুধা মাদুরের একপাশে বসে। আলোটার ফিতে ছোট হয়ে আরও বেশি দপ-দপ করে, নীরদ উপুড় হয়ে নির্দিষ্ট পাতা খোঁজে, ঈষৎ লজ্জিত গলায় বলে, 'তোর ভাল লাগে সুধা, সত্যি করে বলবি কিন্তু।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'তোর মা তো কোনদিন শুনল না, তাই তোকে ডেকে ডেকে শোনাই।'

একদিন সুধা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এ-সব লিখে কী হয়, বাবা? লেখ কেন?'

প্রশ্নটা চমকে দিয়েছিল নীরদকে, অনেকক্ষণ কোন উত্তর দিতে পারেনি। শেষে আস্তে আস্তে বলেছিল, 'বড় শক্ত কথা বললি। কেন লিখি জানি না তো। কিন্তু কেন নিঃশ্বাস নিই, তাও কি জানি। অথচ না নিলে বাঁচা যায় না। না লিখতে পারলে আমি মরে যেতাম সুধা।' একটু দম নিয়ে নীরদ বলল, 'না, ঠিক কথা হয়ত বলা হল না। মরে যেতাম না, তবে বোবা হয়ে যেতাম। বোবা মানুষ দেখেছিস, কথা বলতে চায়, পারে না, হাউমাউ করে ওঠে। লেখা বন্ধ হলে আমারও সেই দশা হবে। লেখার ভেতর দিয়ে আমি পৃথিবীর সঙ্গে কথা বলি।'

সেদিন সুধা কিছু বোঝেনি, আজ সব মনে পড়ছে। পাতার পর পাতা ভরান নিঃশ্বাস নেওয়ার মত অভ্যস্ত, সহজ ছিল যার কাছে, সেই নীরদ লেখা ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, কথাটা হৃদয়ঙ্গম করতে সুধার বেশ কিছু সময় লাগল।—'বাবা আর লেখেন না?' পীতুকে জিজ্ঞাসা করল আবার।

পীতু বলল, 'না। শেষের দিকে বাবার মাথা খারাপ মত হয়ে গিয়েছিল। আমরা সবাই চুপে চুপে, ভয়ে ভয়ে থাকতাম। তোকে গোড়া-থেকে বলি।'

দিন পঁচিশেক আগে ডাকপিওন একটা বইয়ের প্যাকেট দিয়ে গেল পীতুদের বাড়ি। যেখানে চিঠি আসে কালে ভদ্রে, সেখানে বইয়ের প্যাকেট? নীরদ কম্পিত হাতে মোড়কটা খুলতে আরম্ভ করল, ছেলে-মেয়েরা গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাগজের ভাঁজ সরাতেই বেরিয়ে পড়ল ঝকঝকে মলাট, নীরদ চেঁচিয়ে উঠল, 'এ-যে আমারই বই।' সোরগোল শুনে মল্লিকাও তখন এসে দাঁড়িয়েছে কাছে।

দ্রুত হাতে পাতার পর পাতা উল্টে গেল নীরদ, একটা জায়গায় থেমে জোরে জোরে চেঁচিয়ে পড়তে গেল খানিকটা পড়তে গিয়েই থমকে গেল। বিবর্ণ হয়ে গেল মুখ, বইয়ের ভাঁজ বন্ধ করে মলাটে নিজের নামটা ভাল করে দেখে নিলে। আবার উল্টে গেল পাতা, আবার পড়তে গেল কয়েক লাইন, এবারেও থেমে যেতে হল। আস্তে আস্তে বইটা মুড়ে রেখে শুকনো ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'এ-তো আমার বই নয়।'

পীতু বলল। 'তোমার নয়, কী বলছ? মলাটে তোমার নাম ছাপ আছে।'

নিস্তেজ গলায় নীরদ বলল, 'মলাটটুকুই আমার।'

একটু পরে বইটা নিয়ে নীরদ আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

ফিরে এল যখন, তখন দুপুর, নীরদের চোখ লালচে, পাটল, ঝাঁকড়া চুল, কোন দিকে তাকালে না, তাক থেকে পুঁথিগুলো পেড়ে নিলে; ছাপান বই আরও দু' কপি এসেছিল, সব কুড়িয়ে মল্লিকার হাতে তুলে দিয়ে বললে, 'এগুলো অনেকবার তুমি রাগ করে ছিঁড়তে গেছ, আজ নিজে থেকেই তোমাকে দিলুম, এগুলো ছিঁড়ে কুটিকুটি কর, পুড়িয়ে ফেল, উড়িয়ে দাও, আমার কিছু বলবার নেই।'

মল্লিকা বলল, 'সে কি, এ-যে তোমার বই।'

পাগলের মত হেসে উঠল নীরদ।—'কে বলেছে আমার। শুধু নাম, শুধু মলাট। পড়ে দেখ, ওরা সব বদলে দিয়েছে।'

'বদলে দিয়েছে কেন।' মূঢ় গলায় মল্লিকা জিজ্ঞাসা করল।

'সেই কথা জিজ্ঞাসা করতেই তো মেজ চৌধুরীর কাছে গিয়েছিলাম। তিনিও ভাল জানেন না। এ-বই তো ছাপতে নিয়ে গিয়েছিল ওঁর বন্ধু সেই কলকাতার সুধন্য রায়। পাতা উল্টে চৌধুরী মশাই বললেন, তাই ত, নীরদ, এ-সব কিছুই জানিনে আমি। তোমার ছিল যাত্রার পালা, এ-যে দেখছি থিয়েটারের বই। যাত্রা সেকেলে, এ-কালে চলে না, সুধন্য কলকাতার থিয়েটারের সব ব্যাপার জানে তো, সেই হয়ত বদলে দিয়ে থাকবে। বইটা

আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, এ-বই কলকাতার স্টেজে যখন অভিনয় হবে, খুব হাততালি পাবে, তোমার যশও বাড়বে দেখ। গাঁয়ের পালা-লিখিয়ে ছিলে, হবে দেশের নাট্যকার। আমি বললুম চাইনে আমি দেশের নাট্যকার হতে। যে-বই আমার নয়, সে-বই ভাঙিয়ে যশ চাইনে।'

'যশ চাও না ?' মল্লিকা স্তম্ভিত গলায় বলল।

নীরদ দৃঢ়স্বরে বলল, 'না। আমি তোমাকে বলে রাখলুম মল্লিকা, আমি কলকাতা যাব, খুঁজে বার করব সুধন্য রায়কে। সেই চোরের হাত থেকে আমার হারান খাতাটিকে কেড়ে নিয়ে আসব। এই থিয়েটারের বই, তার থাকুক, আমার পালার খাতা আমি চাই।'

রুদ্ধশ্বাসে সুধা শুনছিল। বলল, 'তার পর। মা কী বললেন ?'

'মা কিছু বলবার অবসরই পায়নি। বাবা যেমন তাড়াতাড়ি এসেছিলেন তেমনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। আর ফেরেননি।'

মিনিটের পর মিনিট কাটল, কেউ কোন কথা বলল না। না সুধা, না পীতু।

পীতু নিজে থেকেই শেষে বলল, 'মা-ও নেই থেকে পাগলের মত। ঘরে একটা চাল নেই, আমাদের যে কী-ভাবে কেটেছে তুই ভাবতে পারবিনে। বিন্থ-মিতুরা ট্যাঁ-ট্যাঁ করে ফিরেছে, মা তাদের ঠাস ঠাস করে মেরেছে চড়। ওদের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, মা ওদের তাই চেটে চেটে চুপ করে থাকতে বলেছে। বল্ দেখি, ওই নোনা জলে কারও পেট ভরে, না তেষ্টা যায় ?'

সুধা জিজ্ঞাসা করল, 'আর বাচ্চাটা ?'

'বাচ্চাটা তো নেই দিদি।' কতই না জন্ম-মৃত্যু দেখে যেন নির্বিকার হয়ে গেছে পীতু ; একটা পুতুলমাত্র হারিয়ে গেছে এমন গলায় পীতু বলল, 'বাচ্চাটা তো নেই দিদি।'

সুধা চমকে বলল, 'নেই ?'

'না। বাবা যেদিন গেল তার পরদিন থেকেই ওর কী হল, বুকের ভেতর থেকে শব্দ উঠত ঘর-ঘর। চোখ লাল, পেট ফাঁপা, ছোঁয়া যায় না গা এত গরম।'

'ডাক্তার আসেনি ?'

পীতু ধীরে ধীরে বলল, 'মা কোথা থেকে গাছের পাতা আর শিকড় বেটে খাইয়েছিল। ডাক্তার আসবে কোথা থেকে। মার হাতে একটাও যে টাকা ছিল না দিদি।'

এই আগেই সুধা নূপুরের কাছ থেকে এসেছে, সেই বিকলাঙ্গ মেয়েটির জ্বালার ছোঁয়াচ তখনও মনে একটু লেগে থাকবে। বলে উঠল, 'বিশ্বাস করি না, মা ওকে মেরে ফেলেছে।'

বিস্ফারিত চোখে পীতু চেয়ে আছে, সুধা তিক্ত স্বরে বলে গেল, 'খোঁজ নিয়ে দেখিস, মার আবার ছেলেপুলে হবে। সেটাকে ঠেকাতে পারেনি, খাওয়াবে কী. সেই ভয়ে-ভয়ে যেটা ছিল সেটাকে মেরে ফেলেছে। নইলে মা হয়ে কোলের ছেলেকে বিনা চিকিৎসায় মরে যেতে দেয়, কোথাও শুনেছিস্ ?'

পীতু শিউরে উঠল। তবু সুধাকে বোঝাতে, নিজের বিশ্বাসটুকু আঁকড়ে থাকতে, বলল, 'মার কাছে সত্যিই টাকা ছিল না দিদি।'

সুধা রূঢ় গলায় বলে উঠল, 'মিথ্যে কথা। ওরা সব পারে। নিজের মেয়েকে ফেলে রাখে মাসির কাছে, ছেলেকে বিক্রি করে দেয়—' বলতেই বুঝি নীলুকে মনে পড়ল, সুধা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'নীলু কোথায় রে। চৌধুরীরা ওকে নিয়ে গেছে ?'

'নিতে পারল কই।' পীতু বলল।

রাত-করাতের দাঁতে পড়ে মুহূর্তগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছিটকে পড়ছে ; পুজোর ঘরে ঘণ্টা থেমে গেছে কখন, দিদিমা হয়ত রান্নাঘরে ঢুকেছেন। দিদিমাকে জানান দরকার পীতু এসেছে, কিন্তু সুধার সে-কথা মনেই পড়ল না, বিছানায় পা মুড়ে বসে শুনে গেল পীতুর আরেকটা কাহিনী।

সুধা চলে আসবার পরই ও-বাড়ি থেকে নীলুকে নিয়ে গিয়েছিল। তখনও শাস্ত্রমত গোত্রান্তর হয়নি, চৌধুরারা শুধু দেখতে চেয়েছিল নীলুর ও-বাড়ি মন বসবে কি না।

প্রথম দিন নীলু সারা রাত কেঁদেছিল। ভুলিয়ে রাখতে ওরা ওকে বিস্কুট আর লজেন্স খেতে দিয়েছিল। তবু কেঁদেছিল।

শেষ রাতে পালিয়েছিল নীলু। দরজায় পোষা কুকুর, দেউড়িতে পাথরের সিংহ, কিছুতেই ভয় পায়নি। ভোরবেলা মল্লিকা ঘুম ভেঙে দেখে, ঠিক তার কোলটি ঘেঁষে শুয়ে।—এ যে নীলু।

বেলা হতেই ও-বাড়ি থেকে লোকজন এল। কাড়াকাড়ি করল নীলুকে নিয়ে। নীরদ ধমক দিলেন। মল্লিকাকে জড়িয়ে নীলুর কী কান্না। মল্লিকা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল,—চোখ দু'টো জলছে, না ভিজে গেছে কেউ টের পেল না।

তবু নীলুকে যেতে হয়েছিল।

সেদিন ওরা নীলুকে আরও আদর করলে, হাতে রসগোল্লা দিলে, পরিয়ে দিলে নতুন পোশাক। তবু নীলু ভুলল না, সেই রাত্রে সব পাহারা এড়িয়ে আবার পালাল।

'আবার মার কাছে ফিরে এল ?'

পীতু বলল, 'না দিদি। নীলু আর আমাদের বাড়ি ফিরে আসেনি। কোথায় গেছে কেউ জানে না। পরও হল না, আমাদেরও রইল না, নীলু হয়ত অন্য কোথাও, হয়ত এই কলকাতাতেই, কোথাও লুকিয়ে আছে দিদি।'

'খোঁজ নিসনি ?'

পরদিন পীতু চৌধুরীদের সেই খ্যাপাটে ছোট গিন্নীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ওকে দেখেই ছোট গিন্নী হেসে উঠল। ডাকল, 'আয়। একটাকে তাড়িয়েছি, এবার বুঝি তোকে পাঠিয়েছে ? রোজ একটা একটা বাচ্চা ধরে ধরে খেত, আমি সেই ডাইনি, না ?'

হেসে কুটি-কুটি হল ছোট-গিন্নী। বলল, 'অন্তত চৌধুরীরা তাই ভাবে। না, না তা-তো না, ভাবে আমি ছো—ট্ট খুকিটি। প্রথমে আমাকে চেয়েছিল কতকগুলো পুতুল দিয়ে ভোলাতে। ভুললুম না, তখন আমার কোলে এনে দিল একটা পরের ছেলে। আরে, পরের ছেলে কখনও পোষ মানে। আমি নিজের ছেলে চাই।'

পীতুকে শুনিয়ে শুনিয়ে ছোটগিন্নী বলল, 'শুনেছিস ছুঁড়ি, আমি নিজের ছেলে চাই। আমার শাড়ি, জরি, গহনা গাঁটি সব বিলিয়ে দিতে রাজী আছি, যদি কেউ আমাকে একটি ছেলে দিতে পারে। চৌধুরী অনেক দিন আমাকে ভুলিয়ে রেখেছে, আর ভুলছিনে। আমি নিজেই এবার বেরুব। পালাব এখান থেকে।'

ছোটগিন্নী সত্যিই পালাল। নীলুর ঠিক তিন দিন পরে। সেই থেকে প্রেমাংশু চৌধুরী ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকেন। বিষয়কর্ম দেখা নেই, মোসাহেবরা গেলে বলেন, দূর, দূর। লোকে পুলিশে খবর দিতে বলেছিল। উনি রাজী হলেন না। ফসল ভাল হয়নি, প্রজারা ধন্না দেয়, গাঁ ছেড়ে দলে দলে পলাতে শুরু করেছে, চৌধুরী সব নায়েবের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন। কিছু জিজ্ঞাসা করলে কখনও বলেন পাইক পাঠাও, কখনও বলেন সব জ্বালিয়ে দাও।

গল্প শেষ করে পীতু বলল, 'জমিদারী এবার নীলাম হবে শুনছি। আবার কেউ বলে ওখানে আখের কল বসবে। ওখানে সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে।'

'তুইও তাই চলে এলি? বাবাকে খুঁজতে? এত পথ একলা এলি কী করে পীতু?'

কাউকে কিছু না বলে পীতু ট্রেনে উঠে বসেছিল। দু'টো স্টেশন পার হবার পর পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁকে পীতু বলেছিল কলকাতার কিছু চেনে না, ঠিকানা জেনে নিয়ে তিনিই পৌঁছে দিয়ে গেছেন ওকে।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সুধা বলল, 'চল পীতু, দিদিমাকে প্রণাম করে আসবি।'

অনেক দিন পরে সুধার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়েছে পীতু সত্যিই এসেছিল কি না। পরদিন সকালে উঠে পীতুকে আর দেখতে পায়নি অথচ স্পষ্ট মনে

আছে, পীতু একা কলকাতা এসেছে শুনে দিদিমা চোখ বড়-বড় করে চেয়েছিলেন। ফুলমাসি বাড়ি ফিরে এসে ওকে বকেছিল খুব। সেদিন বিছানা বড় করে পাতা হল, তবু সুধা আর পীতুকে শুতে হল ঘেঁষাঘেঁষি করে। শুধু রাত জেগে গল্প করবে বলেই নয়, বালিশও মোটে একটা। শিয়রের জানালা বন্ধ, একটু পরেই পীতু জানালাটা খুলে দিতে বলেছিল। জানালা খুলে দিল সুধা, তবু পীতু খানিক পরেই উসখুস করতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত নিজেই উঠে গিয়ে জল গড়িয়ে খেয়ে এল এক গ্লাস,—সুধা শুয়ে শুয়েই সব টের পেল। বিছানায় পা টিপে টিপে ফিরে এসে পীতু চুপ করে বসে রইল। সুধা ঘুমিয়েছে কি না পরখ করল একবার, জামাটা খুলে ভাঁজ করে রাখল বালিশের পাশে, গায়ে আঁচল জড়িয়ে গুটি সুটি হয়ে শুয়ে পড়ল। এত খুঁটিনাটি যখন মনে আছে সুধার, তখন তো পীতু সত্যিই এসেছিল। সবটাই তো স্বপ্ন বা মায়া হতে পারে না।

তবু পরদিন সকালে পীতুকে দেখা যায়নি। রাত্রির অন্ধকারে এসে একটি ভেঙে-পড়া গ্রামজীবনের খবর পৌঁছে দিয়েই আবার যেন অন্ধকারেই মিলিয়ে গেছে।

বালিশের নিচে সুধা শুধু একটা চুলের কাঁটা কুড়িয়ে পেয়েছিল। কাঁটাটা তো আর স্বপ্ন নয়।

পীতু চলে যাবার তিন দিন পরে অতসী একদিন নীরদকে আবিষ্কার করেছিল। চৌরাস্তার মোড়ে,—উদভ্রান্ত, সন্ত্রস্ত সেই লোকটিকে চিনতে এক পলক নজরই যথেষ্ট।

আদিত্য সলিসিটরের বাড়ি থেকে ফিরছিলেন,—অতসী হঠাৎ গাড়ি থামাতে বলল। আদিত্য অবাক হয়ে বললেন, 'হঠাৎ ?'

অতসী জবাব দিল না, তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ল। নীরদ বুঝি লুকাতে চেয়েছিল, উপক্রম করেছিল ভিড়ে মিশে যেতে। কিন্তু অতসী সে-সুযোগ দিল না, একেবারে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ডাকল, 'জামাইবাবু।'

নীরদ মাথা নিচু করল।

অতসী বলল, 'কলকাতা এসেছেন আমাদের একবার খবরও নেননি?'

নীরদ বলতে চেষ্টা করল, সময় পাইনি, অনেক কাজ ছিল ইত্যাদি। অতসী কিছু শুনল না, হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল গাড়ির পাশে। দরজা খুলে বলল, 'উঠুন।'

আদিত্য সরে বসে জায়গা করে দিলেন, তিনিও অবাক হয়েছিলেন, কিন্তু এখন কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় না।

বাসার সমুখে এসে নেমে পড়ল অতসী, সম্মোহিতের মত নীরদও নামল পিছে পিছে। আদিত্য গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, 'আজ যাই, অতসী। কাল ফের দেখা হবে।'

ঘরে ঢুকেই অতসী দরজাটা ভেজিয়ে দিল। জলচৌকিতে নীরদকে বসতে দিয়ে বলল, 'বসতে দিলুম পিড়ে। শালিধানের চিড়ে নেই, নইলে জামাইকে তাও না-হয় দেওয়া যেত। এবারে বলুন তো জামাইবাবু, এসব পাগলামি করছেন কেন।'

২৬

যেদিন ছাতে দাঁড়িয়ে সুধা দেখেছিল আদিত্য মজুমদারের গাড়িটা ও
বাড়ির সমুখে এসে দাঁড়াল। প্রথমে নামল ফুলমাসি, তার পিছনে মাথা
নীরদ। সুধা নিচে নেমে এল তাড়াতাড়ি, ততক্ষণে ফুলমাসি ওর বাব
নিয়ে বাইরের ঘরে ঢুকেছে। ছাত থেকে একতলায় পৌঁছতে এক মিনি
লাগেনি, কিন্তু দরজা পর্যন্ত এসে সুধার আর পা সরল না; ভিতরে যাবে
যাবে না ঠিক করতেই মিনিট দুই কেটে গেল।

টের পেল ফুলমাসি বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, টুল পেতে দিয়ে
একটা ঠাট্টা করল বাবাকে, তারপর হঠাৎ গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনি এ
পাগলামি কেন করছেন বলুন তো, জামাইবাবু?'

দরজার আড়াল থেকে সব শুনল সুধা। ভিতরে আর যাওয়া হল না।

অনেক পরে নীরদকে আস্তে আস্তে বলতে শোনা গেল, 'দিব্যি
লুকিয়েছিলাম, আমাকে আবার কেন টেনে আনলে অতসী।'

অতসী বলল, 'আশ্চর্য আপনার বিবেচনা।'

নীরদ প্রতিবাদ করলেন না, সরল সহজ হেসে বললেন, 'তা একটু আ
বটে।'

সেই নিশ্চিন্ত হাসির রকম দেখে অতসীর শরীর জ্বলে গেল। উনুনে র
কেৎলির মত ফোঁস-ফোঁস করে বলল, 'বাড়িঘর ফেলে এসেছেন, পালিয়ে পালি
বেড়াচ্ছেন। ভাবছেন, দিনকতক গা-ঢাকা দিতে পারলেই বেঁচে গেলে
ঠিক উটপাখিদের মত। জানেন, কচি এক ফোঁটা মেয়ে আপনার খোঁ
এসেছিল? দিদি ভেবে ভেবে পাগল হয়ে গেছে জানেন?'

'পাগল হয়ে গেছে?' নীরদ তবু চঞ্চল হলেন না, মৃদু-মৃদু হেসে বললে
'পাগল হয়ে গেছে? তবে তো মল্লিকা বেঁচে গেছে।' অতসীর রুষ্ট-বিস্মি

মুখের দিকে চেয়ে বক্তব্যটা শেষ করলেন, 'আমি তো অনেক চেষ্টা করেছিলুম পাগল হতে, পারলুম না।' দীর্ঘ চুলগুলো আঙুল দিয়ে বিস্রস্ত করে নীরদ বললেন, 'পাগল হতে পারলেই লোকে নিজেকে ঠিক ঠিক বুঝতে পারে। জানলে অতসী, তার আগে একটা মোহের খোলশে স্বরূপ ঢাকা থাকে।'

এবার অতসী আর নিজেকে সামলাতে পারল না। তীব্র গলায় বলে উঠল, 'থিয়েটার—থিয়েটার। আপনার এতখানি বয়স হল জামাইবাবু, এত ঘা খেলেন তবু জ্ঞান হল না। এখনও টের পেলেন না, জীবনটা নাটক নয়। আমার দিকে চেয়ে বলুন তো, কেন কলকাতা এসেছেন, কেন সব দায়িত্ব অস্বীকার করে পালিয়ে ফিরছেন।'

'পালিয়ে ফিরছি না তো,' নীরদ ধীরে ধীরে বললেন, 'আমি এসেছি সুধন্ব রায়কে খুঁজতে।'

'কী হবে তাকে দিয়ে।'

'সে আমার খাতা চুরি করেছে। খাতা ফেরৎ পেলেই দেশে ফিরে যাব।'

'পালার খাতা। সেই পালা, সেই নাটক', অতসী হতাশ গলায় বলল, 'আশ্চর্য জামাইবাবু, আপনি এখনও বুঝছেন না, এ-সবে পেট ভরে না। বেঁচে থাকাটা নাটক-লেখার চেয়ে শক্ত ব্যাপার। এর চেয়ে আপনি যদি—'

এতক্ষণ নীরদ চুপ করে শুনছিলেন, হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'তুমি কি বলবে জানি অতসী। এর চেয়ে আমি কোন একটা চাকরি-বাকরি নিলে অনেক নিশ্চিন্তে জীবন কাটাতে পারতুম, না?'

অতসী বলল, 'এখনও সময় আছে।'

চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন নীরদ।—'না অতসী, আর সময় নেই। আজ আমার বয়স হল প্রায় পঞ্চাশ, সারাটা জীবন এই লেখা নিয়ে কাটালাম। আজ তোমরা বলছ সে-সব লেখা নয়, খেলা, কিছু হয়নি। হয়ত খেলা, আমি নিজেও টের পাচ্ছি। কিন্তু সেকথা স্বীকার করতে সাহস পাই কই অতসী। এতদিনের সব কিছুর ওপর ঢ্যাড়া টেনে আবার নতুন করে সব শুরু করব, সে-শক্তি কই, সে-বয়স কই আমার। অর্ধভুক্ত, অভুক্ত থেকে

অনেক রাত জেগে যা-কিছু লিখেছি, এতদিনে নিশ্চিত জেনেছি তার সব বাজে, লোকে তা নেবে না। কিন্তু জেনেও বাকি ক'টা দিন আমাকে তাই আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে, মা যেমন করে মরা শিশুকে আগলে থাকে, দেখনি? যখনই তাকে ছিনিয়ে নেয়, অমনি মা মূর্ছিত হয়ে পড়ে। জীবিত ভ্রমে যতটুকু সময় সে মৃত শিশুকে ধরে থাকে, ততটুকুই তার শান্তি।'

একটু থেমে নীরদ বললেন, 'ভাবছ ফের বক্তৃতা করছি। একটু করতে দাও, বাধা দিও না। সকলে মিলে যে লেখাগুলোকে অস্বীকার করেছে, আমি নিজেও সেই সুরে সুরে মিলিয়ে তাকে অস্বীকার করতে পারব না, অতসী। সে বড় নিষ্ঠুরতা হবে। কানা-খোঁড়া ছেলের পিতৃত্ব যে অস্বীকার করে সে অমানুষ। এই ভুল নিয়েই আমাকে বাকি ক'টা দিন বাঁচতে হবে। তাই কলকাতা এসেছি। সুধন্য রায় আমাকে শুধু খাতা ক'টা ফেরৎ দিক, আর কিচ্ছু চাইব না, কিচ্ছু না। আবার সেই গ্রামে ফিরে যাব।'

'তবু পথ বদলাবেন না?' অতসী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করল।

'পথ?' নীরদ ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'না অতসী, বদলাব না। ধর কোথাও যেতে বেরিয়েছি, খানিকটা এগিয়ে দেখলে দু'টো রাস্তা গেছে দু'দিকে। একটা বেছে নিলে। অনেকটা এগিয়ে গেলে, মাইলের পর মাইল, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তবু পথ ফুরোয় না। হঠাৎ কারও মুখে শুনলে, এ টা ভুল পথ। ঠিক রাস্তায় যেতে হলে অনেক, অনেক মাইল পিছিয়ে আবার এগোতে হবে। তখন ক'জন আছে অতসী, যারা সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই বসে পড়বে না? ক'জন আছে যারা সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন দেহ নিয়ে অন্ধকারে আবার ঠিক পথের খোঁজে যাবে বলে তৈরি হতে পারে?'

'ভুল পথের ধুলোতেই বসে থাকবেন?'

ম্লান হেসে নীরদ বললেন, 'আগেই তো বলেছি, উপায় নেই। আর, ভুল কি একটা অতসী, কত ভুল যে করেছি ঠিক নেই। আজ তোমাকে খোলাখুলি সব বলি। কোনদিন সংসারের দিকে চাইনি, শুধু লিখেছি। মল্লিকাকে ঠকিয়েছি। ভাবতুম আমি স্রষ্টা, শিল্পী,—আসলে কী স্বার্থপর

ছিলুম তুমি জান না। রাত জেগে লিখেছি। ছেলেমেয়েরা কেঁদে উঠেছে, তাদের কর্কশ গলায় ধমক দিয়েছি। যাকে কিছু দিইনি, সেই মল্লিকা ভয়ে ভয়ে ওদের নিয়ে বাইরে গেছে, হিমে-ভেজা উঠোনে পায়চারি করেছে। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেছে ওরা ঘুমোয়নি, মল্লিকা ভেতরে আসতে সাহস পায়নি চাপা গলায় কেঁদেছে, টের পেয়েছি, তবু ওকে ডেকে আনিনি। লিখেই গেছি, শুধু কি সৃষ্টির মোহে, অতসী ?'

অতসী জবাব দিল না, নীরদ নিজেই বলে গেলেন, 'তখন ভেবেছি তাই। এখন বুঝেছি, সেটা ছিল খ্যাতির মোহ। তখন কি জানি আমার ভেতরে দু'জন আলাদা হয়ে গেছে ? একজন শিল্পী, সব ভুলে শুধু রচনা করেছে ; আরেকজন লোভী, মনে মনে ফুলের মালা আর হাততালির জন্যে লোলুপ হয়েছে ?' চোখের পাতা ভিজে উঠল নীরদের, গাঢ় স্বরে বললেন, 'সেই কাঙালটাই শেষ পর্যন্ত জিতেছিল, শিল্পীকে পিষে মেরেছিল, নইলে, বেশ তো ছিলুম, সুধন্য রায়ের হাতে হঠাৎ কেন খাতাগুলো সঁপে দিতে গেলুম। কেন অর্থ, কেন যশ কামনা করলুম অতসী, না করলে সব তো এমন একদিনে ভুল হয়ে যেত না।'

নীরদ চুপ করলেন, দু'হাতে মাথা ডুবিয়ে কিছুক্ষণ মৌন হয়ে রইলেন। রাত-কিরাতের বাণে বিদ্ধ একটা পাখি কিছুক্ষণ ছটফট করে যেন একেবারে চুপ করে গেল।

অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলে নীরদ বললেন, 'সুধাকে একবার ডাক তো অতসী, একবার দেখি।'

নীরদ সেদিনই চলে গিয়েছিলেন। সুধাকে নিয়ে অতসী যখন ঘরে ফিরে এল, নীরদ তখন অন্যমনস্ক, কাউকে দেখতে পাননি।

অতসী বলল, 'জামাইবাবু, সুধা এসেছে।'

সুধার চোখে চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন নীরদ, ব্যাকুল হয়ে মেয়ের হাত দু'টি টেনে নিলেন মুঠিতে।

কোন কথা হয়নি। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে নীরদ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'চলি।'

'মার সঙ্গে দেখা করবেন ?'

নিমেষমাত্র ইতস্তত করলেন নীরদ, বললেন, 'না থাক।'

শশাঙ্কর সঙ্গে অতসীর ঝগড়া হয়ে গেল এরও দিন দুই পরে।

অতসী বাইরে যাবে বলে তৈরি হচ্ছিল, শশাঙ্ক ভিতরে উঁকি দিয়ে বলল, 'আসব অতসী ? একটু জরুরী পরামর্শ ছিল তোর সঙ্গে।'

অতসী বলল, 'এস।'

ঘরে বসবার আসন নেই, শশাঙ্ক সোজা জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, বাইরের দিকে চেয়ে বলল, 'কেতকীর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে ?

'হয়েছে।'

'কী ঠিক করেছিস।'

অতসী হেসে ফেলল।—'ঠিক তো করবে তোমরা। তোমাদের নাকি বিয়ে হবে, সব ঠিকঠাক ? আমাকে উলু দিতে হবে এই তো। ঠিক সময়ে দিয়ে দেব দেখো, কিছু ভাবতে হবে না।'

শশাঙ্ক গম্ভীর গলায় বলল, 'ঠাট্টা নয় অতসী।'

অতসী বলল, 'ওরে বাবা, ঠাট্টা কি করতে পারি। তুমি গুরুজন, তাতে আবার বোমার দলে ছিলে ; কী রাশভারী ছিলে তখন। আমাকে নভেল পড়তে দেখে একবার শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছিলে, মনে নেই ? তখন তো তোমাকে শুধু গীতা আর মোহ-মুদ্গর পড়তে দেখেছি ছোড়দা। কী হ'ল সে-সব বই,—পুড়িয়ে ফেলেছ ?'

'ইয়ার্কি রাখ্।' শশাঙ্ক ধমক দিয়ে উঠল, 'তুই আদিত্য মজুমদারের কাজ ছাড়বি কিনা বল। এখনও প্রভাত মল্লিক আমাকে কাজে নেয় অতসী, তুই যদি তার হয়ে ক্যাম্পেন করতে রাজী হ'স।'

কঠিন হয়ে অতসী বলল, 'তা আর হয় না ছোড়দা। অনেক দূর এগিয়েছি, আর ফেরা যায় না। আর, প্রভাত মল্লিকের বিশেষ করে আমাকেই চাই

কেন বলতো। কর্মী চাই, বেশতো, তোমার কেতকীকে ক্যাম্পেনের কাজে ভিড়িয়ে দাও না।'

অন্ধকার মুখে শশাঙ্ক বলল, 'তুই কিছু বুঝিস না অতসী। এ কি কেতকীর কাজ।'

অতসীর মুখও কাল হয়ে গিয়েছিল, সেই কালিমা ঢাকতেই সে বুঝি জোরে জোরে হেসে উঠল।—'তোমাকে ধন্যবাদ ছোড়দা। অন্তত স্পষ্ট করে একটা কথা বলতে পেরেছ। কেতকী কুলবধূ, লক্ষ্মী, ইলেকশনের দালালির মত নোংরা কাজ তাকে মানায় না, এই তো?'

অপ্রতিভ শশাঙ্ক বললে, 'তা কেন, তা কেন। আমি বলছিলুম কি কেতকী একেবারে ছেলেমানুষ—'

দপ করে জ্বলে উঠল অতসীর চোখ, আবার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অতি ধীর কণ্ঠে বলল, 'আমিও একদিন ছেলেমানুষ ছিলুম দাদা।'

শশাঙ্ক অপ্রসন্ন গলায় বলল, 'তুই সব কিছুরই বাঁকা অর্থ করছিস। এই সোজা কথাটা বুঝতে পারছিস না, আমাদের দু'জনকে সুখী হতে দেবার চাবি তোরই হাতে রয়েছে,—আমি, দাদা হয়ে তোকে বলছি।'

রূঢ় গলায় হেসে উঠল অতসী।

'মোহমুদ্গার যখন তোমার বালিশের পাশে থাকত, সে-বই লুকিয়ে আমিও পড়েছি ছোড়দা। কা তব কান্তা, কস্তে পুত্র এমনভাবে মুখস্ত করে নিয়েছি, আজও ভুলিনি। তুমি কিন্তু শ্লোকগুলো একেবারে ভুলে গেছ?'

শশাঙ্ক বলল, 'অর্থাৎ?'

'মার মুখের দিকে চাওনি, আমার কথা ভাবনি, শ্বশুরঘর ঘুচিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম, তখনও সংসারের জন্যে আমাকে খাটিয়ে নিতে তোমার বাধেনি। আজ সেই-তুমি কেতকীর মায়ায় পড়ে গেছ দেখে এত দুঃখেও আমার হাসি পাচ্ছে ছোড়দা।'

শশাঙ্ক বলল, 'শ্বশুরবাড়ি তোর ঘুচে গিয়েছিল সে-জন্যে আমি দায়ী নই অতসী।'

'জানি তুমি বলবে দায়ী আমার ভাগ্য। কিন্তু তোমাদেরও দায়িত্ব একটুখানি আছে বৈকি। নেহাৎ লেখাপড়া না-জানা পল্লী বালিকাটি ছিলুম না, বাবা লেখাপড়া কিছুদূর শিখিয়েছিলেন, আমার চোখ ফুটেছিল। তবু কেন আমাকে নিজের পথ বেছে নিতে দিলে না। দিনের পর দিন এক একটি পাত্রপক্ষ এনে দাঁড় করিয়েছ। তারা চুল খুলিয়ে, হাঁটিয়ে আমার পরীক্ষা নিয়েছে। একটা শিক্ষিত মেয়ের সঙ সেজে পণ্য হয়ে পরের সমুখে দাঁড়ানর কী যে গ্লানি, কোনদিন তোমরা বোঝনি, বুঝতে চাওনি। এ-যেন পা দু'খানা বড় হয়ে গেছে, তবু তাকে ছোট মাপের জুতোয় ঢোকানোর চেষ্টা। তুমি জান না ছোড়দা, ওরা যখন আমার হাতের তেলো টিপে টিপে নরম কিনা পরীক্ষা করত, গোড়ালির ওপর শাড়ি তুলে পায়ের গোছ পরখ করত তখন আমার সারা শরীর জ্বলে গেছে, বার বার নিজের মৃত্যুকামনা করেছি। টাকা দেখে একটা মাঝবয়সী দুশ্চরিত্র লোকের হাতে তুলে দিলে, সে-ঘর করতে আমার রুচিতে বাধল, দু'দিনেই পালিয়ে এলুম।'

শশাঙ্ক গর্জন করে উঠল,—'মিথ্যে কথা। নিজের দোষ ঢাকতে তুই ওই কথা রটিয়েছিস। আমি আসল কথা জানি। তোর শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই তোকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।'

অতসী ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল,—'তাড়িয়ে দিয়েছিল?'

শশাঙ্ক নির্দয় গলায় বলল, 'দিয়েছিল। তুই যখন এত কথা বললি তখন আমিও সব ফাঁস করে দি। ওরা কী করে টের পেয়েছিল সেই বাউণ্ডুলে নীলাদ্রি ছোঁড়াটার সঙ্গে তোর মাখামাখির কথা। মানী বংশ, সহ্য করবে কেন। তোকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে। তুই ফিরে এসে সে-কথা স্রেফ চেপে গিয়েছিলি।'

ক্লিষ্ট হেসে অতসী বলল, 'আশ্চর্য তোমার খবর সংগ্রহের প্রতিভা। তুমি পুলিশের গোয়েন্দা হলে না কেন ছোড়দা?'

এতক্ষণ প্রার্থীমাত্র ছিল, হঠাৎ শশাঙ্কর সাহস বেড়ে গেছে। শাসন করার সুরে বলল, 'ও-সব ফাজলামো থাক! তুই আদিত্য মজুমদারের কাজ ছাড়বি কিনা বল।'

অতসী বলল, 'না।'

'না? এত তেজ তোমার?'

দৃঢ়তর স্বরে অতসী বলল, 'হাঁ, এতই তেজ। এই তেজ তোমার মনিব প্রভাত মল্লিককে পর্যন্ত দেখিয়ে এসেছি ছোড়দা, তুমি ত তার বরখাস্ত চাকর মাত্র।'

ভ্রূ কুঞ্চিত করে শশাঙ্ক বলল, 'এতই টান? আদিত্য মজুমদার তোমাকে কী দেবে, শুনি?'

'শুনবে? তবে শোন। প্রভাত মল্লিককে বলিনি, কিন্তু তুমি হাজার হলেও ভাই, তোমাকে বলি। নিজের সুখের স্বপ্নে তুমি অন্ধ হয়ে গেছ ছোড়দা। আর কারুরও যে স্বপ্ন থাকতে পারে, সাধ থাকতে পারে, সে কথা তোমার মনে ঠাঁইও পায় না। অনেক ঠকে ঠকে আমিও আমার সুখের পথ চিনে নিয়েছি। আদিত্য মজুমদার আমাকে বিয়ে করবে।'

হো-হো করে হেসে উঠল শশাঙ্ক, একটা নিষ্ঠুর বিদ্রূপে ওর মুখটা পর্যন্ত কুৎসিত হয়ে গেছে। ঢেউয়ের-পর-ঢেউ হাসি আঘাত করল ঘরের দেয়াল, একটা হঠাৎ-বাতাসে দরজার পর্দাটা প্রবল ভাবে নড়ে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

'অসভ্যতা কর না', অতসী বলল।

হাসি থামিয়ে শশাঙ্ক বলল, 'একটু আগে তুই আমাকে স্বার্থ-অন্ধ বলেছিলি কিনা, তাই হাসলুম। আমি যদি স্বার্থ-অন্ধ, তুই তবে স্বপ্ন-কানা। আদিত্য মজুমদারের মহিমার থৈ এখনও পাস্‌নি।'

'কী বলতে চাও স্পষ্ট করে বল, ছোড়দা।'

শশাঙ্ক বলল, 'আদিত্য তোকে বিয়ে করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে নিশ্চিন্ত হয়ে আছিস, কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখেছিস, এই প্রতিশ্রুতি সে আরও কতকজনকে দিয়েছে?'

অতসী বলে উঠল, 'মিথ্যে কথা, তোমরা ঈর্ষার বশে যা-তা রটাচ্ছ।'

'ঈর্ষা, তোকে ঈর্ষা? না অতসী, যত অভাবগ্রস্তই হই না কেন আমরা পুরুষ। বড় জোর অন্য কোন পুরুষের ঐশ্বর্যকে ঈর্ষা করি, স্ত্রীলোকের সৌভাগ্যকে কখনও না। যা জানি তার আভাসমাত্র তোকে দিয়েছি।'

থর থর করে কাঁপছিল অতসী, রুদ্ধস্বরে বলল, 'কী জান।'

নিষ্ঠুর, অবিচল গলায় শশাঙ্ক বলে গেল, 'জানি যে আদিত্য মজুমদার বিবাহিত।'

'কোথায়—কোথায় তবে সেই স্ত্রী ?'

'ঠিক জানিনে, শুনেছি পশ্চিমে কোন স্বাস্থ্যাবাসে। আদিত্য তাকে পরিত্যাগ করেছে।'

'আর', কম্পিত কণ্ঠে অতসী বললে, 'আর কী জান, ছোড়দা ?'

'জানি কোন স্বনামধন্যা অভিনেত্রীর সঙ্গে আদিত্যের ঘনিষ্ঠতা আছে! ওদের একসঙ্গে দেখেছে কলকাতায় অন্তত এ-রকম দু'শো লোক আছে, কিন্তু তুই এমন চোখ বুজে আছিস—কোন খবরই রাখিসনে অতসা।'

মনের জোর হারিয়েছিল, তাই বুঝি অতসী গলায় সবটুকু জোর ঢেলে দিয়ে বলল, 'বিশ্বাস করি না। করলেও কেয়ার করি না। আদিত্য মজুমদার আমার সঙ্গে কথার খেলাপ করতে সাহস পাবে না।'

'এত জোর ?'

'এতই জোর। তুমি এতক্ষণ যা বললে, সে-সব গুজব মাত্র, কিন্তু আদিত্যের অনেক কীর্তির প্রমাণ আমার কাছে আছে। প্রয়োজন হলে সে-সব প্রকাশ করতেও পেছ-পা হব না।'

ক্রুর হেসে শশাঙ্ক বললে, 'সবাইকে বলে যাবি পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি ? কিন্তু তুই নিজেও তো রেহাই পাবিনে। কলঙ্কের ছিটে তোর নিজের গায়েও কিছু লাগবে অতসী।'

অতসী বলল, 'লাগুক। স্বদেশী আমলে যারা রাজপুরুষদের গুলী করতে যেত, তাদের অনেকে পুলিশের গুলীতেও তো মরত। মেরে তবে মরত। আমি মরবার জন্যে তৈরিই আছি ছোড়দা।' বলতে বলতে হঠাৎ ধৈর্য হারিয়ে ফেলল অতসী, প্রায় আদেশের সুরে বলল, 'বকে বকে আমার মাথা ধরে গেছে। ছোড়দা, তুমি এবার যাও তো।'

২৭

একটা মশা বহুক্ষণ ধরে অতসীকে বিরক্ত করছে। তাড়িয়ে দিলেও উড়ে উড়ে আসে, কখনও কপালে, কখনও গ্রীবামূলে, কখনও কানের ভাঁজে বসে গুন গুন গান গায়। হাতটা মাঝে মাঝে তোলে অতসী, বিরক্ত ভ্রূ কুঞ্চিত করে, মশাটা তবু ধরা দেয় না, পালায়, দেয়ালে মুহূর্তেক বসে, ফের ফিরে আসে। কয়েক মিনিটেই অতসী অস্থির হয়ে উঠল।

হয়ত শুধু মশাটাই নয়। কতটুকু বা প্রাণী, ওর হুলে কী-ই বা বিষ। অতসীকে অস্থির করেছে ভাবনা, ঠিক যেন মশাটারই মত, উড়িয়ে দিলেও ফিরে আসে, বার কয়েক গুন গুন করে, তার পরেই সুযোগ বুঝে দংশন করে ঠিক চর্মমূলে। কী বিষ, কী জ্বালা। মশাটা অতসীকে বসতে দিল না সুস্থির হয়ে, ভাবনাটা টি কতে দিল না ঘরে।

পথে বেরিয়ে এল অতসী, গলি পেরিয়ে সদর রাস্তায় পড়ল। এখন সবে সাড়ে দশটা, অফিসমুখী জোয়ার শেষ হয়নি। তোড়ের পর তোড় আসছে—ট্রাম-বাস, গাড়ি-ঘোড়া, আর পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনার মত অগুণতি লোক। সামনের মোড়ে একটা চ্যাপটা পিপের উপরে ঘর্মাক্ত পুলিশ কলের পুতুলের মত হাত তোলে, নামায়, অনর্গল স্রোত মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ায় ফের চলতে শুরু করে। কোথা থেকে ভলান্টিয়ার-বোঝাই গোটা তিনেক লরী ছুটে এল, পীচবাঁধান ফাঁপা পথ থরথর কেঁপে উঠল, প্রবল উল্লাসে জয়ধ্বনি দিলে ছেলেরা। আদিত্য মজুমদারের দল নয়, এরা এই ওয়ার্ডের প্রার্থী যতীশ বিশ্বাসের সমর্থক। অতসীর মনে পড়ল, ঠিক পাঁচ দিন পরেই ইলেকশন। ঠিক তখনই বিপরীত দিক থেকে এল আর দুখানা ট্রাক, তেমনি লোক-বোঝাই, আগেকার লরীর লোকদের লক্ষ্য করে কী-একটা কুৎসিত টিটকিরি দিলে। সঙ্গে সঙ্গে এদিক থেকে জবাব গেল, বিকটতর হুঙ্কার ছাড়লে

ওদিককার লোক। দাঁড়িয়ে-পড়া বাসের জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে একজন বললেন, এবার ঢিল পড়বে, পটকা ফাটবে। ভালয় ভালয় অফিসে পৌঁছতে পারলে বাঁচি। পিপে থেকে নেমে এল পুলিশ, পাগড়িটা নড়ে গেছে, সামলাবার সময় নেই, হাত নেড়ে নেড়ে কী হুকুম দিলে লরীগুলোকে, চেঁচামেচি আরও বেড়ে গেছে। অতসী বিব্রত, ভাবলে ফের গলিতে গিয়ে ঢোকে, কিন্তু গেল না, দাঁড়িয়ে রইল, সম্মোহিত অথচ অস্বস্তিগ্রস্ত।

ঘটনা বেশিদূর গড়াল না। আরও খানিকটা গালিগালাজ চালাচালি হল দু তরফ থেকেই, কিন্তু বোমা ফাটল না, ঢিল পড়ল না, খানিকটা ক্লীব আস্ফালন আর কুৎসিত অঙ্গভঙ্গির পর ক্লান্ত লোকগুলো নিজেরাই ক্ষান্তি দিল, ট্রাক চলল, পুলিশ উঠল গিয়ে পিপেয়।

কপালের ঘাম মুছে অতসী চলতে শুরু করল। ভিড়ে পথ চলার সুবিধে এই নিজেকে বিশেষ কিছু করতে হয় না পা দুটোও যন্ত্রের মত স্বয়ংক্রিয় হয়ে পড়ে, দু-চারজন বড়জোর ঘেঁষাঘেঁষি করতে চাইবে, কিন্তু জনহীন পথে একা চলার চেয়ে সেটা ঢের নিরাপদ।

চৌরাস্তায় এসে অতসী ফের বিমূঢ় হয়ে পড়ল—এবার কোন্ দিকে। যানবাহনের স্রোতের ধারা তেমনি অব্যাহত, একটা মূঢ়, পরবশ সরীসৃপ সত্তা যেন অনিবার্য, অন্ধবেগে এগিয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে লাল-নীল আলো সঙ্কেতে সে স্তম্ভিত হয়, চলে, দাঁড়ায়, চলে।

মোড় থেকে খানিকটা এগিয়ে একটা গাড়ি ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, কৌতূহল ছিল না, অনেকটা অন্যমনস্কভাবেই অতসী ভিতরে তাকাল। পিছনের সীটে একটি মেয়ে। খুব ঘটা করে সেজেছে সন্দেহ নেই—নিপুণ টানে আঁকা ঈদের চাঁদ ভুরু, সুর্মাকৃষ্ণ পক্ষ্মীরেখা, আর মুখের চামড়ার অনেক পাউডার-ছাই উড়িয়ে বাদ রঙের রতন মেলে।

এ-মেয়েটিকে কিম্বা এমনি আরও কাউকে অতসী এর আগেও দেখেছে, কিন্তু কবে কোথায়, হঠাৎ স্মরণ হল না। ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবতেই মনে হল, হয়ত কোন থিয়েটারে। মেয়েটি সম্ভবত অভিনেত্রী। আর প্রায় সঙ্গে

সঙ্গে ক্রু-ভাবনাটা আবার মনের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। শশাঙ্ক না বলেছিল আদিত্য কোন অভিনেত্রীর প্রণয়াসক্ত?

কী ভেবে নিকটতম একটা ডাক্তারখানায় ঢুকল অতসী, কাউন্টারের লোকটিকে বলল, 'ফোন করব।' লোকটা ইঙ্গিতে টেলিফোনটা দেখিয়ে দিল।

নির্দিষ্ট নম্বর বলবার পরেও বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল, অপর প্রান্ত থেকে সাড়া নেই। বিরক্ত হয়ে কলটা টিপল বার বার, টের পেল কাউন্টারের লোকটা। উৎসুক হয়ে ওর মুখের দিকেই চেয়ে আছে, ধৈর্য হারিয়ে অতসী বার বার বলতে থাকল, হ্যালো, হ্যালো।

অনেক, অনেক পরে, কে জানে, কত মিনিট, ঘন্টা না যুগ, ও-পার থেকে সাড়া এল, 'নো রিপ্লাই।'

জবাব নেই। অতসী বিস্মিত হল, এমন সময় আদিত্যের বাড়িতে গরহাজির থাকবার কথা নয়। খুচরো পয়সা ক'আনা কাউন্টারে রেখে ফের রাস্তায় এল অতসী, আবার ফিরে গিয়ে বলল, 'আরেকটা ফোন করব।'

যেখানে-যেখানে আদিত্যর থাকবার সম্ভাবনা, একে একে সব ক'টা নম্বরই চাইল অতসী, ব্যাগ থেকে কেবলি খুচরো পয়সা কাউন্টারে রাখে, ফোন তোলে, নম্বর চায়। একই জবাব আসে। আদিত্য? না, আদিত্য তো এখানে নেই।

পরবর্তীকালে অতসী বহুবার এই দিনটির কথা ভেবেছে। তখন দিনটি বহুদূর সরে গেছে, নৈকট্য নেই, জ্বালাও নেই, সেটা কতকটা ঘষা কাঁচের ভিতর দিয়ে সূর্যগ্রহণ দেখার মত। প্রেতরোহিণী গোবিন্দলালকে পুকুরঘাট দেখিয়ে বলেছিল, 'এইখানে, এমন সময়ে আমি ডুবিয়াছিলাম।' অতীত অতসী কোন গোবিন্দলালকে নয়, নিজেকেই ইশারায় বলেছে, এই দিনে, এমনই সময়ে—

সেদিন কিন্তু অতসী রাস্তায় বেরিয়ে এসে আকাশের দিকেও চাইতে পারেনি। বেলা তখন ঠিক দুপুর, আকাশটিকে মনে হয়েছিল অতিকায় একটা কালো কড়াই, অদৃশ্য দানবেরা মিলে কঠিন, উজ্জ্বল ধাতুপিণ্ডবৎ সূর্যকে জ্বাল দিয়ে গলিয়ে ফেলছে। পথে তেমনি কর্কশ কলরব, অনর্গল উচ্ছৃঙ্খল গতির সমারোহ।

প্রথমে যে ট্রামটা গেল সেটাতেই অতসী উঠে বসেছিল।

আদিত্যের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়ল দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার। ত্যাগী দেশসেবক আদিত্য মজুমদারকে ভোট দিন। ধামার বাক্সে ভোট দিবেন না, ইত্যাদি। আদিত্যের বাড়ির ঠিক সমুখেই ছোটখাটো একটা জটলা, অতসীর বুকের ভিতরে ছ্যাঁৎ করে উঠল। কী হয়েছে তবে আদিত্যর। কোন বিপদ—মনের বিবর থেকে ভয়ের একটা কেঁচো বেরিয়ে গুটিগুটি এগোতে থাকল।

যারা জটলা করছিল, অতসীকে তারা চেনে, পথ ছেড়ে দিল। কিন্তু অতসীকে বেশিদূর যেতে হল না, লোহার ফটকে বিশাল একটা তালা। প্রবেশের পথ বন্ধ।

শুকনো পাতার মর্মরের মত ঝিরঝিরে একটা চাপা হাসির স্রোত বয়ে গেল, জটলাকারীদের একজন এগিয়ে এসে বলল, 'কোথায় যাচ্ছেন দিদিমণি, কেউ নেই।'

অতসী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনল মুখ থেকে মুখে। আদিত্যর ভলান্টিয়ার এরা,—অনেককেই সে চেনে।

'কেউ নেই?'

যে লোকটি এগিয়ে এসেছিল সেই জবাব দিলে, 'কাল রাত্তির থেকেই আদিত্য মজুমদার বেপাত্তা। আজ সকালেই দেখছি দরজায় তালা ঝুলছে।'

পিছন থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলল, 'ভেবেছিলুম আপনি জানেন। তা দেখছি আপনাকেও কিছু বলে যান নি।'

'আপনাকেও' কথাটায় একটা কুৎসিত ঝোঁক ছিল, কিন্তু অতসী এখন সেটা গায়ে মাখলে না। নির্জীব গলায় বললে, 'না, আমাকেও কিছু বলে যান নি।'

আরেকটি কর্কশ কণ্ঠ বলে উঠল, 'সব শালার জোচ্চুরি। এ্যাদ্দিন গলা ফাটালুম, একটা পয়সা হাতে এল না। রেশনের দোকানে বাকি, পেট্রলের দোকানে বাকি,—শালা বেমালুম সটকে পড়েছে।'

আপসোস করতে শোনা গেল একজনকে, 'এর চেয়ে মাইরি, যদি চল্লিশের

ওয়ার্ডের পরমানন্দবাবুর হয়ে লড়তুম। ওখান থেকেও অফার এসেছিল। খাওয়াদাওয়া বাদে রোজ নগদ দুটি করে টাকা।'

কে বলে উঠল, 'প্রভাত মল্লিকও তো—'

ক্ষুব্ধ গুঞ্জনটা ক্রমশই বাড়তে থাকল, হিংস্র, সন্দিগ্ধ জনপিণ্ডের সমবেত দৃষ্টির জ্বালা সইতে না পেরে অতসী অনুচ্চ গলায় বলে উঠল, 'কখনও উনি নিজের ইচ্ছায় যান নি। আজ বাদে কাল ইলেকসন। কোথায় যাবেন। হয়ত—হয়ত—'

চকিতে একটা সম্ভাবনার কথা অতসীর মনে হল। হয়ত প্রভাত মল্লিকই আদিত্যকে সরিয়েছে, গুম করে রেখেছে কোথাও। ইলেকসনে এমন হয়, এদেশে না হ'ক, অনেক বিদেশী নজির অতসীর জানা।

দ্রুত-কম্পিত পায়ে ভিড়ের ভিতর থেকে পথ করে অতসী বেরিয়ে এল, পিছন থেকে তখনও টিটকিরি কানে আসছে,—'এ-মাগীও শয়তান। সব জেনেশুনে ন্যাকা সেজে আছে।'

কে একজন বলে উঠল, 'ধাওয়া করব নাকি পিছু-পিছু। একটু টাইট দিলেই পেট থেকে সব কথা সুর সুর করে বেরিয়ে পড়বে।'

আরেকজন বললে, 'বাবা, আমাদের সঙ্গে চালাকি। ফাঁকি দিয়ে দু'টিতে মিলে সটকে পড়বার মতলব। চ', চ' মাইরি, দৌড়ে গিয়ে ছুঁড়িকে ধরি।'

অতসীর মনে হল একসঙ্গে অনেকগুলো থপথপ পা ওকে তাড়া করেছে। এতবার মনে হল ওর আঁচলটা খপ করে পিছন থেকে চেপে ধরল কেউ, সামলাতে গিয়ে শাড়ির পাড় জুতোয় জড়িয়ে গেল। সব আতঙ্ক রোমকূপে-কূপে ঘাম হয়ে ফুটল, চোখে ফোঁটা ফোঁটা নোনা জল। কী চায় এই ছোকরারা, কী করবে তাকে নিয়ে। আদিত্যের উপরে যত আক্রোশ, তার সব শোধ কি তুলবে অতসীকে দিয়ে। সামনে থেকে আগলে ধরেছে দু'জন, পিছন থেকেও তাই। ছুটে এদের হাত থেকে রেহাই পাবার উপায় নেই।

একজন ওর কব্জি চেপে ধরে রুক্ষ গলায় বলল, 'এখনও বল্, কোথায় আছে আদিত্য।'

পাংশু মুখে অতসী বলল, 'জানি না। ছেড়ে দিন। ভদ্রমহিলাকে অপমান করছেন আপনারা।'

অনেকগুলো গলা এক সঙ্গে কটু টিটকিরি দিয়ে উঠল, গদগদ গলায় কে বলে উঠল, 'ভদ্দর মহিলা তোমার মত ঢের-ঢের দেখেছি। মানে মানে আদিত্যর ঠিকানাটা দিয়ে কেটে পড় দিকিনি, আমাদের পাওনা গণ্ডা চুকিয়ে দাও, তোমাদের সুখের শয্যেয় কাঁটা হতে আসব না। নইলে আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই।'

আর একজন মেয়েলি গলায় গানের ঢংয়ে গেয়ে উঠল, 'আমি ঢের ঠকেছি, আর তো ঠকব না।'

কব্‌জি যে ধরেছিল তার হাত ক্রমশ নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে, পিছন থেকে আঁচল টেনে কারা যেন অতসীকে হিড়হিড় করে আদিত্যর বাড়ির দিকেই টেনে নিয়ে যেতে চাইছে।

আশে পাশে চাইল অতসী। দুপুরের নির্জন পথ, চেঁচালেও কারও সাড়া মিলবে না। একবার ভাবল অভদ্র যে-লোকটি ওর হাত ধরেছিল, তারই সমুখে হাঁটু ভেঙে বসে, অকপটে বলে, 'আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা। আদিত্যর জন্যে তোমরা যা করেছ, যতটুকু করেছ, তার চেয়ে ঢের বেশি করেছি আমি। আমি ঢের বেশি ঠকেছি।' বলতে চাইল, কিন্তু পারল না, ভয়, সঙ্কোচ, সম্ভ্রমবোধ ওর বাক্‌শক্তিকে সাঁড়াশির মত চেপে ধরে আছে, আর অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী ওকে আদিত্যর বাড়ির দিকেই ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

মিনিট পনের-কুড়ি পরে অতসী যখন সম্বিৎ ফিরে পেল, তখন ওর কানের দুল দুটি গেছে, গলার হারও। ছোক্‌রারা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে ঠিক নেই, পথ তেমনি পরিত্যক্ত, অতসীর সমুখে আদিত্যর বাড়ির লোহার ফটকটা। অতিকায় একটি তালার সামনে দাঁড়িয়ে অতসী ঠকঠক করে কাঁপতে থাকল। খানিক আগে এই তালাটিকে দেখেই কিন্তু বিরূপ হয়ে উঠেছিল, এখন এটাকেই অতসীর পরম বন্ধু মনে হল।

এই তালাটাই তাকে আজ বাঁচিয়ে দিয়েছে।

অতসী একবার ভাবল থানায় যাবে। কিন্তু কী ফল হবে গিয়ে। কী বলবে, কে বিশ্বাস করবে তাকে। ওর লাঞ্ছনাকারীদের নাম দূরে থাক, মুখও যে অতসীর মনে নেই।

অতসী শেষ পর্যন্ত 'জনদর্পণ' অফিসের পথ ধরল।

'জনদর্পণ' অফিসের দরোয়ান আজও ওকে দেখে উঠে দাঁড়াল, বেয়ারা এডিটরের কামরার কাটা দরজা ঠেলে দিল, কাগজের স্তূপে-ঠাসা চুরুটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ছোট্ট সেই ঘরটিতে দাঁড়িয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় অতসী নিজেকে বলতে শুনল, 'মিঃ সরকার, আমি বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি।'

জীবনতোষ সম্পাদকীয় রচনায় নিমগ্ন ছিলেন। মাথা না তুলেই বললেন, 'বসুন।'

পাশের ঘরে খটখট টাইপের আওয়াজ, ঘন ঘন ঘন্টি বাজিয়ে বেয়ারাকে আহ্বান, নিচের তলায় যন্ত্রের গম্ভীর, চাপা গুম গুম, দেয়াল-ঘড়িটার টক-টক, কখনও আলাদা, কখনও এক হয়ে অতসীর স্নায়ুতন্ত্রীতে আঘাত করে গেল, মিনিটের পর মিনিট, কিন্তু জীবনতোষ খস খস লিখেই চলেছেন, মাথা তোলবার ফুরসৎ পেলেন না।

ধৈর্য এবং সঙ্কোচ খুইয়ে অতসী ফের বলল, 'মিঃ সরকার—'

চুরুটটা ছাইদানীতে শুইয়ে জীবনতোষ মুখ তুললেন। 'ও,—আপনি। কী দরকার, বলুন তো।'

ভাবলেশহীন ব্যস্ত একটি মুখ, হয়ত-বা ঈষৎ বিরক্ত, কঠিন। কিন্তু অতসী মনে মনে কথা গুছিয়েই এসেছিল। আজ দুপুরের কোন কথা বলবেনা, বলা সম্ভব না, শুধু আদিত্যর কথা জিজ্ঞাসা করবে।

'মিঃ সরকার, আদিত্যবাবুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'পাওয়া যাচ্ছে না? বলেন কী। নাবালক শিশু অপহরণ—থানায় খবর

দিতে পারেন,' লিখতে লিখতে যেন একটা জুৎসই কথা পেয়ে গেছেন, জীবনতোষ এমনভাবে হাসলেন, 'কিম্বা রেডিওতে।'

অতসী ভয়ে ভয়ে বলল, 'কিন্তু এটা খবরের কাগজের অফিস, তাই ভেবেছিলুম, যদি—'

'ও, বিজ্ঞাপন দিতে চান? 'হারান, প্রাপ্তি, নিরুদ্দেশ'—কেমন? কিন্তু বিজ্ঞাপনের ঘর তো এটা নয়,—সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঠিক ডানধারে। দাঁড়ান, বেয়ারাকে ডেকে দিচ্ছি, আপনাকে ঘরটা দেখিয়ে দেবে। ওরা বোধ হয় লাইন-পিছু এক টাকা নেয়।'

মুখ কালো করে অতসী উঠে দাঁড়াল।

'আপনি শুধু ঠাট্টাই করছেন। ইলেকশনের অল্প ক'দিন আগে একটা লোক নিখোঁজ হল, হয়ত এর পেছনে পলিটিক্যাল কোন কারসাজি আছে, হয়ত হয়ত—'

সম্পাদক হেসে ফেললেন, 'বলুন না, বলে ফেলুন যা বলতে চান। গুম্ খুন?'

তর্ক করা বৃথা, অতসী দরজার বাইরে পা রাখলে।

জীবনতোষ স্মিত দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ্য করছিলেন। তারপর, অতসী যখন সত্যিই চলে যাবার উপক্রম করল, তখন ওকে পিছন থেকে ডাকলেন।

'শুনুন।'

অতসী ফিরে তাকাতে জীবনতোষ বললেন, 'আপনি সত্যিই কিছু জানেন না?'

অতসী শুধু মূঢ়ের মত মাথা নাড়ল।

'আশ্চর্য!' জীবনতোষ ব্লটিংয়ে কয়েকটা অলস-কলম আঁচড় কাটতে কাটতে বললেন—'অথচ আমরা ভেবেছিলাম, আদিত্যর সব কনফিডেন্সিয়াল ফাইল আপনার কাছে। আপনি আদিত্যর প্রধান সচিব অথচ জানেন না ওর একটি সখি মিথ আছে?'

অতসী শূন্য চোখে চেয়ে রইল। মাস্টার মশাই বোর্ডে দুরূহ একটা অঙ্ক কষে দিয়েছেন, আর সে যেন কিছু-না-বোঝা ছাত্রী।

'তাকে নিয়েই আদিত্য কাল চুনার গেছে।' ব্লটিং কাগজের আঁকিবুকিতে একটা পাখি ধরা পড়েছিল, জীবনতোষ সেটাকে পুচ্ছ দিয়ে সম্পূর্ণ করতে লেগে গেলেন।

পাংশু মুখে অতসী তখনও বসে কী একটা কথা বলবে, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না, চেন টেনে হাত-ব্যাগটা একবার খুলছে, বন্ধ করছে ফের।

'কিম্বা বিন্ধ্যাচলও হতে পারে', জীবনতোষ আবার যেন মজা পেতেই বললেন।—'তবে সঙ্গে সেই মেয়েটি যে আছে, তাতে কোন ভুল নেই। ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভেসন, দু'খানা টিকিট। ইলেকশনের জন্য খেটে খেটে আদিত্যর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে।'

অতসী জিজ্ঞাসা করল, 'জীবনতোষবাবু, সে কে? সেকি কোন অভিনেত্রী—'

মাথা নেড়ে জীবনতোষ বললেন, 'জানি না। আমরা খবরের কাগজ চালাই অতসী দেবী, ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ নয়। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে যেটুকু খবর পেয়েছি, এ মেয়েটিকে আদিত্য হয়ত বিয়ে করবে।'

'বিয়ে?' স্থানকাল ভুলে অতসী প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

জীবনতোষ কলমের আঁচড়েই পাখিটার পক্ষচ্ছেদ করতে করতে বললেন, 'বিয়ে। গান্ধর্ব, অপ্সরা, পৈশাচ, যে কোন মতেই হক না কেন, সে বিয়েও বিয়ে। এমন কি, ব্লটিং কাগজটাকে মুঠো করে পাকাতে পাকাতে জীবনতোষ বললেন, 'এমন কি এ বিয়ে হয়ে গিয়েও থাকতে পারে।'

কখন যে টলতে টলতে অতসী উঠে এসেছিল তার নিজেরও খেয়াল নেই। ঘরের ভিতরে মনে হয়েছিল একটা চাপা অন্ধকার মেঘ পৃথিবী ছেয়ে আছে; বেরিয়ে এসে দেখল, তখনও শেষ রৌদ্রটুকু যায়নি। বুক ভরে নিশ্বাস নিতে মস্তিষ্কের জড় আচ্ছন্নতা কেটে গেল। এ কী করেছে অতসী, কেন পালিয়ে এসেছে অক্ষম, অসহায় অবলার মত; তার কাছেও তো অস্ত্র ছিল, আদিত্যর

সব পলিটিক্যাল উচ্চাশার মৃত্যুবাণ, কেন তার প্রয়োগ করেনি। সঙ্কোচ? এখনও সঙ্কোচ? ভয়? এখনও কলঙ্কের ভয়? হায়রে।

ফিরে যাবে অতসী, জনদর্পণ অফিসেই ফিরে যাবে, তাকে নিয়ে যে ছিনি-মিনি খেলেছে, সেই নির্বিবেক কুচক্রীর সর্বনাশের চাবি তার শত্রুদের হাতে সঁপে দেবে।

•

অবাক দরোয়ানটা আবার দরজা ছেড়ে দিল, বেয়ারাটা কাটা দরজাটা ঠেলে ধরতেও ভুলে গেল, অতসী আবার ফিরে এল সেই কাগজ-গন্ধী ধোঁয়াটে চাপা ঘরে।

এবারে আর সঙ্কোচ করল না, চেয়ার টেনে নিয়ে নিজেই বসে পড়ল। স্পষ্ট, ঈষৎ-উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'জীবনতোষবাবু, আমি আবার এসেছি।'

মুখ তুলে জীবনতোষবাবু বললেন, 'বেশ তো।' এক মুহূর্তও দেরি করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে চুরুটটা ধরিয়ে নিলেন। আর অমনি অতসী যেন টের পেল এই আপাত-দাম্ভিক লোকটিও আসলে ভীরু, রুগ্নস্নায়ু, কারুর মুখোমুখি হলেই বিব্রত, অসহায় বোধ করে, তাড়াতাড়ি আঁকড়ে ধরে একটা কলম কিম্বা চুরুট, সেইটেই ওর আশ্রয়, ধোঁয়ার আড়ালে আত্মগোপন করতে চায়।

পরের কথাগুলো অতসীর ঠিক করাই আছে। বলবে, 'জীবনতোষবাবু, আমি একটা খবর দিতে এসেছি।' উৎসুক হয়ে ঝুঁকে পড়বেন জীবনতোষ, অতসী হেসে বলবে, 'প্রভাত মল্লিককেও খবর দিন।' তখন আর ধৈর্য থাকবে না জীবনতোষের, বলবেন 'প্রভাত মল্লিক কেন, যা বলবার আমাকেই নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন।' তারপর আদিত্যের কপটতা, শঠতা, কলঙ্ক কাহিনী যখন একে একে উন্মোচন করবে অতসী, জীবনতোষের মুখভঙ্গী বদলে যাবে, সেই প্রথম-বিস্মিত, পরে স্তম্ভিত এবং অবশেষে ঘৃণা কণ্টকিত, দৃষ্টি কল্পনা করে অতসী বিচিত্র একটা হর্ষ, সুখ অনুভব করল।

অবিচলিত, স্পষ্ট গলায় অতসী বলল, 'সেদিন আপনারা আদিত্য মজুমদার

সম্পর্কে কিছু গোপন খবর আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন। যে যে মেয়ের সর্বনাশ আদিত্য করেছে তাদের নামের লিস্টি পেলে এই ইলেকশনের মুখটাতে আপনাদের সুবিধে হয়, না? সব মেয়ের খবর তো দিতে পারব না, জীবনতোষ বাবু, একটি মেয়ের কথাই শুধু বলতে পারি। আদিত্যকে যে সর্বস্ব দিয়ে বিশ্বাস করেছে, ঠকেছে।'

চুরুটের ধোঁয়ার আড়ালে জীবনতোষের মুখপেশির কোন পরিবর্তন হল কি না বোঝা গেল না, অতসী বলে গেল, 'পরিচয় পরে দেব, আগে তার কাহিনীটা বলি। শিক্ষিত মেয়ে, কিন্তু রুচিই তার কাল হল। স্বামীর ঘর করতে পারল না, ফিরে এল বাপের বাড়িতে। সেখানেও দুর্দশা, ক্রমে ক্রমে সংসারের সব চাপ তার ওপরেই পড়ল। মেয়েটি তবুও দমেনি। ভেবেছিল সামনে জীবন দীর্ঘ, শহরটাও বিপুল, এরই মধ্যে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার একটা পথ সে নিশ্চয় করে নিতে পারবে। সংগ্রামকে ভয় করেনি, ছোট-খাটো আঘাতকে তুচ্ছ করেছে। চাকরি নিল। প্রয়োজনের তুলনায় সে উপার্জনের পরিমাণ কিছু না। ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার করল শুধু বেঁচে থাকার জন্যেই কেবল শ্রম নয়, অনেক মর্যাদাবোধ, নীতি বাঁধা দিতে হয়। ভিতরটা বিদ্রোহ করে উঠল, ভাবল পিছিয়ে আসে। কিন্তু কোথায় পেছোবে। সেখানে সত্যাগ্রহ করে পথ জুড়ে শুয়ে আছে তারই মা, ভাই, রক্ত-সম্পর্কিত পরিবার। গ্লানি লাগল দেহে, মলিন রং লাগল মনে, নীতিবোধ নিরঙ্কুর মুছে গেল। সে মেয়েটি মা পর্যন্ত হয়েছিল।'

জীবনতোষ হয়ত শিউরে উঠলেন, অতসী দেখতে পেল না, মাথা নিচু করে বলে গেল, 'মা হল সেই মেয়েটি, কিন্তু মাতৃত্বের অধিকার পেল না, পাপ-সম্ভব শিশুটিকে ওরা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এমনি প্রবঞ্চনা পদে পদে। নিষ্কৃতির কোন পথ তখন খোলা ছিল না।'

'ছিল', জীবনতোষকে অতসী নির্বিকার গলায় বলতে শুনল, 'একটা পথ ছিল। মেয়েটি আত্মহত্যা করতে পারত।'

সমস্ত ঘৃণা আর রোষ যেন একটা বিস্ফোরকের মত বিদীর্ণ হয়ে গেল, অতসী দৃপ্ত কণ্ঠে বললে, 'এই বিবেচনা নিয়ে আপনারা সম্পাদকীয় লেখেন, সব

মুশকিলের আসান করেন ? তৃষ্ণা মেটাতে হবে বিষ খেয়ে ? কেন জীবনবাবু, কেন ? কেন আমাদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও থাকবে না—নিঃসম্বল বলে ? অসহায় বলে ?'

মৃদু-মৃদু হেসে জীবনতোষ বললেন, 'উত্তেজিত হয়ে মেয়েটির পরিচয় আপনি দিয়ে ফেলেছেন, অতসী দেবী।'

দৃঢ় স্বরে অতসী বলল, 'দিয়েছি, দেব বলেই আজ ফিরে এসেছি। একটু আগেই আপনি আত্মহত্যার কথা তুলেছিলেন। নিজের সব কলঙ্ক কাহিনী অকপটে রটনা করতে এসেছি, এও তো এক রকমের আত্মহত্যা জীবনবাবু। নিজে মরলুম, আমার একমাত্র সাধ, তাকেও মারব। আদালতে দাঁড়িয়ে একে একে সব বলব, কিছু গোপন করব না। শিশুটি আছে এক অনাথ-আশ্রমে। সে ঠিকানাও জানি।'

চুরুটটা পুড়ে পুড়ে ফুরিয়ে এসেছিল, সেটাকে ছাইদানিতে রেখে জীবনতোষ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে কী করতে হবে বলুন।'

গলায় সবটুকু আকুতি ঢেলে অতসী বলল, 'আপনি শুধু প্রভাত মল্লিককে একটা খবর দিন। বলুন, সেদিন যে মেয়েটি টাকার লোভেও কিছু বলেনি, আজ সে নিজে থেকেই এসেছে। যে খবর প্রভাত মল্লিক চান, সেই খবরই তাঁকে দেবে। বিনিময়ে মেয়েটি আর কিছু চায় না, প্রভাত যেন তার পেছনে দাঁড়িয়ে কেস লড়তে সাহায্য করেন।'

ভস্মশেষ চুরুটটির দিকে দৃষ্টি রেখে জীবনতোষ ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন।— 'না অতসী দেবী, প্রভাত মল্লিক আজ আর আসবে না। বড় দেরি হয়ে গেছে।'

'আসবে না ? আদিত্যকে লোকচক্ষে হেয় করার এই সুযোগ—'

বাধা দিয়ে জীবনতোষ বললেন, 'তবু আসবে না।'

সব তেজ পলকে নিবে গেছে, নির্জীব, উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে আতসী বলল, 'কেন জীবনবাবু। সেদিন তো উনি দু'হাজার টাকা পর্যন্ত—'

তেমনি মাথা নেড়ে নেড়ে জীবনতোষ বললেন, 'আসবে না, কেননা আদিত্যর সঙ্গে প্রভাতের আর কোন কলহ নেই।'

একটা আঘাতে পায়ের নিচে থেকে যেন মাটি সরে গেছে, অতসী ভীত কণ্ঠে বলে উঠল, 'কলহ নেই?'

জীবনতোষ বললেন, 'না। ইলেকশনের ব্যাপারে দু'জনের মধ্যে রফা হয়ে গেছে।'

এই অপ্রত্যাশিত ঘোষণাটির জন্যে অতসী প্রস্তুত ছিল না, রক্তশূন্য মুখ সামান্য হাঁ হয়ে পড়ল, নীল-হিম চোখ দুটি বিস্ফারিত। অশ্রুতপ্রায় গলায় বলল, 'রফা হয়ে গেছে?'

জীবনতোষ বললেন, 'হাঁ। আদিত্য প্রভাতের অনুকূলে নাম প্রত্যাহার করেছেন। চুণারে যাবার আগে স্টেশনেই দিয়ে গেছেন, এই দেখুন তার কপি। কাল সব কাগজে ছাপা হবে।'

কাগজটা পড়ে দেখতে অতসী বিন্দুমাত্র উৎসুক ছিল না। তিক্ত গলায় বলে উঠল, 'হঠাৎ আদিত্যের রাজনীতিতে অরুচি।'

'অরুচি নয়। শিগগিরই এ্যাসেমব্লির একটা উপনির্বাচন হবে। সেই আসনটি প্রভাত মল্লিকের দল বিনাযুদ্ধে আদিত্যকে ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে। পৌর রাজনীতির খোঁয়াড়ে আদিত্যর আর কুলোচ্ছে না অতসী দেবী', জীবনতোষ হেসে বললেন, 'তার বিচরণের জন্যে এখন বিস্তৃততর ক্ষেত্র চাই।'

অতসীর কিছু বলবার ছিল না, চেয়ারের হাতলটা শক্ত মুঠিতে চেপে সে বসে আছে। জীবনতোষই ফের বললেন, 'এই চুক্তিটা আর দিনকতক আগে হলেই ভাল হ'ত। আদিত্য কিছু দেরিতে নাম প্রত্যাহার করলেন; ফলে নির্দিষ্ট দিনে নামমাত্র একটা ভোটগ্রহণ করা হবে। অবশ্য প্রভাত মল্লিক অনায়াসেই তরে যাবেন, কোন বাধা হবে না। জলে-জলে মিশে গেল অতসী দেবী, দু'পক্ষই মানী, কারুরই লোকসান হ'ল না, কী বলেন।'

চেয়ার ছেড়ে কোনমতে উঠে দাঁড়াল অতসী। অতিশ্রান্ত, প্রায় ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল, 'হ্যাঁ, মানীদের মান রইল বটে।'

২৮

তার পরের দুটি ঘণ্টা অতসীর স্মৃতি থেকে একেবারে মুছে গেছে। কখন দিনটি নিস্তেজ হয়ে গেছে, জানালার উপরে আছড়ে পড়েছে রক্তাক্তদেহ, শরণার্থী বিকেল-আকাশ, তারই পিছে-পিছে অন্ধ সন্ধ্যা, কিছু টের পায় নি। অতসী তখনও বুঝি চেয়ারের হাতল ধরে চুপচাপ বসেই ছিল। তারপর জীবনতোষ হয়ত ঘন্টি বাজিয়ে বেয়ারাকে আলো জেলে দিতে বলেছেন। কখন অতসী অমনস্ক নমস্কার করে থাকবে, জীবনতোষও প্রতি-নমস্কার নিশ্চয়ই করেছেন, কিন্তু খেয়াল নেই। অদৃশ্য সূত্রচালিত পুতুলের মত টলতে টলতে অতসী যখন নিচে নেমে এসেছিল, তখনও কি দরোয়ান অভ্যস্ত হাতে ওকে সেলাম করেছিল, সম্মান দেখাতে উঠেছিল টুল ছেড়ে? এ-সব খুঁটিনাটি কিছু মনে নেই।

অস্পষ্ট যেন মনে পড়ে ট্রামের কণ্ডাক্টর সম্মুখে এসে দাঁড়াতে, অতসী তাকে একটা দুয়ানি দিয়েছিল। চটপট টিকিট কেটেছিল লোকটা, এই ছবিটা শুধু মনে আছে, ওর দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে ফেলার মত বেয়াদপিও করে থাকতে পারে। মনের স্বাভাবিক স্থৈর্যে অতসী রাগ করত, কিন্তু সেদিন দুঃস্বপ্নের একটা পঙ্কিল স্রোতে চেতনা শোলার মত ভাসছে আর ডুবছে,—রাগ করবে কী, অতসী ভয় পেয়েছিল। হয়ত এমন কোন ছাপ আছে তার মুখে, পরিচ্ছদে, যা থেকে অচেনা একটি লোকও তাকে বিড়ম্বিত বলে চিনতে পেরেছে। নইলে কে কবে শুনেছে কণ্ডাক্টর অচেনা যাত্রিনীর দিকে চেয়ে হাসে।

কিছুক্ষণ জানালার বাইরে চেয়ে রইল, তারপর তাড়াতাড়ি ট্রাম থেকে নেমে পড়ল অতসী। তখনও হয়ত কণ্ডাক্টারটি হেসেছিল, কিন্তু ফিরে চেয়ে দেখার সাহস অতসীর ছিল না।

তারপর চেতনা আবার টুপ করে ডুবে গিয়েছিল। আয়ু থেকে খসে পড়েছিল এক টুকরো সময়।

প্রস্থে-দৈর্ঘ্যে পাঁচ দশ মাইল বিপুল শহরটা নিমেষে যেন সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে, অতসী পা রাখবে, সে জায়গাটুকুও নেই। আবার এক সময় মনে হল সমুখে প্রসারিত পথটা যেন নিরস্ত, দানবটা যেন অকস্মাৎ দেহ বিস্তার করতে শুরু করেছে, তার স্ফীত নাসারন্ধ্র দিয়ে অহরহ পোড়া কয়লার গুঁড়ো যেমন দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে দেয়, তেমনি বুঝি মান-খোয়ানো একটি মেয়েকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবে।

তবু অতসী বাড়ি পৌঁছেছিল। পথ ভুল হল না, পা পিছলে গেল না, গাড়িঘোড়ার নিচে শরীরটা থেঁতলে গেল না ; সাবধানী একটা সত্তা সারা রাস্তা আগলে ওকে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে এল ঠিক।

অথচ অতসী মরতে চেয়েছিল। বেঁচে থাকার শেষ স্পৃহাটুকু মুছে গেছে, সামনে একটিমাত্র রেখা প্রায় দুর্নিরীক্ষ্য, তার ওপারেই মৃত্যু! এত কাছ থেকে অতসী কোনদিন তাকে দেখেনি।

মৃত্যুকে যারা হঠাৎ-পরিণতি বলে, তারা ভুল জেনেছে। মৃত্যু একটা সমাপ্য পদ্ধতি, খণ্ড-খণ্ড অবসানের সমষ্টি। একটির পর একটি আলো নিভে নিভে প্রেক্ষাগৃহ যেমন এক সময় পূর্ণ অন্ধকারে ডুবে যায়, তেমনি প্রথমে যায় দৃষ্টি, শ্রুতি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে, না থাকে স্পর্শে সুখ, না রসনায় স্বাদ। সেটা হল দেহগত মৃত্যু। আরেক রকম মৃত্যু ঘটে অগোচরে, দেহযন্ত্র অটুট, কিন্তু ভিতরটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। অনুভূতি, মান, মূল্য সব ধিকিধিকি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। নিজের বুকের ভিতরে চেয়ে সেই মৃত্যুকেই প্রত্যক্ষ করল অতসী।

ছাতে দাঁড়িয়ে সুধা দেখেছিল অতসীকে আসতে। ঠিকমত পা পড়ছে না, অসংযত আঁচল রাস্তার ধুলোয়। একটা কাগজের নৌকা যেন টলতে টলতে জলে ভেসে আসছে।

তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল সুধা, দরজা খুলে দিয়ে অতসীকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কী হয়েছে ফুলমাসি?'

অতসী নীরবে ওকে ঠেলে দিল।

সুধা তবু ফুলমাসির সঙ্গ ছাড়ল না, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, 'দিদিমা বাসায় নেই, জান।'

অতসী তবু কৌতূহল দেখাল না, ঘরে এসে শুধু বলল, 'আলোটা নিভিয়ে দে সুধা।'

'তোমার একটা চিঠি আছে, দেখবে না, ফুলমাসি?'

অত্যন্ত ক্লান্ত, অত্যন্ত নিরুৎসুকভাবে অতসী হাত বাড়িয়ে দিল।

চিঠি আনতে টেবিলের দিকে যেতে যেতে সুধা বলল, 'দিদিমা কোথায় গেছে জিজ্ঞাসা করলে না তো। দিদিমা গেছে ছোট মামার সঙ্গে। ছোট মামা আজ এসেছিল, জান?'

তখনও চিঠিটার জন্যে হাত বাড়িয়ে আছে, অতসী বলল, 'কী করে জানব।'

যেন খুব গোপন কথা বলছে এমন গলায় সুধা বলল, 'ছোট মামা এসেছিল। সেই চাকরিটা আবার নাকি ফিরে পেয়েছে, বলল। বিয়ে করবে, কনেও ঠিকঠাক। দিদিমাকে বলল, তুমি অনুমতি দাও। দিদিমা কিন্তু আপত্তি করলেন না ফুলমাসি। শুধু বললেন, কর। আমি অনুমতি না দিলেই কি তুমি শুনবে। আমার কথা কে শোনে।'

ছোট মামা বলল, 'আমি তোমার মেয়ের মত নই, মা। তোমার কোন্ কথা আজ পর্যন্ত না শুনেছি বল তো। দিদিমা বলল, তুমি আমার সোনার টুকরো ছেলে। তোমাকে একটা খারাপ গাল দিয়ে বলল, ওর কথা বলিস না, আমার হাড়-মাস জ্বালিয়ে খেলে।'

অতসী ফোঁস করে উঠল, বলল, 'বলল মা এই কথা?'

সুধা বলে গেল, 'ছোট মামা তখন বললে, এ বাড়িতে কিন্তু আমরা থাকব না। অতসীর সঙ্গে একসঙ্গে থাকা আর না। আদিত্য মজুমদারের সঙ্গে মেশামেশি করত বলে আমার যখন চাকরি গিয়েছিল, তখন আমি শুধু ওর পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিলাম। বার বার বলেছিলাম, আদিত্যকে তুই ছাড় অতসী, আমাকে বাঁচা। সে-কথা ও রাখেনি, ওকে আমি চিনে নিয়েছি সেদিনই। দিদিমা বললেন, সর্বনাশীকে তুমি আজ চিনলে বাবা, আমি

চিনেছি অনেক দিন। আর বলল'—একটু থেমে, যেন সঙ্কুচিত হয়ে, সুধা বলল 'বাকিটা বলব ফুলমাসি ?'

অতসীর তখন শোভন-অশোভন জ্ঞান নেই, বলল, 'কেন বলবি না'।

'দিদিমা বলল, অতসীকে আমি চিনেছি অনেক দিন আগেই। আদিত্যকে ছাড়বে কেন, পুরুষ মানুষের গন্ধ না শুঁকলে ওর যে ভাত হজম হবে না। ছোট মামা বলল, যাক, ওসব যেতে দাও। তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে থাকবে, মা। একটা ছোট বাসা দেখেছি মাণিকতলায়, যাবে আমার সঙ্গে ? পছন্দ করে আসবে ? দিদিমা তো ছোট মামার সঙ্গে যাবে, আমি কোথায় যাব, ফুলমাসি ?'

অতসী ততক্ষণ চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করেছে। উত্তর দিল না। পড়া শেষ হলে উত্তেজিত স্বরে বলল, 'এ-চিঠি কে নিয়ে এল রে ?'

'একটা লোক, ফুলমাসি। দিদিমারা বেরিয়ে যাবার একটু পরেই।'

'লোক, কেমন লোক ?'

'তা-তো ভাল করে দেখিনি ফুলমাসি।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অতসী বলল, 'আমি যাব। তুই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসবি সুধা ?'

'কোথায় যাবে ফুলমাসি ? এত রাত্রে ?'

'রাত্রে ?' ম্লান হেসে অতসী তিতো গলায় বলল, 'আজ আর আমার কিছুতে ভয় নেই, সুধা।'

গলির মুখ পর্যন্ত পৌঁছে, অতসীর মনে হল কে যেন পিছে। ফিরে চেয়ে বলল, 'এ কী, সুধা ? তুই কোথায় চলেছিস ?'

সুধা এগিয়ে এসে শক্ত করে আঁচল চেপে ধরল অতসীর। বলল, 'আমিও যাব। তোমার আজ কি যেন হয়েছে ফুলমাসি, আমার ভারি ভয় করছে। তোমাকে আজ একা কোথাও যেতে দেব না।'

সুধার মনে আছে সেদিন মন্ত্রমুগ্ধের মত অতসীকে অনুসরণ করেছিল।

ঘড়ির হিসাবে রাত তখন হয়ত খুব বেশি না, কিন্তু মনে হয়েছিল, না-জানি কত, সব যেন নিশুতি হয়ে এসেছে। এত ভিড়, ঠেলাঠেলি, গাড়ি, আলো, কিন্তু যে দুটি মেয়ে নিঃশব্দে পাশাপাশি চলেছে, তারা যেন এখানকার কেউ নয়, পথ ভুলে বিদেশী, অচেনা শহরে এসে পড়েছে।

গলি ফুরিয়ে গেল, সদর রাস্তায় পড়েও অতসী ট্রাম নিল না, বলল, 'আমরা যেখানে যাচ্ছি, এ ট্রাম সেদিকে যায় না। তুই হাঁটতে পারবি তো সুধা।'

সুধা বলল, 'পারব ফুলমাসি।'

তখনও জানত না, পথ কত।

সদর রাস্তা ধরে মিনিট দশেক সোজা হাটল অতসী, ডাইনে মোড় নিল, কিছুটা এগিয়ে ফের বাঁয়ে। ডাইনে-বাঁয়ে অসংখ্য মোড় নিতে নিতে ওরা কোথায় এল, কতদূর, সুধার হিসেব গুলিয়ে গেল, দিকের আন্দাজ রইল না, মনে হল পথের আর শেষ নেই, চলা ফুরোবে না, অন্তত আজ রাতে না, হঠাৎ বুঝি ভোর হয়ে যাবে, কোন একটা পথের বাঁকে শিকারী দিন গা-ঢাকা দিয়ে আছে, সেখানে পৌছলেই ঝাঁকে ঝাঁকে তীক্ষ্ণ তীর নিয়ে পথশ্রান্ত দুটি মেয়ের উপরে হানা দেবে।

বড় রাস্তা, ছোট রাস্তা, ফের বড় রাস্তা। দোকানে দোকানে কেনা-বেচা প্রায় শেষ, পানের দোকানের রেডিওতে ক্লান্ত বেহাগ। সুধার একবার মনে হল ওর জুতোর তলা বুঝি ক্ষয়ে গেছে, হোঁচট খেতে খেতে একবার সামলে নিল। ক্ষীণ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'রাত কতটা বল তো ফুলমাসি।'

সামনেই ছিল একটা ঘড়ির দোকান, অতসী ওকে তার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, 'যেটা খুশি বেছে নে।'

'তার মানে?'

'দোকানে যেমন অনেক সাজান জিনিসের ভেতর থেকে আমরা পছন্দ মত জিনিসটি বেছে নিই, এও তেমনি। ঘড়ির দোকানে সব রকম সময়ই ছড়ান আছে, তুই যেটা খুশি বেছে নে।'

সুধা রাগ করে বলল, 'তুমি ঠাট্টা করছ ফুলমাসি।'

পথের ধারে ঘুমন্ত একটা ট্যাক্সি ওদের দেখে জেগে উঠে হর্ণ বাজিয়ে ইশারায় ওদের ডাকল, আশায় আশায় একটা রিক্সা ঠুনঠুন করে পিছে পিছে এল অনেক দূর, অতসী বলল, 'এই তো, আর খানিক দূর।' চিঠিটা বার করে ঠিকানা ফের পড়ে নিল।

ততক্ষণে ওরা বাঁশির মত ক্রমশ-সরু একটা গলিতে পড়েছে। মোড়ে সরবতের দোকানের সমুখে ক'জন লোক জটলা করছে, ওদের দেখে তারা হঠাৎ ফুর্তিমত্ত হয়ে উঠল। একজন এক খিলি পান চিবোতে চিবোতে হিন্দী গানের দু'কলি গেয়ে উঠল, সেই গানের রেশ নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে শিস্ দিলে আরেকজন।

অতসী বলল, 'তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল, সুধা।'

ওদের পায়ের ঠোকর খেয়ে অদৃশ্য, প্রায় অশরীরী, একটা কুকুর কেঁউ করে পালিয়ে গেল, আচমকা ঘুম ভেঙে একটা ভিখিরি গুটিসুটি হয়ে একটা বাড়ির রকে উঠে বসল।

গলি, গন্ধ, আধ-অন্ধকার, ছায়া, ভয়। শিরশিরে শীত, তবু ঘাম, গায়ে কাঁটা, দম বন্ধপ্রায়।

পিছনে নিস্তেজ গ্যাসের আলো, দুটি দেহের দীর্ঘ ছায়া পড়েছে সামনে। নির্জন গলিতে দু'জন নয়, চারজন নিঃশব্দে পাশাপাশি চলেছে। হাঁপিয়ে পড়েছে অতসী আর সুধা, কিন্তু ছায়া দুটি অনায়াসে তরতর করে বাকি পথটুকু পেরিয়ে গেছে; রাস্তার শেষে পুরনো যে বাড়িটা গলিটাকে থামিয়ে দিয়েছে, তার রক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আরও কয়েক পা এগোল ওরা, ছায়া দুটিও অমনি সাপের মত হেলে হেলে পুরনো বাড়িটার দেয়াল বেয়ে উঠতে লাগল, আর খানিকটা গেলে চুপে চুপে ছাতটাও টপকে যাবে বুঝি।

সেই বাড়িটার সমুখে দাঁড়িয়ে অতসী চিঠিটার সঙ্গে নম্বর মিলিয়ে দেখল। তারপর শুরু করল কড়া নাড়তে।

সুধা পিছনে দাঁড়িয়ে, কে এসে দরজা খুলে দিলে, দেখতে পেল না। একটু

পরেই অতসী পা বাড়াল ভিতরে ঢুকবে বলে, চোখের ইশারায় সুধাকে বলল ওকে অনুসরণ করতে।

শতছিন্ন একটা ধুতি লুঙ্গিমত করে পরা একটা লোক আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। দরজা খুলে দিয়েছিল বোধ হয় এই। সুধা ঘরটার চারধারে চোখ বুলিয়ে নিলে। থাকে থাকে প্যাকিং বাক্স সাজিয়ে ঘরটাকে দু'ভাগ করা হয়েছে, ভিতরটা বোধ হয় অন্তঃপুর। একটিতে গুটিয়ে রাখা একটা মাদুরের ওপর বালিশ, যে লোকটি এখুনি বেরিয়ে গেল সে বুঝি শোবার উদ্যোগ করছিল। আরেক দিকে ছোট্ট একটা তাকে আয়না, দাড়ি কামানর সরঞ্জাম; আড়াআড়ি করে বাঁধা দড়িতে খান দুই পাট ভাঙা লাট-করা ধুতি, গামছা, ময়লা গেঞ্জি। দেয়ালে পেরেকের সঙ্গে ঝোলান একটা পাঞ্জাবী। আর ছবিওয়ালা একটা ক্যালেণ্ডার, কোন্ সালের কে জানে। ঘরের ঠিক মাঝখানে প্যাকিং বাক্সগুলোর উপরে রাখা ধূম্রলোচন একটা ধুকধুক বুক হারিকেন দু' পাশেই আলো, ঠিক করে বলতে গেলে ফিকে অন্ধকার, বখরা করে দিচ্ছে। একমেব-অদ্বিতীয় জানালার নিচে কুজোর উপরে উপুড় করে রাখা একটা এলুমিনিয়ম্ গ্লাস, তার ঠিক পাশেই সচিত্র একটা সাপ্তাহিক টুপটুপ জলে ভিজে ভিজে ফুলে উঠেছে।

এসব দেখতে সুধার মিনিটখানেকের বেশি লাগেনি, কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল পরিত্যক্ত আধ-অন্ধকার ঘরটিতে ওরা দু'জন কতক্ষণ না জানি দাঁড়িয়ে আছে। প্যাকিং বাক্সের আড়াল থেকে একটু পরেই যে লোকটি বেরিয়ে এল, তাকে দেখে চমকে উঠল সুধা, অতসীর হাত শক্ত করে চেপে ধরল। শুনল, বিহ্বল বিস্মিত কণ্ঠে ফুলমাসি বলছে, 'নীলুদা, সত্যি তুমি?'

নীলাদ্রির কোটরলীন চোখ দু'টিতে হাসি খেলে গেল।

'আমি অতসী। এখনও ভূত-প্রেত হইনি, কিম্বা নরদেহ ধরে তোমাকে ছলনা করতে আসিনি।'

'কিন্তু আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না, নীলুদা—'

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'বিশ্বাস না হয় চিমটি কেটে পরীক্ষা করতে পার। দেখবে ব্যথা পাব, হয়ত চেঁচিয়ে উঠব। ভূতের চেয়ে মানুষ হয়ে থাকার সুখই তো ওইখানে,—মানুষ দুঃখ পায়, ব্যথা বোধ করে।'

অতসী বলে উঠল, 'কিন্তু আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না নীলুদা? জানতুম তুমি দক্ষিণ ভারতের কোন স্যানাটোরিয়মে, হঠাৎ আজ চিঠি পেয়ে চমকে উঠলুম, এসে দেখি তুমি কলকাতাতেই, এক ঘুপচি গলির কোণে—'

'চিঠিতে নাম সই করিনি। আমার চিঠি তুমি বুঝতে পেরেছিলে অতসী?'

অতসী ধীরে ধীরে বলল, 'পেরেছিলুম। নইলে এত রাত্রে কি আসি। এ কার বাসা নীলুদা, কবে এলে?'

'সব ধোঁয়াটে লাগছে? রহস্যময়?' নীলাদ্রি অল্প অল্প হেসে বলল, 'সে অনেক কথা। তোমাকে সব বলব বলেই ডেকেছি। কিন্তু আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, অতসী, এখনও শরীর বড় দুর্বল, বেশিক্ষণ দাঁড়ালেই পা কাঁপে। এদিকে চল, বিছানা পাতা আছে, বসে বসে গল্প করা যাবে।'

ঈষৎ-ত্রস্ত গলায় অতসী বলল, 'কিন্তু নীলুদা, এখন যে রাত অনেক হল।'

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'বেশি হয়নি। অনেক জায়গা আছে যেখানে এখন রাত মোটে সাতটা।'

অতসী বলল, 'সেতো ভিয়েনা, প্যারিস কি লণ্ডনে।'

নীলাদ্রি তেমনি হাসতে হাসতে বলল, 'স্কুল-টীচার কিনা, তাই ভূগোলের অঙ্কের কথাই তোমার মনে পড়ল। আমি কিন্তু অত দূর দেশের কথা বলিনি। লোকে টের পায় না, কিন্তু এই কলকাতা শহরের আলাদা আলাদা সময় আছে অতসী। এই গলিটা যখন ঘুমিয়ে পড়ে, অনেক পাড়ায় তখন সবে সন্ধ্যা,—যেমন ধর, চৌরঙ্গী। এতো গেল কালের কথা। স্থানের হিসাবেও এ রকম গরমিল আছে। গাড়ি যদি না থাকে তবে শ্যামবাজারের লোক বৌবাজারে এলে রাত নটা বাজতে না বাজতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে, আবার টালার লোক, গাড়ি থাকলে দশটার পরও নিশ্চিন্ত হয়ে টালীগঞ্জে বসে থাকতে পারে, যেন পাশের বাড়িতে আড্ডা দিচ্ছে। তা, তুমি তো গাড়িতেই এসেছ অতসী?'

অতসী চমকে উঠল, 'গাড়ি,—কার গাড়ি?'

'কেন, আদিত্য মজুমদারের?'

গম্ভীর মুখে অতসী বলল, 'আমি হেঁটে এসেছি।'

'ও শখ।' নীলাদ্রি হেসে উঠল, 'বড় লোকদেরও মাঝে মাঝে পায়ে হেঁটে চলে বেড়াবার শখ হয়, সেটা ভুলেই গিয়েছিলাম, অতসী।'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অতসী প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'বড়লোক? কাকে বড় লোক বলছ, নীলুদা?'

নীলাদ্রি নির্বিকার গলায় বলল, 'কেন, তুমি। আদিত্য মজুমদারের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে যায়নি?'

দাঁতে ঠোঁট চেপে অতসী অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করল। দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'আমি যাই, নীলুদা। শুধু অপমান করবে বলে ডেকে এনেছ আমি বুঝতে পারিনি।'

সুধাও অতসীর পিছে পিছে যাবে বলে এগিয়েছে, হঠাৎ নীলাদ্রি প্রবল গলায় বলে উঠল, 'যেও না অতসী। শোন।'

ফিরে তাকাল অতসী, চোখ দুটি জলে টলটল করছে, বলল, 'কী।'

'তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। এসো, এদিকে এসো।'

রগ-বেরুনো রোগা হাত, উত্তেজনায় আবেগে থরথর কাঁপছে, নীলাদ্রি চেপে ধরল অতসীর মণিবন্ধ, টেনে নিয়ে গেল প্যাকিং বাক্সের ওধারে। অতসী বাধা দিল, পারল না, আঁচল লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে, হাত ছাড়াতে গিয়ে কব্জি মুচড়ে গেল, ছটফট করতে লাগল অতসী, যন্ত্রণায় কেঁদে ফেলল, আর সেই কান্না থামিয়ে দিতেই বুঝি নীলাদ্রি ওকে উগ্র আগ্রহে টেনে নিল, নুয়ে পড়ে তীক্ষ্ণ হিংস্র দাঁত দিয়ে অতসীর ঠোঁট দুটি চেপে ধরল।

নীলাদ্রির স্থির দুটি চোখ ওর মুখের উপরে, তপ্ত ঘনশ্বাসে কপোল পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে, অতসীর মনে হল, মুখ তো নয়, কে যেন একটা দো-নলা বন্দুক ধরেছে ওর সমুখে, কোটর থেকে গুলীর মত ধ্বকধ্বকে দুটি চোখ যে কোন মুহূর্তে গুলীর মত ঠিকরে পড়ে ওকে আঘাত করতে পারে।

ত্রস্ত, স্রস্তবাস, পরাস্ত, অতসী বার বার মিনতি করে বলতে থাকল, 'ছাড়, ছাড়, নীলুদা!'

নীলাদ্রিও শ্রান্ত, ওকে ছেড়ে দিয়ে নেশাচ্ছন্ন কণ্ঠে বলে গেল, 'ফাঁসির আসামীকে পেট ভরে খেতে দেয় শুনেছ তো। আমারও তো মৃত্যু পরোয়ানায় সই হয়েই গেছে, তাই জীবনের শেষ সুখটুকু উশুল করে নিলুম।'

বেশ-বাস অসম্বৃত, সে কথা খেয়ালও নেই অতসীর, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আকুল স্বরে বলতে থাকল, 'এ তুমি কী করলে, নীলুদা। কেন করলে?'

নিষ্ঠুর, কিন্তু আসক্তি-গাঢ় কণ্ঠে নীলাদ্রি বলল, 'তোমাকে ভালবাসি বলে।'

স্তম্ভিত জড় পাথরের মূর্তির মত পাশের ঘরে বসে সুধা অতসীকে বলতে শুনল, 'মিথ্যা কথা। তুমি ভালবাস শুধু নিজেকে। নইলে আদিত্য মজুমদারের কথায় আমাকে ফেলে পালাতে না।'

তিক্ত গলায় নীলাদ্রি বলল, 'সে সব অতীতের কথা থাক অতসী। বর্তমানে এস। শুধু অপমান করতে তোমাকে ডাকিনি অতসী, একটুখানি সুখ ছিনিয়ে নিতেও নয়। আমার উদ্দেশ্য আরও স্থূল। আমাকে কিছু টাকা দাও, সে টাকায় চিকিৎসা করাব। আমি শুধু সেরে উঠতে চাই অতসী। অনেক দূরে চলে যাব। কথা দিচ্ছি, আর কোনদিন ফিরে আসব না, তোমাদের সুখের পথে কাঁটা হব না। টাকা দাও অতসী।'

চোখের জল শুকিয়ে গেছে, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে বসল অতসী। বলল, 'টাকা? টাকা কোথায় পাব?'

'নীচ। ইতর।' নীলাদ্রির চোখ দুটি দিয়ে যেন স্ফুলিঙ্গ ঝরতে থাকল। 'আজ বাদে কাল শহরের অন্যতম ধনীর যে অঙ্কশায়িনী হবে তার কাছে টাকা নেই, একথা কেউ বিশ্বাস করবে না অতসী।'

ক্লিষ্ট স্বরে অতসী বলল, 'বেশ, বিশ্বাস ক'র না। আদিত্যর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, একথাও বোধ হয় বিশ্বাস কর না।'

নীলাদ্রি আবার সজোরে বলতে যাচ্ছিল 'না', কিন্তু অতসীর চোখে চোখ পড়ে কেমন যেন হতচকিত হয়ে গেল। বিমূঢ়, অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, 'সম্পর্ক নেই?'

অতসী নিস্তেজ গলায় বলল, 'না। আদিত্য আমাকে ঠকিয়েছে।'

'তোমাকে ঠকিয়েছে', নিজেই কথাটা আবৃত্তি করল নীলাদ্রি, কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়ল। বলল, 'তোমাকেও ঠকিয়েছে? তবে তো আদিত্য আমাদের দু'জনকেই ঠকিয়েছে অতসী।'

প্রশ্ন করতে হল না, নীলাদ্রি নিজে থেকেই বলে গেল, 'হাসপাতাল থেকে আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে এল সারিয়ে তুলবে বলে, সাউথ ইণ্ডিয়ায় চালান করে দিল, হাতে কিছু টাকা দিয়ে। বলল, স্যানাটোরিয়মে চিঠি লিখে দেবে, গেলেই ওরা আমাকে ভর্তি করে নেবে। কিন্তু সে চিঠি তো লিখল না। দিনের পর দিন স্যানাটোরিয়মের দরজায় ধন্না দিলুম, সীট নেই। চিঠি লিখলুম আদিত্যকে, জবাব পেলুম না। হাতের টাকা ফুরিয়ে এল, শেষে কোন গতিকে ফের পালিয়ে এলুম কলকাতাতে। আদিত্যর সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করেছি, পারিনি।'

দম নিয়ে নীলাদ্রি ফের বলল, 'তোমাদের ওখানে উঠিনি, কেননা তোমার মা পছন্দ করতেন না। তা-ছাড়া যে সম্পর্কটা শেষ হয়ে গেছে, সেটার জের টানতে আমার রুচি ছিল না। উঠলুম এখানে, আমার এই বন্ধুর বাসায়। বৌ বাপের বাড়ি, বন্ধু থাকতে দিলে। কিন্তু এ আস্তানাও আমার ঘুচবে অতসী, ওর বৌ কাল-পরশুই এসে পড়বে, চিঠি এসেছে, কোলে একটা বাচ্চা নিয়ে। একটা মোটে ঘর, বাইরের লোককে রাখবে কোথায়।' গলা নামিয়ে নীলাদ্রি ফিসফিস করে বলল, 'আমার কী অসুখ এরা এখনও জানে না, তবু বন্ধুটি কিছু সন্দেহ করেছে মনে হয়। আজ সকালে বারকয়েক কেশেছি, তখন ও বারবার সন্দিগ্ধ চোখে আমার মুখের দিকে চাইছিল। এ রোগ তো লুকানো যায় না, ঝলকে ঝলকে বেরোয়। অগত্যা আজ তোমাকে খবর দিয়েছিলুম। ভাবলুম তুমি তো অনেক পেয়েছ, আমি শুধু গোটা কতক টাকা নিয়ে যাব। ঘুষ দিয়ে মৃত্যুর পেয়াদাকে, আর একবার ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করব।'

অল্প-অল্প হাঁপাতে শুরু করেছে নীলাদ্রি কিন্তু কোটর থেকে প্রায়

ঠিকরে পড়া মণি দুটো ফের যথাস্থানে ফিরে গিয়ে স্থির হয়েছে। পরম অনুরাগে অনুতাপে অতসীর কৃশ, শিথিল একখানি হাত হাতে টেনে নিয়ে নম্র গলায় বলে গেল, 'হিংসা-দ্বেষে অন্ধপ্রায় হয়েছিলুম, নইলে আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।' অতসীর শীর্ণ নিষ্প্রভ মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'অসুখের সঙ্গে আমার নিত্য সম্পর্ক, তবু অ-সুখকে দেখামাত্র চিনতে পারিনি। তোমাকে আর আদিত্যকে অভিন্ন ভেবেছিলুম। তোমাকে অপমান করে আদিত্যর ওপর চেয়েছিলুম শোধ তুলতে। যে ভ্রান্ত বুদ্ধির বশে বিধর্মী মন্দির অপবিত্র করতে ছোটে, এও তাই।' অতসীর কোলে আকুল মুখ ডুবিয়ে অসহায় শিশুর মত ওর কটি বেষ্টন করল নীলাদ্রি, ধরা-ধরা গলায় কেবলি বলল, 'ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।'

আর, অতসী এবারে সঙ্কুচিত হল না, রাগ করল না, সরে গেল না, গভীর স্নেহে, উদ্বেগে নীলাদ্রির চুলে আঙুল বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'চুপ কর! তোমার কোন দোষ নেই।'

নীলাদ্রি উঠে বসল, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে বলল, 'এত সবের পরেও বলছ, দোষ নেই?

'এত সবের পরেই বলছি।' অতসী শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আসলে কী জান নীলুদা, আমরা সবাই চলাফেরা করছি অন্ধকার একটা ঘরে। আপন পর ঠাহর করতে পারিনে, নিজেদেরই মাঝে মাঝে আঘাত করে বসি।'

নীলাদ্রি বলল, 'আমার অবস্থা আরও করুণ। এই অন্ধকার ঘরেও আমার স্থান হবে না।' নিজের জীর্ণ বুকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'অন্ধকারতর পাতালে যাবার ডাক এসেছে।'

'না'। দৃঢ় গলায় অতসী বলে উঠল, 'এখানেই থাকবে তুমি। পারি তো এই অন্ধকারেই একটি কোণ, আমরা আলো করে তুলব।'

'আমরা, অতসী?' নীলাদ্রি চমকে বলল, 'তুমি আর আমি?'

নীলাদ্রির একখানা হাত করতলে নিয়ে অতসী বলল, 'তুমি আর আমি।'

অনেকক্ষণ অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নীলাদ্রি, মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে বলল, 'না, তা হয় না।'

অতসী বলল, 'কেন হয় না, কেন হয় না নীলুদা।'

তেমনি মাথা নেড়ে নীলাদ্রি বলল, 'তোমাকে সবাই ঠকিয়েছে অতসী, আমি আর ঠকাব না। আর কদিন বা আয়ু আমার, তোমাকে কী দিতে পারব। সহায় না, ঘর না, এমন কি আমার এই রোগ, এই স্বাস্থ্য, তোমাকে একটি সন্তানও দিতে পারব না। দেওয়া উচিতও হবে না।'

অতসী বলল, 'তবু।'

'তার চেয়েও ভয়ের কথা কী জান, মরার অনেক আগেই আমাদের ভিতরে বেঁচে থাকার ইচ্ছেটুকুও মরে গেছে, আমাদের সব পরাজয়ের এও হয়ত একটা বড় কারণ। আমার কাছে কিছু তো পাবে না অতসী।'

অতসী বলল, 'চাইনে।'

একটু থেমে, অনেক সঙ্কোচ জয় করে বলল, 'আমিই বা কী দেব তোমাকে, কিছু না। একটা নিষ্পাপ শরীর পর্যন্ত না।'

পরম মমতায় একটি সরমকম্পিত দেহ স্পর্শ করে নীলাদ্রি বলল, 'আমি জানি।'

সুধার মনে আছে ওদের বিদায় দিতে নীলাদ্রি সেদিন দরজা পর্যন্ত এসেছিল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল সেই লোকটা, নীলাদ্রির বন্ধু। হিম-হিম শীতে বিড়ি টানছিল, আর একবার আকাশে, একবার রাস্তার গ্যাসের আলোর দিকে চেয়ে ছিল। হয়ত ভাবছিল, কতদূর গেলে গ্যাসের এই আলোটাকে আকাশের তারার মত নিবু-নিবু ক্ষীণ দেখাবে।

নীলাদ্রি বলল, 'সুবোধ এঁদের একটা রিক্সা ডেকে দাও।'

হাতের বিড়িটা ফেলে দিয়ে লোকটা জোরে জোরে পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল, একটু পরে বোধ হয় সদর রাস্তা থেকে, একটা রিক্সা ডেকে নিয়ে এল।

দোকানপাট কখন বন্ধ হয়ে গেছে, নির্জন মোড়ের পাহারাওয়ালার মতই

বি[illegible]ান পথ, ষাঁড় আর কুকুরের সঙ্গে ভাগাভাগি করে ফুটপাথে, বারান্দার নিচে বেঠিকানা অনেকগুলি মানুষ ময়লা চাদরে বুক ঢেকে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে আছে, অল্প অল্প হাওয়া। ভূগর্ভ নালায় একটি নিরবধি জলধারা, তালে তালে রিক্সার ঠুনঠুনে সঙ্গৎ, আর কোন শব্দ নেই।

সেই স্তব্ধতা ভেঙে সুধা হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি কোথায় যাব, ফুলমাসি।'

অতসী বুঝি চমকে উঠল, তাড়াতাড়ি রিক্সার হাতলটা ধরে বলল, 'তুই তবে সব শুনেছিস?'

সুধা বলল, 'শুনেছি।'

মাথা নিচু করে খানিকক্ষণ কী ভাবল অতসী, আস্তে আস্তে বলল, 'তুই দিদির কাছে ফিরে যা সুধা।'

সমস্ত দেহ কঠিন করে সুধা দৃঢ় অস্বীকৃতি জানাল।

'না, ফুলমাসি, সেখানে আমাকে ফিরে যেতে ব'ল না।'

চোখ দুটি জলে ভরে গেল সুধার, পথ ঝাপসা, রাস্তার প্রতিটি আলো যেন দুটো হয়ে গেছে। ফুলমাসি বোঝে না কেন সেখানেও সুধা বাঁচবে না। বেশ তো ছিল সেখানে, অজ্ঞান, অবোধ কৈশোর-মোহে। কেন ফুলমাসি তাকে টেনে আনল শহরে, তিক্ত-বিচিত্র-মধুর জীবনের স্বাদ দিল। ফুল তুলত, ফল কুড়োত যে-মেয়েটি, সে কবে মরে গেছে, আজ কার কাছে ফিরে যাবে সুধা।

অতসী বলল, 'সেখানে অন্তত এই শহরটার চেয়ে বেশি শান্তি পাবি সুধা।'

সুধার চোখের সমুখে চকিতে একটা ছবি ভেসে উঠল। বাবা উদ্‌ভ্রান্ত, মা জীবন্মৃত, নীলু নিখোঁজ, ভাইবোনেরা উপবাসী। তেমনি দৃঢ়তার সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, 'না ফুলমাসি, সেখানেও শান্তি নেই। বাবা তো তোমাকে সব বলে গেছে।' বলতে বলতে অতসীর একেবারে গা ঘেঁষে বসল সুধা, রিক্সাটা নড়ে উঠল, অতসীর হাত দুটি চেপে ধরে সুধা মিনতি করে বলল, 'আমি তোমার কাছেই থাকব ফুলমাসি।'

অতসী চট্ করে কোনো উত্তর দিতে পারল না, রিক্সাটা আরও অনেকটা পথ গড়িয়ে গেল। সাহসে ভর করে সুধা বলল, 'একেবারে বোকা মেয়েটি

এসেছিলাম, কিছু বুঝতাম না। আমাদের জায়গা গ্রামে নেই, শহরেও নেই, সেটা এখন বুঝেছি। পালিয়ে কোথায় যাব। তবু—' বলতে বলতে প্রবল একটা আবেগে সুধার দেহ রোমাঞ্চিত হল, 'তবু যদি বুকে জোর থাকে সুলমানি, তবে হয়ত এই শহরটাকেই আমরা একদিন আপন করে নিতে পারব।'

১৫

কাক সকালে সুধার ঘুম ভেঙেছে। চাঁদ ডুবেছে, রোদ ওঠেনি, শিশির-জ্যোৎস্না উঠোনের শিউলি গাছের পাতায়, মাঝে মাঝে কনকনে হিম হাওয়া।

মিটমিট চোখে সুধা চারদিকে চেয়েছে। ঘরের কোণে কমিয়ে রাখা বাড়ন্ততেল হারিকেনটা কখন নিবে গেছে, সব কিছু অস্বচ্ছ, ফিকে ফিকে, কিন্তু চোখে পড়ছে ঠিক।

ওদিকটাতে জানালার ঠিক নিচেই তক্তাপোশে নীরদ শুয়েছেন, গেঞ্জিটাকেই বুঝি মাঝরাতে খুলে বালিশের মত করে নিয়েছিলেন, মাথাটা কখন সরে গেছে, সুধা ক্ষীণ একটি ঘর্ঘর শুধু শুনছে।

ওদিকে ঢালা বিছানায় নীলু, মিতু, পীতু, বিনুরা। এর পা ওর গলায়, ঠিক শ্বাসনালীর ওপরে, ওর হাতে এর নাক চাপা পড়ে গেছে, কেউ বা প্রাণপণে জড়িয়ে ধরেছে আর একজনকে। তবু কিন্তু কারুর ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি। সুধা এখান থেকেই কয়েকটি নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনছে।

পীতুর সব চেয়ে বেশি জায়গা চাই। ছটফট করতে করতে কখন সে সরে গেছে বিছানা থেকে, একটা পা তক্তাপোশ থেকে ঝুলছে। মিতু হঠাৎ খুক খুক করে কেশে উঠল, ঘুমের ঘোরেই কেঁদে উঠল নীলু। মা পাশ ফিরে তাকে কোলে টেনে নিলেন।

আস্তে আস্তে মা নীলুকে চাপড়াতে শুরু করেছেন, নীলু থামে না, দুর্বোধ্য অভিমানে ঠোঁট দুটি থরথর, চোখের পাতা কিন্তু তখনও বন্ধ, মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ওঠে, মা আরও ঘন ঘন চাপড়ান, নীলু অস্থির, অন্ধপ্রায়, অভ্যস্ত হাতে বুকের আঁচল সরিয়ে তার সান্ত্বনার উৎসটি খোঁজে।

মার ঠিক কোল ঘেঁষে একদিকটাতে শুয়েছে সুধা। প্রথমে চায়নি, আপত্তি

করেছে, কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা। মা ছাড়েননি।—'কতদিন পরে এলি, কতদিন দেখিনি। তোর সঙ্গে আমার কথাও আছে।'

বিছানায় শুয়ে শুয়ে সুধা কতক্ষণ প্রতীক্ষা করল, কিন্তু মার কাজ আর ফুরোয় না। নীরদ এই দীর্ঘ ট্রেনজার্নির পরও মাদুর বিছিয়ে বসেছে, নিজের লেখা খাতা নিজেই পড়ছে তন্ময় হয়ে। কলকাতায় খাতাখানি সর্বক্ষণ তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে, কিন্তু খুলে বসবার সুযোগ হয়নি, কাজের চাপ, পরিসর কম, লোকের ভিড়। মাঝে মাঝে শুধু ছুঁয়ে দেখেছে, কেউ যখন কাছে নেই, গোপনে বোঁচকা খুলেছে।

একবারটি দেখা শুধু, একবার ছোঁয়া। তার বেশি না। কারও পায়ের শব্দ পেতেই ফের বন্ধ করেছে পুঁটুলী। কেউ যেন না দেখে, কেউ যেন টের না পায়।

বিয়ের পরে প্রথম প্রথম, কলকাতায় শ্বশুরবাড়িতেও এই রকম অসুবিধে হত। তখন অহরহ রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, স্পর্শতৃষিত আঙুল, তপ্ত ওষ্ঠ স্ফুরিত একটি অধর খোঁজে; ছাতের কার্নিসে নিঃসঙ্গ একটি পারাবতের পরিপূর্ণ আতুর কণ্ঠ, চোখে ভাসে স্রস্ত কুন্তল, নিবিড় বাহুপাশ, ঘন-নিশ্বাসিত মুখ, রোমাঞ্চিত ত্বক।

কিন্তু মল্লিকাকে পাওয়া যেত না। আড়ালে শোনা যেত তার হাসি, অতসীকে কী যেন একটা মজার কথা বলছে, দেখা যেত দ্রুত-ত্রস্ত দুটি ভিজে পা স্নানঘর থেকে বেরিয়ে এল বুঝি; কখনও কবাটের আড়াল থেকে উঁকি দিত কালো-কোমল দুটি চোখ; কিন্তু ধরা দিত না।

শুধু একদিন নীরদ ধরে ফেলেছিল। কৌটোয় বন্দী মৌমাছির মত সে কী কাঁপুনি। কাঁচপোকার পাখা কেটে মেয়েরা যেমন ছেড়ে দেয়, নীরদও তেমনি চুলের কাঁটা তুলে খোঁপা খুলে ছেড়ে দিয়েছিল।

ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৌকা যেমন অনেক দূর সরে যায়, পালটুকু শুধু অস্পষ্ট চোখে পড়ে, সেই বিহ্বল দিনগুলি তেমনি অনেক যোজন উজানে চলে গেছে, এখন শুধু স্মৃতিরতি। তপ্ত ধাতুপাত্র ধীরে ধীরে জুড়িয়ে আসে, রূপগন্ধস্পর্শ-মোহও

তেমনি জুড়িয়েছে, ফেন-উত্তাল দুগ্ধশুভ্র বাসনার ওপর এখন একটি শান্ত সর।

সুধা, পীতু, নীলুরা একে একে এল, প্রিয়তমা জননী হল, কামনার কয়লা হল হীরে, নীরদ সেই রূপান্তর দর্শকের মত প্রত্যক্ষ করেছে। সে অনুভূতিও কম বিচিত্র নয়। দেহের দেয়ালে দেয়ালে ঘা খেয়ে খেয়ে এতদিন ফিরেছে অন্ধ, বন্দী সুখ-পাখি, সে যেন হঠাৎ ছাড়া পেয়েছে নীল নির্মল আকাশে, হিম হাওয়ায়, রেশম-জাল কুয়াশায়, আলোর কণিকায়, ঘাসের ডগার রোদশিশির হাসিতে। সেই অপর্যাপ্ত, অসহ্য, অস্থিরকে সে ধরে রাখতে চেয়েছে তার গানে, কথায়, বিনিদ্র রাত্রির রচনায়। যাদের সে দেখেনি, চেনে না, বস্তুরূপে যারা নেই সেই লোক গাথার, পুরাণের, প্রবাদের অধরা রূপকুমারীরা স্বপ্নে তার কাছে সত্য হয়ে উঠেছে। মনোমঞ্চে নিত্য তাদের নৃত্যপর মঞ্জীর, পায়ের নিচে আর্দ্র মাটি; তার ভূমা, তার ভূমি।

কলকাতায় যে তিনটি দিন ছিল, তখন এই অনুভূতি মিথ্যে হয়ে গিয়েছিল। ইতিহাসের বর্মপরা রাজপুতানীর মত শহরের বুক শানবাঁধান, দেহে কিম্বা মনে কোমলতা কোথাও নেই। সেই রূপকুমারীদের নূপুর বোবা হয়ে গিয়েছিল, নীরদ সব ইন্দ্রিয় একাগ্র করেও তাদের আভাস-মাত্র পায়নি।

তারা সব ফিরে এসেছে এতদিনে, অনাড়ম্বর এই ঘরটিতে স্তিমিত দীপ ঘিরে কাল চুলের ঢল নেমেছে। খোলা খাতাখানির পাতা আপনা থেকেই উল্টে যাচ্ছে, একের পর এক, নীরদ পড়ছে না, কম্পিত আঙুলে স্পর্শ করছে।

মসৃণ, প্রসারিত পুঁথির পাতায় হাত বোলান, এও বুঝি একরকমের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি। প্রথম যৌবনের সেই অধীর-রুধির দিনগুলির কথা মনে পড়ল, লবণাক্ত একটি বিস্মৃত স্বাদ আবার যেন ফিরে পেল ওষ্ঠপুটে। ঘন-নিঃশ্বাসিত মুখ, অনাবৃত গ্রীবা, বক্ষতট, মাংসল বাহুসন্ধি। নিসাক্ষী বাসরে কুণ্ঠাকণ্টকিত মল্লিকার থরথর দেহ স্পর্শ করে এমনি রোমাঞ্চই হয়েছিল।

সে-সুখ যেমন সত্য ছিল, আজকের এই সুখও তেমনি। কিম্বা বুঝি দুই-ই এক, শুধু বেশ বদল করে এসেছে। যা ছিল প্রসন্ন সকাল, তাই বিষণ্ণ বিকেল

হয়েছে। বাইরের রঙ-রূপের মত অন্তরও বদলায়, সেই সঙ্গে সুখের সংজ্ঞাও চরমের অধীরতা পরমের শান্তিতে সম্পূর্ণ হয় ওঠে।

আবার সেখানেও শেষ নয়। প্রৌঢ় সন্ধ্যার শান্তির পর স্তব্ধ রাত্রি, কিন্তু আবার তো আছে আরক্ত সকাল। সেই সকালে নীরদ থাকবে না, কিন্তু লোভ, ক্ষোভ, ব্যাকুলতা আবার সত্য হয়ে উঠবে, কামনার কোরক শতদল হয়ে ফুটবে সুধা, পীতু, নীলুদের অন্তরে, সে-পাপড়িও আবার একদিন একটির পর একটি ঝরে যাবে। তৃষ্ণা-তৃপ্তি-বিতৃষ্ণা, বাসনা আর বৈরাগ্যের বৃত্ত নিরবধি কাল ধরে আবর্তিত হবে।

একবার নীরদের লোভ হল, সুধাকে ডেকে শোনায় একটু। ফিরে তাকাল, কিন্তু সুধা ঘুমিয়ে পড়েছে। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল পুঁথি সমুখে রেখে, পাতার পর পাতা উল্‌টে গেল হাওয়ায়, শেষে মল্লিকা এক সময় এসে ফুঁ দিয়ে বাতি নিবিয়ে দিল।

সুধার যখন ঘুম ভাঙল, তখন মল্লিকা ফিরে এসেছে নিজের বিছানায়, চোখের পাতায় গাঢ় ঘুম, অবিন্যস্ত বেশ, শ্রান্ত দুটি ঠোঁট অল্প একটু ফাঁক হয়ে আছে। ছোট দু'খানি হাত বাড়িয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল সুধা, কণ্ঠার কাছটা ঘামে ভেজা, চিবুকের কুঞ্চনে একটু-বা বয়সের ছাপ; শিথিল, রেখাঙ্কিত একটি তলপেট স্পর্শ করে সুধা আর একটি অসহিষ্ণু প্রাণের স্পন্দন অনুভব করল।

তারপর, একেবারে ভোরে বুঝি সুধা আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে দেখল রোদে ঘর ভরে গেছে, বিছানা খালি। উঠে বাইরে এল।

রান্নাঘরে কী যেন ভাজা হচ্ছে, মল্লিকাকে ঘিরে বসেছে পীতু-মিতু-নীলুরা।

সুধা শুনতে পেল পীতু বলছে, 'আমরা পরটা খাব তো মা?'

মল্লিকা বলল, 'না। তোমরা আজও মুড়ি খাও, লক্ষ্মীটি। দিদি এতদিন পরে এসেছে, ওকে শুধু দু'খানা ভেজে দিচ্ছি।'

নীলু চীৎকার করে উঠল, মাটিতে লাথি মেরে বলল, 'কক্ষণো হবে না।'

মিতু নাকি-সুরে ককিয়ে ককিয়ে বলল, 'আমরা রোজ রোজ বাসি মুড়ি চিবোব, আর দিদি বুঝি শহর থেকে এসেছে বলে—'

মল্লিকা বলল, 'রোজ কেন। আজ একদিন শুধু। এতদিন পরে এসেছে।'

পা ছাড়িয়ে কাঁদতে বসল মিতু। মল্লিকা গরম খুন্তিটা দিয়েই তার পিঠে পর পর দু' ঘা বসিয়ে দিল, চেঁচিয়ে বলল,—

'বেরো, বেরো শিগ্‌গির এখান থেকে, নইলে তোকে মেরেই শেষ করব।'

মিতু উঠল না, গড়াগড়ি খেতে থাকল রান্নাঘরের মাটিতে। পীতু গম্ভীর-মুখে উঠে বাইরে এল।

সেখানে চুপচাপ, চোরের মত দাঁড়িয়েছিল সুধা। কাল রাত্রে দেখা হয়নি, দুই বোন এই প্রথম চোখ তুলে পরস্পরের দিকে তাকাল।

সুধা হাসতে গেল, পারল না, সহজভাবে এগিয়ে গিয়ে ধরতে পারল না পীতুর হাত। এত ভাব ছিল দু'জনে, অথচ এখন মনে হচ্ছে কোন কালের চেনা মাত্র, সুধা এদের কেউ না।

রান্নাঘরে মল্লিকা আবার পরটা ভাজতে শুরু করেছে, তখন থেকে অপলক চেয়ে আছে পীতু। সুধা মাথা নিচু করল। পীতুর চোখের ভাষা পড়তে তার ভুল হয়নি। স্থির-নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে ঘৃণার শুকনো আবীর ছড়িয়ে পীতু নীরবে বলছে, 'বেশ তো দূরে চলে গিয়েছিলি, আবার কেন আমাদের খাবারে ভাগ বসাতে এলি। কেন এলি, কেন ফিরে এলি।'

অপরাধীর মত সুধা মাথা নিচু করেই রইল।

সেই অপরাধ-বোধ সুধা মার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েও বোধ করেছে। কেমন একটা আড়ষ্টতা, ভয়-ভয় ভাব। মার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে সাহস পায় না, পলক পড়ে, মাথা আপনা থেকেই নিচু হয়ে আসে। যেন সুধার জামায় মুখে অজস্র কালির ছিটে লেগেছে, মা তীক্ষ্ণ চোখে দেখছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, তাঁর মুখের রেখায় অনুচ্চারিত একটি ভৎর্সনা: কোথা থেকে এত কালি লাগালি বল।

নিজের গালের দিকে মাঝে মাঝে সুধা চেয়ে দেখেছে, সত্যিই কোথাও কালি লেগেছে কিনা। খুঁজে পায়নি। আয়না সুমুখে রেখে পরীক্ষা করে। কই বাইরেও কিছু নেই। সেই চোখ, সেই নাক, সেই ভুরু সে তো সেই সুধাই আছে।

মল্লিকা মাঝে মাঝে তাড়া দেয়।

'কলকাতা থেকে একেবারে বিবি হয়ে এসেছিস। দিনরাত শুধু সাজ আর সজ। তোর ফুলমাসি কি তোকে শুধু এই শিখিয়েছে।'

চট করে আয়নাটা লুকিয়ে ফেলে, সুধার কান লাল হয়ে ওঠে। শুধু লজ্জা নয়, পাপ-বোধও। মুখের ওপর যেন কড়া টর্চের আলো ফেলে মল্লিকা চেয়ে আছে, কী অন্যায়ের কীট যেন সুধার চোখে খেলা করছে, কাঁপছে দু'খানি পাতলা ঠোঁটে, সব ধরা পড়ে যাবে।

মাথা নিচু করে সুধা বলে, 'ফুলমাসি কিছু তো শেখায়নি মা।'

'তবে আয়না সামনে রেখে এতক্ষণ করিস কী।'

'চুল বাঁধব কিনা দেখছিলাম।'

মল্লিকা এসে গোছা করে ধরল মেয়ের চুল, সস্নেহ আঙুলে জট ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, 'এখনও খোঁপা বাঁধবার মত হয়নি।'

মল্লিকা সরে যেতে সুধা স্বস্তি পেয়েছে। অমন করে তাকায় কেন মা, কী জেনে নিতে চায় তার কাছে। বন্ধকী গহনা ছাড়িয়ে নেবার সময় লোকে যেমন পরখ করে দেখে, ঠিক-ঠিক তার জিনিস কিনা, মল্লিকাও কি তেমনি দেখছে যে-মেয়েটিকে সে গচ্ছিত রেখেছিল অতসীর কাছে, ঠিক তাকেই ফেরৎ পেয়েছে কিনা।

সুধা মাঝে মাঝে ভেবেছে চীৎকার করে মাকে বলবে, এত পরখ করে কাজ কী মা, আমি তোমার সেই সুধাই আছি। বলতে পারেনি। মনে হয়েছে কথাটা যেমন সত্যি তেমন মিথ্যেও। সে সেই সুধাই বটে আবার নয়ও। মাথায় বেড়েছে, মনে ছড়িয়েছে, আর ?

আর জেনেছে।

হঠাৎ সুধা চমকে ওঠে। হয়ত এই জানাটুকুই পাপ, অন্তত তার মার চোখে। বেশ ত থাকে ডিমের মধ্যে পাখি, উষ্ণ-নরম পালক দিয়ে তার মা তাকে ঢেকে রাখে। সে তবু বাইরে আসে, রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে ডানা ঝাপটায়, ফল ঠুকরে ঠুকরে খেতে যায়, ঝড়ে পাখা ভাঙে, থুবড়ে পড়ে মাটিতে। নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু সেই মৃত্যুর আগে জেনে নেয় জীবনকে, তার বিচিত্র, তিক্ত-কটু-কষায় স্বাদ পায়।

সেই স্বাদ পেয়েছে সুধাও। কিছু-না জানার খোসা ভেঙে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে পা বাড়িয়েছে। জানাই পাপ, পাপই মৃত্যু।

সৌভাগ্যের কথা, সেই মৃত্যুর পথে সুধা একা নয়; তারই আগে আগে মিছিল চলেছে, ফুলমাসি, নূপুর, ডাক্তার, নিশীত, নূপুরের মা, আদিত্য, নীরদ, মল্লিকা—হাঁ, তার মা-ও।

যারা এগিয়ে আছে, তারা পিছনের লোকের দিকে চেয়ে ভাবে, ওরাও আবার এই কাঁটা আর কাঁকরের পথে কেন এল! কিন্তু নিজেরা এক দিন কেন এসেছিল সেটা মনে নেই।

সেই বিস্ময়, সেই বিস্মৃতি মল্লিকার চোখেও।

মেয়ের দিকে চেয়ে ভাবে এমন কেন হ'ল, কী-করে বদলে গেল সুধা; খেয়াল থাকে না সে নিজেও এক দিন এমনি বদলেছিল, অনেক ক্লেশ, অনেক ক্লেদ, অনেক দুঃখ, রোমাঞ্চ. স্বেদ আর অভিজ্ঞতায় স্নাত হতে হতে নতুন একটি শরীর-মন পেয়েছিল। একটি একটি করে জ্ঞানের কাঁটা ফোটে, পাপড়ি খোলে, তবে কুঁড়ি ফুল হয়।

বাইরে দাঁড়িয়ে পীতু বলল, 'দিদি তোর নামে চিঠি এসেছে।'

চিঠি, কার চিঠি? সুধা চমকে উঠল। আয়না নামিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে দেখল, খাকি সার্ট পরা গ্রামের পিওন হন হন করে ফিরে যাচ্ছে।

'দিয়ে যা চিঠি। ভেতরে আয় না।'

হাতে নীল একটা খাম, পীতু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। আড়ষ্ট ভঙ্গি,

একটু-বা সন্দিগ্ধ। ভিতরে এল না, চৌকাঠের উপর পা রেখেই থামটা নাড়তে লাগল।

এই একটা অদ্ভুত ধরন পীতুর, দূরে দূরে থাকে, সুধার কাছে ঘেঁষে না! প্রথম দু'দিন তো কথাই বলেনি, মুখোমুখি পড়ে গেলে, ঠাণ্ডা, মরা এক বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়েছে। আজকাল কথা বলে, তাও একটা দুটো, নেহাৎ ঠেকে গেলে।

'আয় ভেতরে আয়।' সুধা আবার ডাকল। একটু আগে আয়নায় মুখ দেখেছে তো, অদ্ভুত মিল আছে তার মুখের সঙ্গে পীতুর। পাড়ার লোকে বলত, যমজ। এক মুখের গড়ন, এক রকমের চুলের রাশ, নাক আর চিবুকের গঠনও এক। এক বছর পরে জন্মেও পীতু কয়েক বছরের মধ্যেই সুধাকে ধরে ফেলেছিল, তখন আর আলাদা করে ধরে ফেলার জো ছিল না। পাড়ার লোকের ভুল তো হতই, মা-বাবারও মাঝে মাঝে হত। এ ক' মাসে পীতু যেন মাথাতেও সুধাকে ছাড়িয়ে গেছে, সুধার তুলনায় একটু কালোও। কিম্বা এ-ও হতে পারে সুধা কলকাতা গিয়ে সামান্য ফর্সা হয়ে এসেছে, আবার গ্রামে ভুগে ভুগে আরও রোগা হয়েছে পীতু, ওকে তাই একটু ঢ্যাঙা দেখায়। নইলে বোনের আর বোল, তফাৎ তো মোটে এক বছরের।

এই এক বছরের তফাৎটুকুও ওরা মুছে ফেলেছিল। খাওয়ায়, খেলায়, পরায়, পড়ায় দু' বোন এক হয়েছিল। এক সঙ্গে পুকুরে ডুব, এক সঙ্গে পুতুল খেলা, এক সঙ্গে চৌধুরীদের বাগান থেকে কামরাঙা চুরি। সারাক্ষণ কানে কানে কথা, ভালবাসা, ভাব, আড়ি।

সেই পীতু কেমন ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। পীতু অবশ্য শাড়ি পরে, আর সুধা ফ্রক, কিন্তু প্রভেদটা শুধু বাড়তি কয়েক গজ কাপড়েই নয়।

শাড়ি সুধাও পরত, ফুলমাসিই কলকাতায় তাকে ফের ফ্রক ধরিয়েছিলেন। বলতেন, এই বয়সেই জুজুবুড়ি শাড়ি—সে ভারি বিশ্রী। কলকাতায় কিশোরী মেয়েরা শাড়ি পরে না।

এবার ফিরে আসার পরে মা সুধাকে শাড়ি পরতে বলেছিলেন—এতখানি

বয়স হল, এখনও পায়ের অর্ধেকটা খোলা থাকবে, এ আবার কোন দেশি বেহায়াপনা।

'শাড়ি আমার নেই যে মা।' সুধা ভয়ে ভয়ে বলেছিল।

'একটাও না?'

'না।'

মা চুপ করে গিয়েছিলেন। পীতুই তাঁর ছেঁড়া পুরনো শাড়িগুলো কুড়িয়ে নিয়ে পরে, সুধাকে আবার কোথা থেকে শাড়ি যোগাবেন।

ফ্রকই বহাল রইল।

'ভেতরে আয়।'

পীতু তবু এল না। চৌকাঠের উপর দ্বিধাগ্রস্ত দুটি পা, এক জোড়া বৈরী চোখ। বহুদিন আগে খেলতে গিয়ে সুধা চৌধুরীদের বাড়ির পিছনের নর্দমায় পড়ে গিয়েছিল। গায়ে লাগেনি, নোংরা হয়েছিল শুধু পায়ের পাতা। ঘাট থেকে পা ধুয়েই বাড়ি এসেছিল, তবু মা ওকে ঘরে উঠতে দেননি। ভাই-বোনদের বলে দিয়েছিলেন ওকে ছুঁবিনে তোরা। আগে চান করে আসুক।

সেদিনও দূরে দূরে ছিল পীতু, সুধা ডাকলেও সাড়া দেয়নি, এমনি সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে চেয়েছিল। সেই শীতের সন্ধ্যায় ডুব দিয়ে তবে সুধা ফের ওদের ছোঁবার অধিকার পেয়েছিল।

সেই অস্পৃশ্যতার গ্লানি এতদিন পরে সুধা নূতন করে অনুভব করছে। মা কিছু বলে দেননি, ভাই-বোনেরা নিজেরাই এবার কী করে টের পেয়ে গেছে সুধার কাছে আসতে নেই, ঘেঁষতে নেই। সেবার স্নান করে ত্রাণ পেয়েছিল এবার শুদ্ধি হবে কিসে।

দরজা থেকেই চিঠিটা ছুঁড়ে দিয়ে পীতু পালিয়ে গেল। সুধা কুড়িয়ে নিলে চিঠিটা, কম্পিত হাতে খামটা ছিঁড়লে।

নিশীথের চিঠি। রুলকাটা কাগজের ওপর ছোট ছোট অক্ষর, কিন্তু সংক্ষিপ্ত। সুধা একবার পড়লে, দু'বার, তারপর এ-পিঠ ও-পিঠ উল্টে

দেখলে। না আর কিছু নেই। অল্প কয়েকটি কথায় সুধার কুশল জানতে চেয়েছে নিশীথ, কোন প্রয়োজন হলেই স্মরণ করতে অনুরোধ করেছে।

নূপুরদের কোন উল্লেখ নেই।

বাহুল্য-বর্জিত কয়েকটি ছত্র, নিরুচ্ছ্বাস। তবু সুধা অনেকক্ষণ চিঠিটাকে মুঠোর মধ্যে রাখল। ঘামে ভেজা হাত, হয়ত একটু পরেই অক্ষরগুলো গলে করতলে কালির ছাপ উঠবে। উঠুক, সুধা একটু কলকাতার স্পর্শ পেতে চায়।

যতদিন ফুলমাসির ওখানে ছিল সুধা ততদিন নিশীথকে ভাল লাগেনি, যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেছে। সেদিন এই চশমাপরা সার্ট-স্মার্ট চালিয়াৎ ছোকরাটি ভীরু একটি গ্রাম্য কিশোরীর কাছে লুব্ধ নাগরিক বই কিছু ছিল না। আজ কলকাতা দূরে সরে গেছে তার সড়ক ইমারৎ গাড়ি-ঘোড়ার সমারোহ কলরব নিয়ে। সেই বিপুলতা, অজস্রতা, অপচয়, আড়ম্বর কাছে থাকতে চোখে পড়েনি, কিন্তু দূর থেকে রমণীয়, সুধার নির্জীব, ম্রিয়মান দিন আর শেয়াল ডাকা গ্রামসন্ধ্যাকে অস্থির করে তোলে। নিস্তরঙ্গ পুকুরপাড়ে বসে সুধা একটি মহাজীবনের তরঙ্গ দেখে, কল্লোল শোনে; মাঝে মাঝে স্বপ্নের মত এক একটি মুখ ভেসে ওঠে, ফুলমাসি, আদিত্য, নূপুর, নিশীথ। নিশীথ তো এখন আর কিশোরী সন্তাতুর জীবমাত্র নয়, প্রচণ্ড-প্রাণ নগর-আত্মার প্রতিনিধি। অনেকক্ষণ ধরে, চিঠিটাকে নাকের কাছে ধরে রাখলে সুধা, বুক ভরে ঘ্রাণ নিলে। নীল খামে নীল কাগজে কয়েক ছত্র লেখা সুধার কাছে একটি মেঘ-মন্দ্রিত রাত্রির আবেগ নিয়ে এসেছে।

'কার চিঠি, কার চিঠি রে।'

মল্লিকা কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সুধা টের পায়নি। বুক কেঁপে উঠল, মুখ শুকিয়ে গেল, কিন্তু এখন আর লুকোনর সময় নেই।

'কার চিঠি?' মল্লিকা জিজ্ঞাসা করল আবার, সুধা কিছু বলবার আগেই কাগজটা ছিনিয়ে নিল। ব্যাকুল হয়ে সুধা মার পায়ের উপর পড়ল, 'নিও না, মা, নিও না। আমার এক বন্ধুর চিঠি।'

মল্লিকা ততক্ষণ সরে দাঁড়িয়েছে। হাত দুটো তুলে কাগজটা খুলে বলল, 'কেমন বন্ধু তাই দেখছি।'

চিঠিতে আপত্তিকর কিছু ছিল না, কিন্তু স্বাক্ষর ছিল 'তোমার নিশীথ'। মল্লিকা ঠাস ঠাস করে চড় মারল মেয়ের গালে।

—'কলকাতা গিয়ে এইসব শিখেছ, শুধু শেখনি, আবার জুটিয়েও এনেছ। তাই সর্বদা মুখ ভার, এখানকার কিছুতে মন ওঠে না, ভাত মুখে রোচে না। আমি ভাবি বুঝি শরীর খারাপ,—কী করে জানব তলে তলে এত। এ-চিঠি আজই ওকে দেখাব, দেখি কোন বিহিত হয় কিনা।'

কঠিন হাতের চাপে কব্জি মুচড়ে গেল, মল্লিকার হলুদমাখা আঙুলের ছাপে গাল নীল-হলুদ হয়ে গেল, তবু সুধা কেঁদে উঠল না; নিশ্চল শুক্‌ন চোখের মণি, ঠোঁট দুটিও দাঁতের চাপে কঠিন নিস্পন্দ হয়ে গেছে।

মা ভেবেছে নিশীথকে সুধা বুঝি ভালবাসে। কী করে তাকে সুধা বোঝাবে নিশীথ নয়, নিশীথ নয়, মনে মনে সে যাকে বরমাল্য দিয়ে বসে আছে, তার নিঃশ্বাসে কালি, যন্ত্রে হৃৎস্পন্দ, পাথরে বুক বাঁধান; তার স্পর্শে বুক দুরু দুরু করে, বিতৃষ্ণায় সর্বাঙ্গ শুকিয়ে যায়, তবু সেই দৈত্য প্রবল দুটি বাহু বাড়িয়ে ভীরু একটি পল্লী কিশোরীকে অহরহ টানে। যার কাছে গেলে জ্বালা, দূরে গেলে বেদনা, সুধা আত্মনিবেদন করেছে সেই পরুষ, পরাক্রান্ত মহানগরের সমগ্র-সত্তার কাছে; তার পাশে নিশীথ ?—রুগ্ন, অক্ষম, নিবীর্য প্রণয়প্রার্থী মাত্র।

কিন্তু মাকে একথা বোঝান যাবে না।

১৬

সেদিন একটু পরেই নীরদও গুন গুন করতে করতে ঘরে ঢুকেছিল। এই বেলা পর্যন্ত ঘুরেছে এখানে ওখানে, জামাটা ভিজে পিঠের সঙ্গে লেগে গেছে, টকটকে মুখ।

'সুধা একটু হাওয়া করবি।'

পাখা হাতে সুধা পাশে এসে দাঁড়াল, আর সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

গুনগুন সুরের মোহ মুহূর্তে মুছে গেছে। নীরদ এতক্ষণে টের পেল কোথাও একটু গোলমাল হয়েছে। মেয়ের হাত থেকে পাখাটা টেনে নিয়ে বলল, 'কী হয়েছে রে সুধা।'

সুধা কথা বলল না, বলতে পারল না, পায়ের নখে একাগ্র দৃষ্টি রেখে, চুপ করে রইল।

'কী হয়েছে বলবি না আমাকে?' নীরদ আহত গলায় আবার জিজ্ঞাসা করল।

পীতু ঠিক তখনই কী কাজে ঘরে ঢুকেছিল, ফিরে চেয়ে ফস্ করে বলল, 'দিদির নামে একটা চিঠি এসেছে, মা তাই দিদিকে বকেছে।'

'চিঠি এসেছে, তাই বকেছে!' নীরদ নিজেই কথাটা পুনরাবৃত্তি করল, বোধ হয় চেষ্টা করল হৃদয়ঙ্গম করতে। একটু বিস্ময় ছিল গলায়, সেটা চিঠি আসায় না বকায় স্পষ্ট বুঝা গেল না।

'কার চিঠি', নীরদ জিজ্ঞাসা করল খানিক পরে।

'দিদির এক বন্ধুর।'

বন্ধুর? নীরদ যেন আরও হতবুদ্ধি হয়ে গেল। বন্ধুর চিঠি এসেছে বলে বকল কেন। আস্তে আস্তে অন্তরঙ্গ গলায় মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল,'কোন্ বন্ধুরে?'

জবাবটা পীতুই হয়ত দিতে পারত, কিন্তু যেটুকু কাজ ছিল শেষ করে সে তখন বেরিয়ে গেছে।

তুমি চেন না বাবা', সুধা মৃদু-ভীরু স্বরে বলল, 'তুমি তাকে দেখনি।'

'তবু, শুনিই না, কে।'

পীড়াপীড়িতে সুধাকে শেষ পর্যন্ত বলতেই হল, 'একজন ডাক্তার।'

'ডাক্তার? তোর বন্ধু? পুরুষ বন্ধু?'

থেমে থেমে নীরদ তিনটে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করল। আসলে প্রশ্ন তিনটে একই, একই বিস্ময় তিনটের মূলে।

মাথা নিচু করে রইল সুধা, মাটিতে মিশে যেতে চাইল। আর নীরদ কী করবে ঠিক পেল না, একবার মেয়ের মুখের দিকে, একবার হাতের খাতাখানার দিকে চাইল, অবিন্যস্ত চুলে আঙুল চালিয়ে চেষ্টা করল ধাতস্থ হতে, শেষে বাইরে এসে দাঁড়াল। মল্লিকাকে ইশারায় ডাকল, 'এই, শোন।'

গম্ভীর মুখে মল্লিকা বারান্দায় নীরদের পাশে এসে দাঁড়াল।

'সুধাকে ওর পুরুষ-বন্ধু চিঠি লিখেছে?'

'জানই ত। আবার জিজ্ঞাসা করা কেন।'

তাই তো, কেন। আসলে নীরদ মল্লিকাকে ডেকেছিল পরামর্শ করতে, কিন্তু মল্লিকা যে-রকম থমথমে মুখ করে রেখেছে, বেশি কথা বলতে ভরসা হয় না।

তবু অনেকক্ষণ পর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে নীরদ বলল, 'কী করা যায় বলত।'

ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সুধা মাকে বলতে শুনল, 'কিছু করবার নেই! দেখছ না, মেয়ের গায়ে ওর মাসির বাতাস লেগেছে। জল আরও কতদূর গড়িয়েছে তার খোঁজ কর আগে।'

আজ সকাল থেকে নীরদের মন প্রসন্ন ছিল। শেষরাতে প্রথম বইতে শুরু করে ভিজে হাওয়া তারপর তাতে আলোর ছোঁয়া লাগে, আজ ভোরে উঠতেই তেমনি নীরদের মনে গানের এক কলি ভেসে এসেছিল, একটু পরে তাতে লাগল

সুরের স্পর্শ। তারপর সারা সকাল এই একটি কলিই মৌমাছির মত মনচক্র ঘিরে গুঞ্জন করেছে, কিন্তু দোসর পায়নি।

এখন ঝাঁ-ঝাঁ রোদ, সকালের সুরের ছোঁয়াটুকু ঘাসশীষের শিশিরের মত কখন উবে গেছে।

একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার বুদ্বুদ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল, মল্লিকা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল যথারীতি, পীতু ছোট ভাই-বোনদের হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল কলতলায় স্নান করাতে, সুধা শুধু ঘরের ভিতর সঙ্কোচের পুঁটলি হয়ে নতমুখে বসে রইল।

বিক্ষিপ্তচিত্ত শামুকের মুখের মত নীরদের মধ্যেই গুটিয়ে এল। উঠোনের পেয়ারা গাছের ছায়া পড়েছে বারান্দার এক কোণে, সেখানে সে একটা মাদুর পেতে খাতাখানি খুলে বসল। এখান থেকে অনেক দূর অবধি স্পষ্ট দেখা যায়, পুকুর-পাড়ের উঁচু ডাঙায় স্তব্ধ একসার তালগাছ; আবহমানকাল থেকে ওরা একভাবে দাঁড়িয়ে, খেলোয়াড়ের মত হুইস্‌লের প্রতীক্ষা করছে। হঠাৎ অদৃশ্য কে বাঁশিতে ফুঁ দেবে, অমনি এক-পায়ে-খাড়া তালগাছগুলো শুরু করবে দৌড়তে। কত যুগ কেটে গেল, বাঁশী কিন্তু বাজে না, গাছগুলোর রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষাও শেষ হয় না।

ডাঙার পাশ দিয়ে পাশের গ্রামে যাবার পথ, সারা বুকে গোক্ষুর ক্ষত, কাদার গ্লানি, এঁকে এঁকে সড়কটা হঠাৎ ধান জমিতে নেমে পড়েছে, দু'ধার থেকে নুয়ে-পড়া ফসলের শীষে ঢেকে গেছে, এখান থেকে আর ভাল দেখা যায় না। তবু মাঝে মাঝে সবুজ ঢেউ সিঁথির মত দু'ধারে সরে গিয়ে পথ করে দেয়, দূরের নৌকোর পালের মত প্রথমে চোখে পড়ে গরুর গাড়ির ছই, তারপর এক সঙ্গে চারটে শিং, সবশেষে চলন্ত দু'টি চাকা। ডাঙায় যেই হৈ-হৈ করে গাড়োয়ান তুলে দেয় গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে ফসলের স্তূপ ফের নুয়ে পড়ে, সিঁথির মত পথটুকু নিঃশেষে মুছে যায়। তখন আবার এখানে ফিকে, ওখানে গাঢ় সবুজের ঢেউ দিগন্তের নীলের সঙ্গে একাকার।

সকালে বিদ্যুৎ-চমকের মত দেখা দিয়েই যে মিলটুকু সহসা মিলিয়ে গিয়েছিল,

তাকে আবার ফিরে পেতে নীরদ কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইল। পেল না। সাথীহীন কলিটি থেকে থেকে দংশন করছে মর্মকোরকে, জিদের মত নীরদ পাতার পর পাতা উল্টে গেল, সমস্ত চিত্ত একাগ্র করে রাখল, যদি সেই গুনগুন মিলটি মনের খোলা জানালা দিয়ে ভ্রমরের মত হঠাৎ এসে পড়ে, তাকে আর পালাতে দেবে না।

গরম তেলে তরকারী ছেড়ে দেবার শব্দে রান্নাঘরে মল্লিকার অস্তিত্বের আভাস। মিতু মাছভাজা খাবার লোভে ঢুকেছিল, মল্লিকা কড়া গলায় তাকে ধমক দিয়ে উঠল। কুয়োতলায় তখন থেকে পীতুর ঝর্ঝর জল ঢেলে স্নান করার শেষ নেই, ঘরে সুধা দু'হাতে কুণ্ঠিত একটি মুখ ঢেকে বসে আছে। নীরদ একবার ভাবল মেয়েকে কাছে ডাকে, আদর করে কাছে বসায়; একবার উঁকি দিয়ে দেখেও এল, কিন্তু ডাকতে পারল না। মুখ ঢেকে সুধা বসে আছে, কিন্তু কাঁদছে না কেন। একটু কাঁদুক, একটু কাঁদুক না মেয়েটা, কাঁদলে বেঁচে যাবে। চোখের পাতা দু'টি জ্বালা করে উঠল, মেয়ের কান্না নীরদ বুঝি নিজেই কেঁদে নেবে।

দোষ সুধার কিছু নেই, দোষ সেই শহুরে ডাক্তার নিশীথের। হয়ত নিশীথেরও না, তার শিক্ষার, তার পরিবেশের। এ যুগের মানুষের ধারাই ওই। ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষ, মানুষের সৃষ্টি ছোট-বড় নানা প্রয়োজন। অশন-বসন-বিলাস। সাযুধ মানুষ, সুখ-শিকারীও। কিন্তু কোথায় সুখ, এক বাসনা আর এক বাসনাকে ডেকে আনে, এক অভাব আর এক অভাবকে। ক্ষুত্তিক্লিষ্টের আরও চাই, আরও দাও হাহাকার অহরহ মনের মধ্যে। অস্থি-মজ্জা-মাংসের স্তূপে প্রাণ ঢাকা পড়ে গেছে। কামনার দগ্ধবালু প্রান্তরে তৃপ্তি-সরসী মরীচিকা সুখ সুদূর। শান্তি মেলেনি, মাঝখান থেকে মানুষ সংযম হারিয়েছে। সেই অসংযমই নীরদ যেন প্রত্যক্ষ করল নাগরিক নিশীথের মধ্যে।

মল্লিকা কাজের ফাঁকের এক ফুরসুতে বাইরে এসে বিনুকে দুধ খাওয়াতে বসল। পীতু স্নান সেরে ফিরে এসে বসল মার কোল-ঘেঁষে।—'আমার চুল একটু আঁচড়ে দেবে, মা?'

চুল-আঁচড়াতে গিয়ে গোটা দুই উকুন পড়ল চোখে, মল্লিকা মেয়েকে ধমক দিল। ঘরের ভিতর খেতে বসে নীলু আর মিতু কাড়াকাড়ি শুরু করেছিল, মল্লিকা তাদের তাড়া করে গেল।

আবার খাতার পাতায় চোখ ফিরিয়ে নিল নীরদ। এই সংসার। মল্লিকার, তার। তারও? হঠাৎ নীরদের মনে হল, এই সংসার বুঝি মল্লিকার একার। সন্তানসন্ততি তারও বটে, কিন্তু সে শুধু সৃষ্টিতে। এদের লালনে পালনে আদরে-শাসনে মল্লিকা স্বতন্ত্র একটা পরিমণ্ডল তৈরি করে নিয়েছে, সেখানে নীরদ কেউ নয়। এদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না অশ্রু-রক্ত জড়ান জীবনের কোন অংশ সে নেয়নি, সেই সংসারটুকু মল্লিকা রচনা করেছে নিজের ধ্যান-ধারণা, বুদ্ধি, সামর্থ্য দিয়ে,—এই দ্বিতীয় সৃষ্টিতে সহায়তা করতে নীরদকে ডাকেনি।

যৌবনের যৌথ সৃষ্টির পর দু'জনের পথ আলাদা হয়ে গেছে। মল্লিকা একাকী রচনা করেছে তার সংসার, নীরদও বসে থাকেনি, চলে এসেছে তার আপন সৃষ্টির ক্ষেত্রে। খাতার পাতাগুলোয় সস্নেহে হাত বুলিয়ে গেল নীরদ। যাদের দুঃখ-সুখের কথা এতে লেখা আছে তারাও মানুষ; তারা নীরদের অনেক বিনিদ্র রাত্রির সাধনা, অনেক অস্থির উন্মন দিনের ধ্যানের ফল। সেই উত্তেজিত, অধীর স্বেদপ্লুত সৃষ্টির মুহূর্তগুলিতে মল্লিকা পাশে ছিল না, কাছে আসেনি, খোঁজও করেনি, কাদের নীরদ পৃথিবীতে নিয়ে এল। শ্রান্ত সূতিকায় প্রসূতির মত নীরদ একাকী তার নবজাতকদের বুকের কাছে সংগোপনে রেখেছে। এক সৃষ্টির কাজ ফুরিয়েছে, তার বদলে নীরদ পেয়েছে আর এক কাজ, তাদের সৃজনের বেদনা, আনন্দ।

প্রৌঢ়ত্বের প্রথম সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে নীরদ যেন দাম্পত্য-সম্পর্ককে নতুন আলোয় দেখতে পেল।

সেই যে সেদিন ঘরের মধ্যে মাথা নিচু করে বসেছিল সুধা, তারপর অনেকক্ষণ বার হয়নি। মাঝখানে একবার শুধু খেতে ডাক পড়েছিল। সুধা একবার

ভেবেছিল যাবে না, কিন্তু আরও হৈ-চৈ, চেঁচামেচির ভয়ে শেষ পর্যন্ত উঠে খেয়ে এল, কিন্তু মাথা তুলল না। মল্লিকাও ভাত বেড়ে দিয়ে আড়ালে চলে গিয়েছিল, একবার জিজ্ঞাসাও করেনি সুধার আর কিছু চাই কি না।

আবার ঘরে ফিরে এল সুধা। খাটের পায়ার কাছে সেই চিঠিটা তখনও জড়সড়, কুণ্ডলী-পাকান। সুধার একবার লোভ হল তুলে নিয়ে আবার পড়ে, নিশীথ কি লিখেছে। আজ আর নিশীথের প্রতি কোন বিরাগ নেই, সে আর নিশীথ যেন একই ধাপে, একই অপমানের সাথী।

হঠাৎ সুধার চোখে পড়ল পীতু কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছে। একটুখানি এগিয়ে পীতু এদিক-ওদিক তাকাল, তারপর বাড়ির দিকে ফিরে কী যেন ইশারা করল। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল নীলু, বিনু, মিতু। মিতু ওদের সঙ্গে ছুটতে পারছে না, পিছিয়ে পড়ছে, আছাড়ও খেল একবার—কাঁদতে শুরু করল। পীতু ফিরে এল তাড়াতাড়ি। ঠোঁটের উপর তর্জনী রেখে বলল, শ্‌ শ্‌ শ্‌। কাঁদতে পাবে না বলছি। তাড়াতাড়ি চলতে পার না, তবে আমাদের সঙ্গে আসা কেন।

আশ্চর্য মেয়ে মিতু, অভিমানে গাল ফুলে উঠল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কান্না সামলে নিল। আবার একসঙ্গে চলতে শুরু করল ওরা, এবার হাত ধরাধরি করে।

ওরা কোথায় যাবে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবনা নেই সুধার, কতদূর আর যাবে, বড় জোর গাঙ্গুলীদের কলমীশাকে ঢাকা পুকুর-পাড়ে কিম্বা সরকারদের পোড়ো বাড়িটার বাগানে জামগাছটার ছায়ায় বসে তেঁতুল বিচি নিয়ে খেলবে। সুধাই তো একদিন ওদের চিনিয়েছে কলমী দীঘির সোজা পথ। মা-বাবা ঘুমিয়ে পড়লে নিজে পীতুকে সরকারদের বাগানে নিয়ে গেছে।

আজ না-হয় সে দল-ছাড়া। ওরা তাকে একবার খোঁজও করে না।

—দিদি!

কানের কাছে ফিসফিস শুনে সুধা ফিরে তাকাল, দেখল নীলুকে। জানালার ঠিক নিচে গোঁড়ালিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—'দিদি। মেজদি তোকে ডাকছে।'

মেজদি মানে পীতু। সুধা বলল, 'যাব না।'

'মেজদি কাঁদছে!'

কাঁদছে! সুধা ভেবে পেল না তাকে ডেকে পাঠিয়ে পীতুর কাঁদতে বসার অর্থ কী। জিজ্ঞাসা করল, 'পীতু কোথায় রে।'

নীলু ইশারায় দেখিয়ে দিল—পীতু কাছেই।

'দিদি, আসবি না?'

আসবে, সুধা আসবে। আর কিছু না হক, গোটাকতক কড়া কথা তো বলে আসবে পীতুকে, যত কথা যত জ্বালা কলকাতা থেকে ফিরে এসে অবধি মনে জমা হয়ে আছে। নীলুকে বলল, 'তুই যা। যাচ্ছি।'

মা ঘুমিয়ে, বাবা খাতার পাতায় নিমগ্ন। সুধা বেরিয়ে পড়ল পা টিপে টিপে; একটু এগিয়ে যেতেই দেখা গেল পীতুকে। কাছাকাছি যেতেই পীতু চোখ নামিয়ে নিল। আজ সারাদিন সুধার মাথা নিচু করে কেটেছে, এবার পীতুর পালা।

একেবারে কাছে যেতেই পীতু নীলুকে বলল, 'তোরা আগে আগে যা। আমি আর দিদি পরে আসছি।'

বিনু-মিতু-নীলুরা চোখের আড়াল হতেই পীতু এসে সুধার হাত ধরল।—'দিদি রাগ করেছিস?'

এতক্ষণ অনেক শক্ত কথা সুধা রসনাগ্রে শানিয়ে রেখেছিল, কিন্তু পীতুর জলটলটল চোখের দিকে তাকিয়ে তার একটাও মুখে এল না।

পীতু ওর দু'খানি হাত ধরে বলল, 'দিদি, রাগ করেছিস?'

সুধা তবু চুপ। পীতুও চুপ করল। দুটি আশ্লিষ্ট কোমল করপল্লবের স্পর্শে স্পর্শে অনেক কথা বলাবলি হ'য়ে গেল।

দূর থেকে দেখা গেল নীরদকে আসতে। দু' বোন সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে পড়ল একটা জাম গাছের আড়ালে। নীরদ অন্যমনস্ক, ওদের দেখতেও পেল না।

ফিসফিস করে পীতু বলল, 'বাবা কোথায় যাচ্ছে জানিস।'

'জানি, চৌধুরী-বাড়ি।'

'বল্ তো কেন?'

'বাবা যে পালাটা লিখেছেন, সেটা এবার বাসন্তী পুজোয় দেখানো হবে, বোধহয় সেই পরামর্শ করতে।'

'উঁহু', পীতু মাথা নেড়ে বলল; 'হল না। আসল কারণ আমি জানি।'

'টাকা চাইতে?'

'তাও না। তবে এবার কাছাকাছি এসেছিস। মাথাটা নামিয়ে আন্ কানে কানে বলি।'

এতক্ষণ সহজ ছিল পীতু, হঠাৎ ওর মুখের পেশীগুলো কঠিন হ'য়ে উঠল, ক্রুত, নিষ্ঠুর, কিন্তু নিশ্চিত কণ্ঠে বলল, 'বাবা নীলুকে বিক্রি করে দেবে।'

বিক্রি করে দেবে! সুধার হাত শিথিল হয়ে পীতুর মুঠি থেকে খসে পড়ল। আহত, অবিশ্বাসী গলায় সুধা বলে উঠল, 'বিক্রি করে দেবে!'

অভিশাপ উচ্চারণ করার মত স্থির স্বরে পীতু বলল, 'দেবে। আমি জানি। বাবা আর মাকে এ-নিয়ে কথা বলতে শুনেছি। মেজ চৌধুরীর ছেলে-পুলে নেই, তিনি নীলুকে দত্তক নিতে চান। বাবাকে খুব ধরেছেন। তিন হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে রাজী আছেন।'

'বরাবরের মত নীলুকে নিয়ে নেবেন?'

'বরাবরের মত। দত্তক মানে জানিস না? নীলু মেজ চৌধুরীর ছেলে হয়ে যাবে। দিদি নীলু তখন আমাদের চিনতে পারবে?'

সে-কথার উত্তর না দিয়ে সুধা বলল, 'বাবা-মা রাজী হয়েছেন?'

'এখনও হয়নি, হবে। মাকে রাজী করাতেই তো বাবা কলকাতা যাবার পর মেজ চৌধুরী দু'বার আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। মা বোধ হয় এখন রাজী।'

'রাজী?' সুধা তীব্র চীৎকার করে উঠল।

পীতু বলল, 'রাজী। আমরা যে বড় গরীব দিদি। বাবার কাজ নেই, মার সব গহনা হাতছাড়া হয়ে গেছে, দেখছিস না, রোজ বাজার পর্যন্ত হয়ে না? যেটুকু চলছে তাও চৌধুরীদের দয়ায়।'

'তাই বলে নিজের ছেলেকে পর করে দেবে?'

'উপায় কী। এর আগেও তো দিয়েছে।'

'কবে, পীতু, কবে?'

সুধার ব্যাকুলতা বিন্দুমাত্র স্পর্শ করল না পীতুকে, শান্ত গলায় ধীরে ধীরে বলল, 'ফুলমাসির কাছে দেয়নি তোকে?'

ও, এই। সুধার মুখের সমস্ত রক্ত নিমেষে তিরোহিত হল, অনেক দিন অবচেতন মনে যেটুকু অনুভব করেছে, সেটা যেন পীতুর কথায় নিরাবরণ হয়ে প্রকাশ পেল। আস্তে আস্তে মাটিতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল সুধা। পীতুও ওর পাশে বসল।

অনেকটা সান্ত্বনার সুরে পীতু বলল, 'মা-বাবারই বা দোষ কী সুধা। আমরা যে-ক'জন আছি, তাতেই চলে না, আবার আরও একটা আসছে। মা ভেবে ভেবে পাগলের মত হয়ে গেছে, জানিস?'

সুধা নখ দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে ঘাস ছিঁড়ে যেতে লাগল। অনেক পরে মুখ তুলে বলল, 'আমি ভাবছি এর পরেও মার হয়ত ছেলেপুলে হবে, তখন তো বিক্রি করবার মত ছেলেও থাকবে না, ফুলমাসিও হয়ত রাজী হবে না আর একটা মেয়ের ভার নিতে। তখন ওরা কী করবে। মেয়ে বিক্রি করতে শুরু করবে?'

'মেয়ে তো কেউ দত্তক দেয় না', পীতু সংশয়াচ্ছন্ন গলায় বলল, 'মেয়ে কি বিক্রি হয়?'

'হয়' শহরের অভিজ্ঞতা থেকে সুধা বলল, 'মেয়েও বিক্রি হয়।'

১৭

দেউড়িতে একদা সিংহ রাগে কেশর নাড়ত, আগন্তুক এলে ভোজপুরী সিপাই বন্দুক কাঁধে দাঁড়াত সোজা হয়ে। এখন সিংহের নখ নেই, লাঙুল নেই, ভোজপুরী সিপাইও অন্তর্হিত। কেয়ারি-করা বাগানের অনেকটাই ঝোপে-ঝাড়ে আগাছায় ঢাকা, মর্মর নগ্নিকারা আরও নির্লজ্জ।

তবু বারদালান দিয়ে কাছারিঘরে পৌঁছতে এখনও মিনিটখানেক লাগে।

নায়েব প্রসন্ন সরকার মাথা নিচু করে খাতা লিখছিলেন। নীরদকে দেখে বললেন, আসুন, ফরাসের প্রান্ত দেখিয়ে বসতে ইসারা করলেন, কিন্তু ফের তাঁর মনোযোগ গেল খাতায়।

নীরদ বললেন, 'চৌধুরী মশাই এখনও নামেননি, না?'

বিড়বিড় করে ঠোঁট নেড়ে অঙ্কের হিসাব করতে করতেই প্রসন্ন মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'না।'

চুপ করে নীরদ বসল ফরাসে, লক্ষ্য করে যেতে লাগল নায়েবের ঠোঁট নাড়ান, গলায় কণ্ঠীমালা, সাদা-পাকা মেশান বাবরি চুল। উপরে চেয়ে দেখল কড়িকাঠের আড়ালে একটা চড়ুই পাখি কবে বাসা করেছে কে জানে, ঝাড়লণ্ঠনের কাচ ধুলো-কালিতে অস্বচ্ছ, টানা পাখাটার ঝালরে ঝুল, অনিচ্ছুক কপিকল থেকে একটা কর্কশ ক্ষীণ গোঙানি উঠছে।

'চৌধুরী মশাই এখনও ঘুমোচ্ছেন?' নীরদ অনেকক্ষণ পরে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করল। নায়েব মশাই তেমনি হিসাবরত ভাবেই মাথা নেড়ে বললেন, 'হাঁ।'

দেয়ালঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল। পুরনো আমলের ঘড়ি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারিখটিও বলে দেয়। ব্যস্তভাবে চড়ুই পাখিটা একবার ঘরে ঢুকে বাসাটার চারপাশে ঘুরল, আবার উড়ে গেল। মেজচৌধুরীর পূর্ব-

পুরুষ শক্তিশেখরের তৈলপ্রতিকৃতির চোখের ভ্রূকুটি ছায়া-ছায়া ঘরে আরও তীব্র হয়ে উঠল।

নীরদের চাদরের নিচে আছে পালার খাতাখানি. নীরব কাল হরফ-সাজান পাতা ক'টি বুকের ধুকধুক ঢেকে দিচ্ছে।

নীরদ উঠে দাঁড়াল। নায়েবকে বলল, 'আমি এবার যাই।' কিন্তু বলার ভঙ্গীটা স্বগত।

নায়েব এতক্ষণে খাতা বন্ধ করে তাকানর ফুরসৎ পেলেন। তাই ত' এই লোকটা অনেকক্ষণ বসে আছে, এতক্ষণ খেয়াল হয়নি। এসেছিল যখন, চোখে পড়েছিল—ওর দু' একটা কথার জবাবও দিয়ে থাকবেন। কিন্তু যা বলেছেন, অত্যন্ত যান্ত্রিকভাবে, ভেবে নয়। সারাদিন কত লোকই তো কত আর্জি নিয়ে আসে, খাজনা মুকুবের কাঁদুনি শুনে শুনে কান ঝালা-পালা হয়ে গেল। মনে হয়েছিল এ-ও তাদেরই একজন হবে। সুতরাং থাকুক বসে। হিসাবটা আগে তৈরি হোক, ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্না শোনার সময় ঢের পাওয়া যাবে।

এতক্ষণে খেয়াল হল, এ-তো খাজনা বাকী রাখা প্রজা নয়, পাগলাটে পালা লিখিয়ে নীরদ, কর্তার বিশেষ প্রিয় ব্যক্তি।

নীরদ যেই বলল, 'আমি এবার যাই'—নায়েব ওমনি সম্বিৎ ফিরে পেলেন। সসম্ভ্রমে বললেন, 'যাবেন, সেকি। কর্তার সঙ্গে দেখা না করেই—'

নীরদ কুণ্ঠিতস্বরে বলল, 'ঘুমুচ্ছেন শুনলুম।'

'ঘুমুচ্ছেন? কে বললে ঘুমুচ্ছেন?' নায়েব বিনয়াবনত হয়ে পড়লেন, 'আমি বলেছি নাকি? ওই দেখুন, কাজে ব্যস্ত ছিলাম, কী বলতে কী বলেছি খেয়াল করিনি। না মশাই কর্তা উঠেছেন অনেকক্ষণ। কলকাতা থেকে ওঁর এক বন্ধু এসেছেন তাঁর সঙ্গে গল্পগুজব করছেন। খবর দেব?'

নীরদ একটু ইতস্তত করল, হাত দিয়ে একবার অনুভব করল বুকের কাছে ঢাকা খাতাটিকে, শেষে বলল, 'আচ্ছা, দিন।'

চাকর গিয়ে খবর দিল, নীরদের ডাক এল মিনিট দুই পরেই।

প্রেমাংশু চৌধুরী তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ফরসিতে সুখ-টান দিচ্ছিলেন, নীরদ যেখানে প্রবেশ করল সেটা একটা মৃদু-সুরভিতে ধূম্রলোক। কে-কে আছে নীরদের ভাল ঠাহর হল না। কিন্তু প্রেমাংশু ওকে দেখতে পেলেন ঠিক। বললেন, 'এস হে নীরদ, এস এস।'

দরজার বাইরে পাখা-টানা ছোকরা ঢুলছিল, সে কর্তার গলা শুনে জোরে জোরে দড়ি টানতে শুরু করল, নিমেষে ধোঁয়া-শুরু ঘরটা স্বচ্ছ হয়ে উঠল। ফরাশে মেজ-চৌধুরীর পাশেই আরেকটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে যে ভদ্রলোক বসে আছেন, তাকে নীরদ এতক্ষণে দেখতে পেল। লোকটি বয়সে তাদের সমানই হবে, মেজ-চৌধুরীর মত এতটা তুলতুলে নধর-দেহ না হলেও, বোঝা যায় সৌখীন। চোয়ালের ঈষৎ উঁচু হাড়ে শ্রমপটুতার ইঙ্গিত, ছোট-ছাঁটা গোঁফের রেখায় হয়ত বা একটু ধূর্ততা। পরনে পাৎলুন, ভদ্রলোক হাঁটু মুড়ে বসতে পারেননি, তক্তাপোশে পা ঝুলিয়ে বসেছেন। সামনে একটি সুদৃশ্য কেশ, ঠোঁটে একটি সিগারেট।

দু'জনে মৃদুস্বরে কী কথা চলছিল, নীরদ এসে পড়তে একেবারে থেমে গেল। মেজ-চৌধুরী মুখ আর নাকে যত ধোঁয়া উদ্গীরণ করলেন, পাখার হাওয়ায় তার সবটুকুই মিলিয়ে গেল, আগন্তুক কেস থেকে একটির পর একটি সিগারেট ধরাতে লাগলেন।

অনেক পরে প্রেমাংশু বললেন, 'আমার এই বন্ধুটিকে তুমি বোধ হয় চেন না নীরদ, ইনি কলেজে আমার সতীর্থ ছিলেন, আজ কলকাতা থেকে এসেছেন।' আগন্তুকের দিকে ফিরে বললেন, 'আর এ হ'ল নীরদ, এই গ্রামেরই লোক, বিশেষ গুণী ব্যক্তি। অনেক গানের পালা লিখেছে।'

আগন্তুক একবার নীরদের চোখে চোখ চেয়ে নিস্পৃহস্বরে বললেন, 'বটে'।

নীরদ খাতাখানি বার করল আলগোছে। ফরাশে পেতে বলল, 'বাসন্তী পুজো তো এসে গেল। আজ পার্ট-টার্টগুলো ঠিক করে দেবেন বলেছিলেন—"

'বলেছিলুম নাকি।' প্রেমাংশু নলটা সরিয়ে রেখে বললেন, 'কই দেখি।' খাতার পাতা উলটে-পালটে দেখে আবার রেখে দিলেন। 'কিন্তু মুশকিল

কি হয়েছে জান নীরদ্, আজ তো এসব দেখার আমার সময় হবে না। আমার বন্ধুটি বিশেষ কাজ নিয়ে এসেছেন, ওর সঙ্গে কিছু পরামর্শও আছে। আজ রাত্রেই ওকে আবার চলে যেতে হবে।'

আগন্তুক উঠে গিয়ে জানালার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, নীরদ তাঁর মুখ দেখতে পেল না, কামান ঘাড়ের নিচে কড়াকলার শার্ট আর চওড়া কাঁধ দেখা গেল শুধু।

মুখ কাঁচুমাচু করে নীরদ বলল, 'তা হলে আজ না হয়—'

প্রেমাংশু বললেন, 'সেই ভাল। এসব কী জান হে, শখের জিনিস, অবসর না হলে ঠিক জমে না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসব বন্দোবস্ত হয় না।'

নীরদ বলল, 'আমি তা-হলে উঠি?'

'উঠবে, এখুনি? ব'স কিছু জল টল খেয়ে যাও। আলাপ কর আমার বন্ধুটির সঙ্গে। সুধন্ত এস না হে, এদিকে এস।'

আগন্তুক ফিরে তাকালেন, পলকের জন্যে নীরদের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হল।

প্রেমাংশু বললেন, 'সুধন্ত আর আমি এক সঙ্গে পড়তুম। আমি বছর দুয়েক পরেই ওসব পালা চুকিয়ে ফিরে এলুম দেশে। সুধন্ত তার পরে আরও তিন-চারটে পাশ দিয়েছে। ওকালতিতে নাম করেছে, আবার বিজনেস করছে বেনামীতে। সুধন্ত কিন্তু ভাল অভিনয়ও করে হে। এ্যামেচার দলে বারকয়েক নেমেছে। দেবে নাকি তোমার পালায় ওকে একটা পার্ট?'

প্রেমাংশু পরিহাস করছেন কিনা বোঝা ভার, কাঁচুমাচু মুখে নীরদ বলল, 'বেশ ত।'

আগন্তুক হাত বাড়িয়ে দিলেন—'কী বই আপনার দেখি।'

নীরদ হাতটা টেনে নিতে পারল না বটে, খাতাখানি সমর্পণ করতেই হল, তবু একটু আত্মাচ্ছন্দ্যের কাঁটা মনে ফুটেই রইল। কোথায় যেন বৈরিতা আছে এই লোকটার তার সঙ্গে, পোশাকে, কথায়, বৃত্তিতে দু'জনের একটুও মিল নেই।

খাতাখানি ফেরৎ দিয়ে সুধন্ত বললে, 'এতো দেখছি যাত্রার পালা।'

নীরদ বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ', হৃত ধন যেন ফিরে পেয়েছে এমনি আগ্রহে বইটি চেপে ধরল। প্রেমাংশুকে বলল, 'আমি তবে চলি।'

প্রেমাংশু দরজা পর্যন্ত ওর সঙ্গে এলেন। কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললেন, 'নীরদ কিছু ঠিক করলে?'

'কিসের?'

'এই, মানে তোমার ছেলেটিকে এখানে দেবার······'

পাংশু মুখে নীরদ বলল, 'এখনও কিছু ঠিক করিনি। পরে আপনাকে খবর দেব।'

বাইরের ঘরে নায়েব তখনও হিসাব দেখছে। মিটমিট চোখে চেয়ে বলল, 'ঠিক হল কিছু?'

চমকে উঠল নীরদ, বলল, 'ঠিক? কিসের ঠিক?'

নায়েব পূর্ববৎ নিস্পৃহ স্বরে, কিন্তু কৌতুকদীপ্ত চোখে বলল, 'কী সে তা আপনিই জানেন।'

পলকে কঠিন হল নীরদের মুখ, এই মিটমিটে শয়তান নায়েবটা হিসাবের খাতায় মুখ গুঁজে থাকলে কী হবে, সব জানে। অর্থের বিনিময়ে যে পুন্নাম নরক থেকে বেরুবার একমাত্র যষ্টিও বিক্রয় করতে চায়, সেই অক্ষম দৈন্যন্যুব্জ পিতৃত্বকে মনে মনে ও পরিহাস করছে কি না, কে জানে।

কিন্তু লজ্জিত, কিছু ভীত গলায় নীরদ বললে, 'বাসন্তী পুজোর পালাটা নিয়ে পাকাপাকি কথা বলতে এসেছিলুম, কর্তা আরেক দিন আসতে বললেন।'

বাসন্তী পুজোর পালা? আর কিছু নয়? নায়েব তখনও তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছে, যেন নীরদের মনের ভিতরটা পর্যন্ত পড়ে নেবে। অনেকক্ষণ ধরে নীরদকে লক্ষ্য করে বলল, 'ওসব আশা এখন কিছুদিনের মত শিকেয় তুলুন নীরদবাবু। এস্টেটের অবস্থা ভাল নয়। কর্তা বাজে খরচ করবেন বলে মনে হয় না। ওই যে কলকাতার বাবুটিকে দেখলেন না, ওঁকে কর্তা নিজেই ডেকে এনেছেন পরামর্শ করবেন বলে।'

'পরামর্শ,—কিসের পরামর্শ?'

দিনের কাজ শেষ হয়ে এসেছিল; ভিতর থেকে একজন চাকর ধুনো দেখিয়ে গেল কাছারি ঘরে। জানালা বন্ধ করে দিলেন নায়েব, অন্ধকারে ওর মুখের বিচিত্র হাসির রেখা কয়টিও মুছে গেল। নীরদ একটি চাপা স্বর শুনতে পেল শুধু—'কত সিক্রেট আপনাকে বলব মশাই। ধরুন কর্তা তো ব্যবসায় নামতে পারেন, এই যে এত পতিত জমি পড়ে আছে এখানে খুলতে পারেন আখের কল···কিম্বা ধরুন, মাছ চালানি ব্যবসা—'

'মাছ চালানি ব্যবসা করবেন চৌধুরীরা?'

নায়েব বলল, 'আপত্তি কি। যে-দেশে রাজারা কাল পর্যন্ত বেনে ছিল সেখানে জমিদারেরা শেষ পর্যন্ত বৈশ্য হবে আশ্চর্য কি?'

বাড়ি ফিরে নীরদ দেখল সুধা বিছানায় শুয়ে, প্রবল জ্বর।

পীতুর সঙ্গে সন্ধি হয়ে যাবার পর সুধা দিশে হারিয়েছিল। সব প্রভেদ ঘুচে গিয়েছিল নিমেষে, মুছে গিয়েছিল কলকাতাবাসের কয়েকটা দুঃস্বপ্ন মাস।

কানের কাছে মুখ নিয়ে পীতু বলেছিল, 'দিদি নাইতে যাবি?'

'কোথায়, কোথায় রে।'

'সরকারদের পুকুরে।'

একবার ইতস্তত করল সুধা, 'এখন, এই শেষ বেলায়?'

'তা'তে কী।' পীতু নেচে উঠল হাততালি দিয়ে,—'আমরা তো কত যাই। তুই-ও তো আগে যেতি, দিদি, মনে নেই?'

আছে। যেটুকু দ্বিধা ছিল সুধার মনে, পলকে নুয়ে পড়ল; অনেক আগে খোয়ানো একটা ছেলেমানুষি খুশীতে মন ছেয়ে গেল। বলল, 'চল।'

প্রথমে পাল্লা দিয়ে সাঁতরে ওরা সাঁপলা তুলে আনল। একটু একটু শীত করছে সুধার, একটু গা শিরশির্ ভয়। অভ্যাস নেই, একটুতেই হাঁপিয়ে পড়ল। পারল না পীতুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

হাঁপাচ্ছে পীতুও, কিন্তু তার ঈষৎ রক্ত চোখে, স্নানসহন বাহুতে আরও সাঁতারের নেশা। বলল, 'এবার ডুব সাঁতার দিবি?'

কুণ্ঠিত মুখে সুধা বলল, 'না রে, আর পারব না।'

'পারবি, আয়।' ওর হাত ধরে টেনে পীতু আবার ঝাঁপ দিল জলে, টুপ করে মাথা ডুবিয়ে দিল।

দেখাদেখি ডুব দিল সুধাও, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারল না, অল্প পরেই মাথা তুলে এদিক ওদিক তাকাল।

পীতু কোথাও নেই।

অপরাহ্ণের দীঘি, পাড় ঘিরে স্নেহনত ঘনপত্র গাছের সারি, দিনমানের রৌদ্রতাপে মুদিত রক্ত কৌমুদীর পাতার আড়ালে একটা বা দুটো ডাহুক, মৎস্যাশী কোন বক একবার ছোঁ দিয়েই জল ঝেড়ে শুক্ল-লঘু পাখা মেলে উড়ে গেল, পাতার আড়ালে অজানা একটা পাখি থেকে থেকে ডাকছে কট, কট, কট। আর সব নিঝুম। ভয়ে ভয়ে সুধা একবার ডাকল, পীতু! সাড়া এল না। বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করছে সুধার, হাঁটু ঠক্ ঠক্ কাঁপছে। পীতু যদি আর না ওঠে, যদি সাপলার নালে জড়িয়ে গিয়ে থাকে ওর পা, তবে সুধা বাড়ি ফিরবে কী করে। কোন্ মুখে দাঁড়াবে মার সম্মুখে। যেন পীতুকে চিরকালের মত হারানো নয়, মার কাছে বকুনি খাওয়ার ভয়টাই বেশি সুধার।

হঠাৎ সুধার মনে হ'ল একটা বুদ্বুদের রেখা এপার থেকে ওপারের দিকে সরে যাচ্ছে; একটু পরেই পীতুকে হুশ করে মাথা তুলতে দেখা গেল। সুধা চীৎকার করে ডাকল, 'চলে আয় চলে আয় এদিকে রাক্ষুসী।' পীতু হেসে আবার ডুব দিল। মেয়ে নয়ত, পানকৌড়ি।

ডাঙায় এসে উঠল যখন, ওর সর্বাঙ্গে জল ঝরছে, সাঁতার-মাতাল, শ্রান্তি-উত্তাল বুক, চোখ দুটি বিস্ফারিত। সুধার জামা গায়েই প্রায় শুকিয়ে এসেছিল। বলল, 'বাড়ি চল একবার, তোমার কীর্তির কথা মাকে যদি না বলি—'

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল; ভয় ছিল মাকে হয়ত সদরেই দেখতে পাবে; ওদের দেখে তাড়া করে আসবে, শক্ত করে ধরবে চুলের মুঠি। সে-সব কিছু হল না। কোন ঘরে আলো জ্বলেনি, তুলসীতলাতে পর্যন্ত প্রদীপ নেই। শোবার ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে সুধা ভয়ে ভয়ে চাপা গলায় ডাকল, 'মা!'

অন্ধকারের ভিতর থেকে ক্ষীণ সাড়া এল, 'এই যে আমি। তোদের বাবা আসেনি রে?'

পীতু বলল, 'কই না তো।'

মল্লিকা তেমনি ক্লান্ত গলায় বলল, 'আলোটা জ্বেলে দিবি? আজ তোরাই দু' বোনে যা-হয় কিছু ফুটিয়ে নে। আমার শরীরটা কেমন করছে।'

পীতু আলো জ্বেলে আনতে দেখা গেল ঘরের ভিতরের সবটা। মল্লিকা তক্তাপোশে শোয়নি, নীরদ যেদিকটাতে মাদুর বিছিয়ে লেখে, সেখানেই একটা কাঁথা পেতে কাৎ হয়ে পড়ে আছে। শিয়রের কাছে বিনু, মিতু, নীলু; অবোধ তিনটি শিশু, ব্যথিত, বোবা শঙ্কাতুর চোখে মার মুখের উপর ঝুঁকে আছে।

পীতু তাড়া দিল ওদের, 'যা বাইরে যা।' সুধার হাতে একটা পাখা দিয়ে বলল, 'তুই মার কাছে একটু ব'স দিদি, আমি উনুনটা ধরিয়ে আনি।'

কোমরে আঁচল জড়িয়ে নিয়েছে পীতু, পলকে এই হাসি-খুশী শান্ত মেয়েটির বয়স যেন দু' বছর বেড়ে গেছে।

পীতু রান্নাঘরে ঢুকল, মল্লিকা তেমনি মাটিতে পড়ে গোঙাতে লাগল, চৌকাঠের বাইরে থেকে নীলু, বিনু, মিতুরা ভীতু উৎসুক চোখে উঁকি দিল, আর পাখা নিয়ে সুধা অনেকক্ষণ সম্মোহিতের মত বসে রইল মার শিয়রে। ভয় সে পায়নি, মার এ-রকম শরীর খারাপ হওয়ার অভিজ্ঞতাও তার কাছে নূতন নয়, তবু সমস্ত শরীর যেন অবশ, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, কপালের দু'টো শিরা যেন থেকে থেকে চমকে উঠছে। পীতু ফিরে এসে দেখল, হাত থেকে পাখা খসে পড়েছে, সুধাও ঢলে পড়েছে মার শিয়রে। ডাকল, 'দিদি।'

সুধা আরক্ত দু'টি চোখ মেলে অস্ফুট কণ্ঠে সাড়া দিল। পীতু ওর কপালে হাত দিয়ে দেখল, ঠিক বুঝল না, আচলে হাত মুছে হাত রাখল গলার কাছে। চমকে উঠল। বলল, 'ইস্, গা যে একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। তুই বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড় দিদি।'

টলতে টলতে বিছানায় গিয়ে গড়িয়ে পড়ল সুধা, ইশারায় এক গ্লাস জল

চাইল। জল খেয়ে ফের বালিশে মাথা রেখে, কুণ্ঠিত গলায় বলল, 'মাকে কে দেখবে ?'

পীতু হেসে বলল, 'যতক্ষণ পারি, দু'দিক আমিই সামলাব। এক বেলা পুকুরে চান করেই জ্বর হল, তুই একেবারে শহুরে হয়ে গেছিস দিদি।'

একটু পরেই নীরদ এল। বিমূঢ় চোখে একবার মল্লিকা একবার সুধার দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করল না। নিঃশব্দে জামাটা খুলে আলনায় ঝুলিয়ে রাখল।

তিনদিন আচ্ছন্ন, অচৈতন্যের মত কাটল সুধার। জ্ঞান হ'তেই চোখ মেলে খুঁজল মাকে, দেখতে পেল না, কিন্তু দর্মাঘেরা বারান্দার ভেতর থেকে কানে এল ক্ষীণ কান্না, নবজাতকের কাকলি।

পীতু ওর জন্যে বার্লি নিয়ে এসেছিল। সুধা শীর্ণ হাত বাড়িয়ে বোনের গলা ধরে ফেলল, মুখের কাছে ওর কান নামিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'আমাদের ভাই হয়েছে, না রে ?'

পীতু বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু তুমিও আমাদের কম ভয় ধরিয়ে দাওনি দিদি। আর কক্ষণো পুকুরে নাইতে পাবে না ?'

সুধা মৃদু হেসে বলল, 'পাগল, আর কখনো যাই ? জেদ করে তোদের মত হ'তে গেছলুম, পারলুম না। পুকুরে সাঁতার দেবার দিন আমার জন্মের মত ফুরিয়ে গিয়েছে ভাই।' একটু থেমে দম নিল সুধা, বাষ্পায়িত গলায় অপরাধীর মত বলল, 'তুই বোধ হয় ঠিকই বলেছিলি পীতু, আমি শহুরে হয়ে গেছি।'

১৮

কিসের পর কী ঘটেছিল সুধার ভাল মনে নেই। অনেক স্মৃতি একসঙ্গে মিশে আছে, ছাড়ান সোজা পরিশ্রম নয়, ধান থেকে চাল খুঁটে খুঁটে ডালায় তোলার মত।

এমনিতেই ছুটোছুটি করতে ভাল লাগত না, অসুখ থেকে উঠে আরও যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। রাতের পর সকাল আসে, উঠোনোর পাশের পেয়ারা গাছের পাতার ঠোঁটে ঝিকিমিকি একটু হাসি ফোটে, পুবের দাওয়া স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে যায়, মণ্ডলবাড়ির প্যাঁক-প্যাঁক হাঁসগুলো জলে গিয়ে নামে, ঝিরঝির সুপারি গাছের ছায়া উঠোনটাকে দু' ফালি করে ফেলে। থেকে থেকে বারান্দার কোণ থেকে কানে আসে ট্যাঁ ট্যাঁ কান্না, সুধার ভাই হয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় টো টো করে ঘুরে দুপ-দাপ করে ঘরে ফেরে নীলু, চেঁচিয়ে ডাকে, 'মেজদি খেতে দে।'

কোমরে আঁচল-জড়ানো অকালগিন্নী পীতু রান্নাঘর থেকেই সাড়া দেয়, 'একটু দাঁড়া ভাই, এই হয়ে এল।'

বিনু-মিতুরা পুতুল খেলার ফাঁকে ফাঁকে উঠে আসে, বারান্দার ঝাঁপ ঠেলে উঁকি দেয়। মল্লিকা তাড়া দেয় সঙ্গে সঙ্গে—'পালা, পালা বলছি, এখন আসিস না। এ-বেড়া ছুঁতে নেই।' মিতু বুঝি শোনে না, হঠাৎ ঘরে ঢুকে জড়িয়ে ধরে মাকে, কোলে মুখ লুকোয়। শ্রান্ত, দুর্বল মল্লিকা কষে চড় বসিয়ে দেয় মেয়েকে, মাথাটা মাটিতে ফেলে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'বেরো, বোরো এখান থেকে। আচার-বিচার কিছু মানে না। শত্তুর সব শত্তুর।' তারপর নিজেই বাইরে মুখ বাড়িয়ে চিঁচিঁ করে বলে, 'তোর হল পীতু, দে না মা গরম দুটি ভাত আর একটু ঘি।'

ঝাঁপের বাইরে উঁকি দেয় শীর্ণ, রেখাঙ্কিত একটি মুখ। প্রৌঢ়, কিন্তু পোয়াতি; মল্লিকার এখন লোভ আর খিদে দুই-ই বেশি।

নীলুকে যেমন বলেছিল পীতু, মাকেও তেমন বলে—'এই হয়ে এল মা।'

মল্লিকা অপ্রসন্ন মুখ ফের টেনে নেয় ঝাঁপের ভিতরে। একটু পরে ফের বলে, 'তবে মালসা করে একটু আগুন দিয়ে যা দেখি, খোকাকে একটু সেঁক দি।'

আস্তে আস্তে বেলা বাড়ে, নীরদ কখন আসে, কখন চুপি চুপি বেরিয়ে যায়, কেউ টেরও পায় না। ছেলেমেয়েদের চোখে চোখ পড়লে মাথা নিচু করে।

মিতু ফিস ফিস করে বলে, 'বাবার কী হয়েছে রে দিদি?'

সুধা অবোধ স্বরে বলে, 'কী আবার।'

'দেখিসনি, আজকাল বাড়িতে থাকেন না মোটে, কারও সঙ্গে ভাল করে কথা পর্যন্ত বলেন না? কেন দিদি?'

'কী জানি।'

পীতু এসে দাঁড়ায় ঘরের ভিতর। স্থির গলায় বলে, 'আমি জানি। নীলুকে পর করে দেবার বন্দোবস্ত পাকা হয়ে গেছে।'

বিছানায় উঠে বসল সুধা, বালিশটাকে শক্ত মুঠিতে ধরল।— 'কী করে জানলি রে?'

'আমি টের পেয়েছি। তুই এ ক'দিন চোখ বুজে ছিলি দিদি, কিছু দেখিসনি। সব আমার চোখে পড়েছে, কানে গেছে। এতদিন বাবার মত ছিল না, বাচ্চাটা আসবার পর তাঁরও মত বদলেছে। নীলুর পথ এখন পরিষ্কার।

কোথা থেকে ঘুরে ঘুরে ঘরে ঢুকল নীলু, উজ্জ্বল শ্যাম, হাসি-খুশী, হৃষ্টপুষ্ট ছেলে; একমাথা ঘন কোঁকড়ান চুল, চোখের তারা দুটি কোমল-নীল। ছুটে এসেই দু'হাতে জড়িয়ে ধরল পীতুকে; মুখে কথা নেই, একটি পেলব মুখ শুধু দিদির বুকে ডুবিয়ে দিল।

'কী নীলু, কী।'

'কিছু না, মেজদি। তুমি রান্নাঘরে চল।'

কিছুই নয় বটে। এখনও কিছু টের পায়নি নীলু। নইলে স্তব্ধ হয়ে যেত; ওর যখন-তখন আবদার, খিদের দৌরাত্ম্য কিছুটা হয়ত কমত।

নীলুর হাত ধরে পীতু রান্নাঘরে চলে গেল, সুধা অবসন্ন, তবু কঠিন পেশি, বিছানায় বালিশটা আঁকড়ে বসে রইল।

আচ্ছন্ন চোখের সুমুখ থেকে ছেঁড়া-শার্ট, হাফপ্যাণ্ট-পরা নীলুর মূর্তি মিলিয়ে গেল, হাসি-হাসি মুখে যে এসে দাঁড়াল, তার পরনে চমৎকার সিল্কের স্যুট, পায়ে চকচকে জুতো, কোঁকড়ান চুল ঢেকে টুপি। নিলুও কোনদিন বদলাবে, অন্তত বাইরে। হয়ত ভিতরেও। অনেক, অনেক দিন পরে হয়ত কখনও দেখা হয়ে যাবে নীলুর সঙ্গে, তখন কি নীলু চিনতে পারবে কালো-কালো, নিষ্প্রভ, নিরীহ ক'টি মেয়েকে, একদা, হয়ত পূর্বজন্মে, যারা তার বোন ছিল?

সুধার ছেলেবেলাকার একটা কথা মনে পড়ল। মাঝে মাঝে ওকে শখ করে সাজিয়ে দিত মল্লিকা, বলত, 'কী রূপ! তোকে আমি রাজার ঘরে বিয়ে দেব। হ্যাঁরে, তখন আমাদের চিনতে পারবি তো?' সুধা বেণী দুলিয়ে দুলিয়ে মাথা নাড়ত। ওর গলা দুটি কপট কোপে টিপে দিয়ে মল্লিকা বলত, 'বেইমান মেয়ে।'

সুধা তো নয়, নীলুকে মা বিয়ে দেবে রাজার ঘরে। বিয়ে তো নয়, বিক্রি।

ক্ষোভে, উত্তেজনায় সুধা শক্ত করে চেপে ধরল বালিশটা, হায়রে, সে অসহায়, কোন প্রতিকার করবার সাধ্য তার নেই। চোখের মণি ধক্ ধক্ জ্বলছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুধার মনে পড়ে গেছে নূপুরকে,—সেই একটি মেয়ে, পঙ্গু, অক্ষম, বিছানায় শুয়ে শুয়ে যে সমস্ত পৃথিবীকে অভিশাপ দেয়।

নিজের মধ্যে নূপুরের অস্পষ্ট ছায়া দেখে সুধা শিউরে উঠল।

মিতু তখনও পাশে দাঁড়িয়েছিল। অবাক হয়ে একবার চাইছিল সুধার মুখে, কখনও চঞ্চল হয়ে বারান্দা থেকে ঘুরে আসছিল। এক সময় হঠাৎ বলে উঠল, 'দিদি, ছোট ভাইকে দেখবি?'

মিতুর পীড়াপীড়িতে সুধাকে উঠতে হল। বারান্দায় এসে ঝাঁপের বাইরে থেকে ডাকল, 'মা।'

মল্লিকার বুঝি একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। বলল, 'কিরে সুধা? আয়।'

সন্তর্পণে সুধা দরজা খুলল। ভিতরটা স্বল্পালোক, সব ভাল চোখে পড়ে না, এক কোণে মালসায় কিছুটা কাঠকয়লা পুড়ে পুড়ে ফুরিয়ে এসেছে, দু-একটা অঙ্গার খণ্ডে এখনও ধিকিধিকি আগুনের অবশেষ,—পাশে একটা কাজললতা; আর এক কোণে বিছানা কাঁথার উপর মল্লিকা, ছেঁড়া একটা ন্যাকড়া কোন রকমে গায়ে জড়ান, শিথিল, শান্ত, অবসন্ন। আর তার বুকের কাছটিতেই ছোট ছোট হাত-পা নেড়ে খোকা খেলছে। রক্তপদ্মনিভ পায়ের পাতা, কাজলটানা বড় বড় দুটি চোখের পাতা, নিষ্পাপ, নতুন একটি মুখ। পরনির্ভর, আশ্বস্ত, সুখসুপ্ত।

ক্ষীণ, ঈষৎ লজ্জিত হেসে মল্লিকা বলল, 'ভারি সুন্দর হয়েছে দেখতে, নারে? ঠিক রাজপুত্তুরের মত।'

হঠাৎ কী হল সুধার, থরথর কেঁপে উঠল শরীর, চোখ দুটি দিয়ে ঝুরঝুরি ঝরতে থাকল, ভুলে গেল ও এখনও দুর্বল, সবে অসুখ থেকে উঠেছে; ভুলে গেল ওর মাও অশক্ত; কর্কশ, হিংস্র গলায় চীৎকার করে বলল, 'তোমার পায়ে পড়ি মা, ওকে আর রাজপুত্তুর কর না। আমাকে রাজরাণী করতে চেয়েছিলে, নীলুকেও শুনছি রাজপুত্র করবে, অন্তত এ ক আমাদের ভাই হয়ে থাকতে দাও, বাড়তে দাও।'

মল্লিকার মুখ পাণ্ডুর হয়ে গেল, মাথা নিচু করে সে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'তুই তবে সব জানিস?'

সুধা জবাব দিল না।

মল্লিকা ওর অশৌচের কথা ভুলে গেল, মাটি ঘেঁষে ঘেঁষে মেয়ের কাছে এল, সুধাকে টেনে নিল কোলের মধ্যে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকল।

উচ্ছ্বসিত, অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে সুধা বলে উঠল, 'কেন তুমি রাজী হলে মা, কেন নীলুকে পর করে দেবার কথায় মত দিলে।'

'তুই বুঝবি না।' একটি একটি করে সুধার চুলের জট ছাড়িয়ে দিতে দিতে মল্লিকা বলল, 'তুই বুঝবি না। সব কথা তুই তো জানিস না।

'জানি,' রোদনার্দ্র মুখ তুলে সুধা বলল, 'জানি। আমরা গরীব। কিন্তু আর কি কোন উপায় ছিল না?'

মল্লিকা নতমুখে, অপরাধী গলায় বলল, 'না।'

আবার জলে উঠল সুধার চোখ, দাঁতে ঠোঁট চেপে বলে উঠল, 'মিছে কথা। বাবা পালা লেখেন, তাই থেকেও কি দুমুঠো ভাত জুটত না।'

অনেক দুঃখেও মল্লিকা হেসে ফেলল।—'তুই ছেলেমানুষ সুধা, ক'দিনই বা ওকে দেখছিস। আমার এই নিয়ে—'মল্লিকাকে গুণতে হল না, অনায়াসে বলে দিল, 'আঠার বছর হয়ে গেল। পালা-টালা দিয়ে কি আজকাল পয়সা হয়। ওসবের আদর নেই।'

'আছে। চৌধুরী মশাই তো বাবার লেখা খুব পছন্দ করেন।'

মল্লিকা ধীরে ধীরে বলল, 'সব বাজে কথা, সুধা, সব বাজে। আমরা যখন শুকিয়ে মরেছি, চৌধুরী দেখতেও আসেনি। গত বছর-দুই থেকে তোর বাবার সঙ্গে ভাব জমিয়েছে, সে শুধু নীলুর লোভে।'

'কেন মা, ছেলে তো আরও কত আছে।'

'আছে।' অতি গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মল্লিকা। বলল, 'কিন্তু সবাই তো পেটের দায়ে ছেলে পরের হাতে সঁপে দেয় না, সুধা। পালা-টালা সব বাজে। তোর বাবা ওর কথাতে নাচে, কিন্তু আমি টের পেয়েছি অনেক আগেই।'

'চৌধুরী মশায়ের নিজেরও তো ছেলেপুলে হতে পারে, মা? তখন নীলুর কী হবে।'

মল্লিকা বলল, 'পারে না। তোকে সব কথা বলা যায় না, চৌধুরীর কোন-দিন ছেলেপুলে হবে না। পর পর তিনটে বিয়ে করেছিল, একটা বৌ মরে গেছে, একটা কাউকে কিছু না বলে কোথায় চলে গেছে, আরেকটা—

রুদ্ধশ্বাস সুধা জিজ্ঞাসা করল, 'আরেকটা কী মা? সে-ও মরে গেছে?'

'না, এখনও বেঁচে। শুনেছি তার মাথার ছিট আছে। চৌধুরীদের ছোটগিন্নীকে মনে নেই তোর? সেই যে কথায় কথায় হাসত, কাঁদত, ছেলেমেয়ে দেখলেই কোলে নিয়ে বুকে চেপে চুমু খেত?'

রান্নাঘরের দাওয়ায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে নীলু, পা ছুঁড়ে কাঁদছে। সুধা

পীতুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওর কী হয়েছে রে?' পীতু বলল, 'রাগ হয়েছে ছেলের। সব কটা ভাজা ওকে কেন দিইনি, তাই।'

সুধা ফের ফিরে এল বিছানায়। একটু পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে পড়েছে, পা দুটো কাঁপছে ঠক ঠক, চোখের পাতা দুটি বুজে এসেছে। সেই তন্দ্রালস চেতনা দিয়েই শুনতে পেল রান্নাঘরের বারান্দা থেকে একটানা একঘেয়ে একটা গোঙানির সুর ভেসে আসছে।

নীলু কাঁদছে। বহুদিন আগে শোনা একটা বেরালের কান্না মনে পড়ল সুধার। বাবা চটের থলি করে তাকে পার করে দিয়ে এসেছিলেন। বন্ধ থলির ভিতর থেকে এমনি একটা আর্ত-গোঙানি শোনা গিয়েছিল। বেরালটা দূর হয়ে যায়নি তবু। অনেক রাত্রে পথ চিনে চিনে ফিরে এসেছিল। তখন দরজা বন্ধ, ভিতরে আসতে পায়নি, সারারাত ধরে চৌকাঠের পাশে, ঘরের আনাচে কানাচে বেরালটা কেঁদে কেঁদে ফিরেছে, ঘরে ঢোকার পথ খুঁজেছে। বাবা ওটাকে আবার পার করে দিয়ে এসেছিলেন। এবারেও বেরালটা ফিরে এসেছিল, কিন্তু ঘরে আর ঢুকতে চায়নি, বাড়ির চারপাশে ঘুরত, লুকিয়ে থাকত পথের ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে, থেকে থেকে তার গোঙানি শোনা যেত, সামনা সামনি পড়ে গেলে করুণ চোখে তাকাত। হয়ত সেসব কিছুই না, সবটাই সুধার কল্পনা। তবু আজ আরোগ্য শয্যায় শায়িত সুধার নিস্তেজ, মগ্ন-চৈতন্যে দুটি গোঙানি এক হয়ে মিশে গেল। স্বপ্নের মত মনে হল, নীলু চৌধুরী বাড়ি থেকে চুপি চুপি পালিয়ে এসেছে, কেঁদে কেঁদে প্রদক্ষিণ করছে ওদের ঘর, মিনতি করে বলছে, দরজা খুলে দে দিদি। আমি আবার তোদের ভাই হব।

আবার ভাই হব? ঘামে জামা ভিজে গেছে, ধড়মড় করে উঠল সুধা—তবে কি নীলু এরই মধ্যে পর হয়ে গেছে? কান পেতে রইল, যদি সেই গোঙানিটুকু শোনা যায়।

এখন বেলা শেষ, সব কেমন শ্রান্ত, বিষণ্ণ, স্তব্ধ। পেয়ারা গাছটার পাতা থেকে হাসিটুকু মুছে গেছে, ডালে ডালে শিরশিরে হাওয়া, এলুমিনিয়মের

চাকনার মত নিস্তেজ নীরৌদ্র আকাশটায় ঘরমুখী পাখির সারি ; চৈ-চৈ-চৈ—পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে মণ্ডলবাড়ির ছোট ছেলে হাঁসগুলোকে ফিরিয়ে আনতে একটানা ডেকে যাচ্ছে।

অস্থির হয়ে উঠল সুধা, এ-পাশ ও-পাশ করল। কিছু ভাল লাগে না তার, এই নিরানন্দ, ম্রিয়মাণ, রুদ্ধশ্বাস সন্ধ্যা, ঝোপের আড়াল থেকে ঝিঁঝিঁর ডাক যেন বিরাট পাথর হয়ে বুকে বসেছে। এখানে নয়, এখানে নয়। এখানে অভাবের সংসারে শুধু পালে পালে ছেলেমেয়ে আসে, পর হয়ে যাবার ভয়ে একটি অভিমানী শিশু থেকে থেকে কেঁদে ওঠে, তৃতীয় পক্ষের নিষ্ফলা একটি জমিদার-বধূ পরের ছেলেমেয়ে বুকে পিষে মেরে ফেলতে চায়। এখানে সুধার স্থান নয়। দেহ বাঁধা, কিন্তু মনের তো লাগাম নেই, অনায়াসে উড়ে যেতে পারে, অন্য কোনখানে, যেখানে শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনিল প্রাণের আবর্ত।

ছোটরাণী সুধাকে দেখেই হেসে উঠলেন।

নীরদ কী ভেবে সুধাকে বড়বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। দেউড়ি, দীর্ঘ বারান্দা, খিলান। নীরদ গেল বৈঠকখানায়, কর্তা বাড়ির ঝিকে বললেন সুধাকে অন্দর-মহলে পৌঁছে দিতে।

ছোটরাণী পালঙ্কে বসেছিলেন। কৃশ, রুগ্ন, ছোট্ট মানুষটি, ধবধবে মুখ, ঢলঢলে দুটি চোখ। সুধাকে দেখেই সেই চোখ দুটি খুশীতে নেচে উঠল, ছোটরাণী খিল খিল হেসে উঠল।

ঝি ছোটরাণীর কানে কানে কী বলল, অমনি ছোটরাণী ছোট ছোট পা দুটি দুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'আয় এদিকে আয়। প্রণাম করবিনে আমাকে?'

দুরু দুরু বুক, সুধা দু-পা এদিকে গেল, কিন্তু প্রণাম করতে হাত সরল না। এ কী বিষম পরীক্ষায় বাবা আজ তাকে ফেলেছেন।

'আয়?' ছোটরাণী চেঁচিয়ে ডাকলেন। '—এ কেমনধারা মেয়ে গো, মানীর মান রাখে না।'

সুধা তবু আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ছোটরাণী নিজেই এবার উঠলেন পালঙ্ক ছেড়ে। আঁচল লুটিয়ে পড়েছিল, গুছিয়ে গায়ে জড়ালেন। কী ভেবে একটু ঘোমটা তুলে দিলেন মাথায়।

—'জমিদারগিন্নীকে প্রণাম করতে এসেছিস, নজরানা আনিস নি?' বলতে বলতে নিজেই ছোটরাণী ফিক করে হেসে ফেললেন। —'তোদের আবার নজরানা কী। তোরাই তো কত টাকা পাবি আমাদের কাছে। হ্যাঁরে, ছেলে তো দিবি, তোর বাবা কত নিচ্ছে রে? প্রণাম করলিনে তবু?'

বাবা বলে দিয়েছিলেন, ছোটরাণীকে খুশী করে আসতে। সুধা পায়ের ধুলো নিতে মাথা নিচু করল। ছোটরাণী ওকে হাত ধরে তুলে নিলেন। কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, 'তোর বাবাকে বলবি, যত পারে যেন শুষে নেয়! এর পরে আর পাবে না। চৌধুরীদের শাঁস ফুরিয়ে এসেছে। কত টাকা নিচ্ছে তোর বাবা?'

ঘাড় নেড়ে সুধা জানালে, সে জানে না।

হাতের পাঁচটা আঙুল ওর চোখের সমুখে ধরে ছোটরাণী বললেন, 'পাঁচ হাজার নিতে বলবি। ভাবছিস দেবে না? দেবে, দেবে। টাকা দিয়ে ছেলেমেয়ে কেনার অভ্যাস চৌধুরীদের আছে। ছেলে কেনে, বংশলোপ ঠেকাতে। মেয়ে কেনে—না, যা ভাবছিস, তা নয়, শুধু ফুর্তির জন্যে নয়, সেও বংশরক্ষার্থে। কিন্তু'—হাতের বুড়ো আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছোটরাণী বললেন, 'ফক্কা, ফক্কা। ওদের সব হিসেবই বেঠিক হয়ে যায়।'

নিজে পালঙ্কে বসলেন ছোটরাণী, সুধাকেও পাশে বসালেন। অতি অন্তরঙ্গ, কিন্তু চাপা গলায় বললেন, 'আমাকেও তো ওরা কিনেছিল। আমার বাবাকে গুণে গুণে দিয়েছিল নগদ সাতটি হাজার টাকা। নইলে জেনে শুনে রোগগ্রস্ত তেজবর পাত্রের হাতে এমন ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে কেউ দেয়?'

আবার কৌতুকে নেচে উঠল ছোটরাণীর চোখ, সুধার দিকে চেয়ে বললেন, 'তোকে দেখে কেন হেসে উঠেছিলুম জানিস্? আমাকে যখন এরা কিনে আনে, আমি দেখতে ঠিক তোর মত ছিলুম। চমকে উঠে ভাবলুম, হঠাৎ আমার বয়স কমে গেল নাকি। নিজের ছায়া দেখছি না তো! চোখ রগড়ে বুঝলুম, ছায়া

নয়, আমি নই, অন্য এক জন। হেসে উঠলুম তখন। ভাবলুম বংশরক্ষার্থে কর্তা বুঝি চতুর্থপক্ষে তোকে বিয়ে করবেন বলে এনেছেন। ঝি আমার ভুল ভাঙিয়ে দিলে। তা' সতীনই বা মন্দ ছিল কী। হ্যাঁ রে, আমার সতীন হবি ?'

সুধাকে ছোটরাণী বুকে জড়িয়ে ধরলেন, একটু একটু করে বাহুপাশ কঠিন হতে থাকল। উৎসুক কণ্ঠে ছোটরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে, তোর ভাই দেখতে কেমন রে ? সুন্দর ? তোর মত ?'

সুধার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছিল, কোনক্রমে বলল, 'আমার চেয়েও।'

'সত্যি ?' খুশীতে সুধাকে ছেড়ে দিয়ে ছোটরাণী হাততালি দিয়ে উঠলেন, 'দিয়ে দিবি আমাদের একেবারে ?'

'দেব।' ভীত, নিষ্প্রভ মুখে সুধা বলল।

'আমার ছেলে হবে সে ? মা বলে ডাকবে ?' সুধা কোন জবাব দেবার আগেই ছোটরাণী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন,—'চাইনে, চাইনে আমি পরের ছেলের মুখে মা-ডাক শুনতে। দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে। তুই বুঝবি না। ছেলে-পুলে হলে বুঝবি।'

একটু দম নিলেন ছোটরাণী, বললেন, 'আর তোর মা-ই বা কেমন। টাকা পেয়ে ছেলে বেচে দিতে রাজী হয় ? এসব কাজ শুনেছি, খারাপ মেয়ে-মানুষেরা করে। তোর মা কি বেশ্যার চেয়েও—'

কথাটাকে সম্পূর্ণ না করেই ছোটরাণী মোড় ফিরিয়ে নিলেন। —'আমাদের কর্তার বুদ্ধিকেও বলিহারি যাই। ছেলে কোলে পাইনি, উনি বিয়ের পর থেকে আমাকে তাই শুধু বড় বড় পুতুল কিনে দিয়েছেন। প্রথম প্রথম ওগুলো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতুম, এখন আর করিনে। সব এই আলমারিতে ঠেসে রেখেছি। আচ্ছা, তুই-ই বল, রক্ত-মাংসের ছেলের সাধ কি পুতুলে মেটে।'

সুধা শিউরে উঠল। আরও একজন একবার কথাটা ওকে শুনিয়েছিল। নূপুর। অসীম বিতৃষ্ণায় ছুঁড়ে ফেলেছিল পুতুল। রক্ত-মাংসের মানুষের কামনা তারও।

সুধা সরে বসতে গেল, ছোটরাণী দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন ওকে। বিস্রস্ত আঁচল, বিহ্বল দুটি ঘোলাটে চোখ ওর চোখের ঠিক উপরে রেখে কঠিন গলায় হেসে উঠলেন। পরমুহূর্তেই ঠেলে দিলেন সুধাকে। 'চাইনে, চাইনে আমি, তোর ভাইকে।'

সুধা টলে পড়ছিল, কোনমতে নিজেকে সামলে নিল।

ফেরবার পথে নীরদ জিজ্ঞাসা করল, 'কথা হোল ছোটরাণীমার সঙ্গে?'

সুধা সংক্ষেপে বলল, 'হ'ল।'

নীরদ বলল, 'আমারও আজ পাকা কথা হল ওদের সঙ্গে। জানিস, আমার বইটা ছাপা হবে। কর্তার যে বন্ধুটি এসেছেন কলকাতা থেকে, তাঁর হাতে খাতাটা দিয়ে এসেছি। তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।'

নিরাসক্ত গলায় সুধা বলল, 'ভালই হল, বাবা।'

নীরদ দীপ্ত চোখে বলল, 'ভাল না? আমার বই ছাপা হবে, কত যশ, টাকা হবে, দেখিস। আমাদের আর কোন দুঃখ থাকবে না রে।'

দুদিন পরেই শশাঙ্ক এল।

প্রণাম করল সকলে একে একে। সুধা জিজ্ঞাসা করল, 'ভাল আছ তো, ছোট মামা?'

'ভাল। কিন্তু তুই একী হয়ে গেছিস।'

'অসুখ হয়েছিল। ফুলমাসি ভাল আছে?'

'সে তো মেতেছে ইলেকশন নিয়ে। ওইখানেই তো মুশকিল। কী হয়েছে জানিস, আদিত্য মজুমদারের সঙ্গে যে লড়ছে, তার নাম হল প্রভাত মল্লিক, আমাদের কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর। যদি ঘুণাক্ষরেও টের পায় আমার বোন ওর প্রতিদ্বন্দ্বীর হয়ে কাজ করছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার জবাব হয়ে যাবে।'

নীরদের সঙ্গে দেখা হতেই শশাঙ্ক বলল, 'সুধাকে এবার নিয়ে যেতে চাই, জামাইবাবু। এখানে তো ওর আর কোন কাজ নেই—'

বিমূঢ় চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল নীরদ, ধীরে ধীরে বলল, 'বেশ তো নিয়ে যাও। ওকে এখানে রাখতে পারব না; আমি জানতাম।'

তারপর আবার সেই সুড়ঙ্গ স্টেশন, শেয়ালদা; খাঁচা-শহর, কলকাতা। শশাঙ্কর হাত ধরে সুধা নামল প্লাটফর্মে, রিক্সায় উঠল। তখন ঘোর সন্ধ্যা, বিজলী-দ্যুতিতে ইন্দ্র শহরটার সহস্র চক্ষু প্রকট, ঘর্ঘর-রব-কর্কশ পথ, প্রবল একটি নিরবধি প্রবাহ। ঠুনঠুন ঢিমেতেতলা গতি, সুধা রিক্সায় গা এলিয়ে দিয়েছে, ক্লান্ত, আচ্ছন্ন, তবু সম্মোহিত।

১৯

কলরব শুনে ভোর বেলাতেই আদিত্যের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করলেন, বালিশের পাশে রাখা হাতঘড়িতে সময় দেখলেন। একবার ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন আদিত্য, কী যেন ভাবলেন।

কলরব ক্রমেই বাড়ছে। গোটা একতলাটাই আদিত্য ভলান্টিয়রদের ছেড়ে দিয়েছেন। ওদের কেউ কেউ এখানেই রাত্রে শোয়, খায় সকলেই এখানে। ভিজিটর্স রুমটা এখন কমন-কিচেন, বড় হলটায় খাওয়া দাওয়ার ঢালা বন্দোবস্ত। আলাদা ঠাকুর, চাকর ইত্যাদি। আয়োজনের ত্রুটি নেই। রাত পোহাতে না পোহাতেই সব একে একে জোটে। উনুনে চা চড়ে, অজস্র সিগারেট পোড়ে, সুর-অসুর সঙ্গীত আর তাথৈ নৃত্য চলে। আদিত্য প্রথম দু'দিন বিরক্তি বোধ করেছিলেন, এখন আর করেন না। মনে মনে এদের সলাঙ্গুল প্রাক্‌-মানবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এদের সহায়তা নিতে হচ্ছে, তাতে লজ্জার কিছু নেই। কেননা স্বয়ং রামচন্দ্রকেও এদের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল।

ঝনঝন শব্দ করে কয়েকটা কাপডিশ ভাঙল নিচের তলায়, আদিত্য চমকে উঠলেন। এদের হাতে কোন কিছু আস্ত থাকলে হয়। হয়ত চায়ে ঠিকমত চিনি হয়নি, কিম্বা দুধের পরিমাণ হয়নি যথোচিত, অমনি পেয়ালা ছুঁড়ে ফেলেছে মেজেয়। মাঝে মাঝে নিচের ঘরে উঁকি দিয়ে আদিত্য দেখেছেন, তাঁর এমন যত্ন করে পালিশ করা ফ্লোর এখানে ওখানে চোট খেয়েছে, ডিস্টেম্পার করা দেওয়ালের ফিকে নীল পানের পিচ লেগে লেগে সবুজ হল।

এত করেও মন পান না। পান থেকে চুণ খসলেই সব তচনচ। টিন টিন দামী সিগারেট আসে, বিলাতী দ্রব্য, কিন্তু উপায় কী। প্রথমে তো

বিড়ির বন্দোবস্তই করতে চেয়েছিলেন। ওরা রাজী হয়নি। হেড ভলান্টিয়ার মাথা চুলকে বলেছিল, 'থাকি না স্যার, একেবারে টুইল করে দিন।'

'টুইল ?' পরিভাষাটা আদিত্যের কাছে সহজবোধ্য হয়নি।

'সিগারেট, স্যার। বিড়ি তো ওরা বাপের পকেট মেরে দু'চার পয়সা যা পায় তাই দিয়েই জোটায়, বিড়িই যদি খাবে তবে আপনার কাছে আসবে কেন, ইলেকশনে খাটবে কেন।'

বটেই তো, কেন। আদর্শ ? দেশের কাজ ? আদিত্য সে-চেষ্টাও করে দেখেছেন। এ-যুগের ছেলেদের ধারাটাই কেমন যেন। বড় বড় কথায় এদের মনের চিড়ে ভেজে না।

শুধু খাওয়া-দাওয়াই নয়, আদিত্যকে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে ইলেকশনটা তরে যেতে পারলে এদের তিনি কাজ জুটিয়ে দেবেন। এত ছেলে বসে আছে, এতে দেশেরই ক্ষতি। যুবশক্তির এই বিরাট অপচয় তিনি যথাসাধ্য রোধ করবেন।

চাকরি তো দেবেন, কিন্তু কী চাকরি। রাস্তার আলো জ্বালান-নেবানর কাজটা সহজ বটে, কিন্তু সে-সব এরা চায় না। আদিত্য প্রস্তাব করে দেখেছিলেন। সর্দার ভলান্টিয়ার মাথা চুলকে বলেছিল, 'স্যার, যদি কিছু মনে না করেন তো বলি।'

'বল।'

'ও সব ছোট কাজ। উড়েরা করে। আমাদের পোষায় না। আজ আমাদের এই রকম অবস্থা দেখছেন স্যার, কিন্তু বরাবর এ-রকম ছিল না। আমরা ভদ্দরলোকের ছেলে, চান তো সার্টিফিকেট দেখাতে পারি।'

আর একজন বললে, 'ওয়ারের সময় এয়ার্পির কাজ করেছি, এখনও একটা মই পেলে গাছের আগায় তর তর করে উঠে যেতে পারি। (আদিত্য মনে মনে বললেন, তা তুমি পার)। লড়াইটা আর কিস্‌দিন চললে অপিশার হয়ে যেতুম, আমাদের বলছেন উড়ে-মেড়োর কাজ নিতে। বড্ড দাগা দিলেন, স্যার।'

আদিত্য ক্ষীণকণ্ঠে বলতে চেষ্টা করেছিলেন, 'দেশের কাজ—'

একটি ছেলে, সে কিন্তু ঠোঁট-কাটা, বললে, 'দেশের কাজ বলে কি রোয়াব নিচ্চেন, দেশের কাজ আমরা করিনি? ক'খানা মিলিটারী ট্রাক পুড়িয়েছি, তার হিসেব দেখে আসুন গিয়ে। বলেন তো, এখনও প্রভাত মল্লিকের মোটর গাড়িগুলো বেবাক ঢিল মেরে গুঁড়িয়ে দিই। প্রভাত মল্লিকের সব ট্রাক আসে শিউনন্দন ট্রান্সপোর্ট থেকে, ওদের গারাজে আগুন ধরিয়ে দিতে পারি।'

আদিত্য ত্রস্ত হয়ে বলেছিলেন, 'সেসব কিছু করতে হবে না। এটা ডেমো—গণতন্ত্রের যুগ। আমরা ন্যায়ের পথে এগোব। তোমাদের কাজ শুধু সুস্থ জনমত তৈরি করা।'

চাঁই ভলান্টিয়ার মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, 'ঠিক তৈরি হয়ে যাবে স্যার, একেবারে দর্জির দোকানে ফরমাসমাফিক। কিচ্ছু ভাববেন না।'

নিচের তলায় হল্লা কমেছে। ওদের প্রাতরাশ শেষ হল বোধ হয়। আদিত্য বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। এতক্ষণে সকাল হল। আলোর সোনায় পূব আকাশের মেঘের ঝুলি ভরে গেছে, সূর্য উঠেছে; তপন, তাপন, শুচি, তমিস্রহা। নমস্কার করে আদিত্য নিচে পথের দিকে তাকালেন।

সারি-সারি ট্রাক দাঁড়িয়ে। ভলান্টিয়ারেরা টপাটপ লাফিয়ে উঠছে, দু'একটা ইঞ্জিন স্টার্টও দিল।

সর্দার ভলান্টিয়ার বললে, 'থি চীয়র্স ফর—'

'আদিত্য মজুমদার।'

কী মনে হল আদিত্যর, ওদের একজনকে ডাকলেন, 'এই শোন।'

ছেলেটি কাছাকাছি আসতে বললেন, 'থ্রী চীয়ার্স ব'ল না। ইংরাজী ভাষা, ভাল শোনায় না।'

'তবে কী বলব স্যার। জিন্দাবাদ?'

আদিত্য ভেবে দেখলেন। তাও না। জিন্দাবাদে কেমন—কেমন যেন রুশ-রুশ গন্ধ। তবে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন সনাতন জয়ধ্বনিই ভাল।

একজন বললে, 'আদিত্য মজুমদার কি—'

সমস্বরে প্রতিধ্বনি উঠল 'জয়'।

একের পিছে আর একটি ট্রাক অদৃশ্য হল।

প্রথম যৌবনে আদিত্য আদর্শবাদী ছিলেন। এক ডাকে কলেজ ছেড়েছিলেন। সেটা বিলাতী দ্রব্য-যজ্ঞ, মাদক-বর্জনের যুগ। হাজার হাজার ছেলের সঙ্গে আইন ভাঙলেন, জেলে গেলেন। কিন্তু তখনও কেউ তাঁকে চেনে না। তিনি তখন অজ্ঞাত কর্মীমাত্র।

বেরিয়ে এসে চমক পেলেন। গরাদের ভিতর দিয়ে এক ফালি নীল আকাশ দেখে বিষণ্ণ হয়ে যেতেন, জানতেন না, তাঁর জন্যে এত ফুলের মালা ফটকের বাইরে জমা আছে। পাড়ার যুব সঙ্ঘের সেক্রেটারী হলেন, লাইব্রেরীর ভার পেলেন, হাতে-লেখা পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকের তালিকায় নাম উঠল। আদিত্য ভাবলেন এ-তো মন্দ নয়। ছোট খাট হিতব্রত নিয়ে ভুলে রইলেন, নেশার মত ক'টা দিন কেটে গেল। ভাল চাকরির সন্ধানও দু' চারটে এসেছিল, হাত বাড়ালেই পাওয়া যেত; দেশসেবকের সেবা করে কৃতার্থ হবার লোকের সেদিন অভাব ছিল না। আদিত্য সে-সব প্রত্যাখ্যান করলেন। কেন না, সংগ্রাম তখনও শেষ হয়নি, আবার কবে আহ্বান আসে ঠিক কী। আরও ধস্ত-ধস্ত পড়ে গেল, সর্বত্যাগী খেতাব জুটল তখন। আবার জেলে গেলেন, আবার ফিরলেন।

কিন্তু স্বপ্নভঙ্গ হতেও বিলম্ব ঘটল না। দ্বিতীয়বার ফিরে এসে দেখলেন, সহকর্মীদের অনেকেই হৃতস্বাস্থ্য, বিশ্বাসহীন, দুর্বল। সব চেয়ে বিশ্বাস করেছেন যাদের, তাদের দু' চারজন সরকারী স্পাই পর্যন্ত হয়েছে। সুবিধাবাদী কয়েকজন লাইসেন্স সংগ্রহ করে নানা ব্যবসা ফেঁদেছে।

মনে মনে আদিত্য বিচার করেছেন, এর কারণ কী। সিদ্ধান্ত করেছেন কোথাও ফাঁকি আছে। লক্ষ্যে না থাক, পন্থায়। দেশসেবা মানে অনেকের কাছেই জেলে যাওয়া-আসার শাটল সার্ভিসের সওয়ারী হওয়া মাত্র। এ-উপায়ে ইষ্ট সিদ্ধি হবে না।

আদিত্য বিশ্বাস খোয়ালেন।

এক বিশ্বাস গেল, অন্য বিশ্বাস খুঁজে পেলেন না, আদর্শের বদলে ফিরে পেলেন না আদর্শ। লুকোচুরিরও তখন থেকে শুরু। লোকের সঙ্গে, নিজের সঙ্গে। চরকায় নিষ্ঠা নেই, অথচ খদ্দর ছাড়লেন না। টেররিস্টদের সঙ্গে সংযোগ হল ; দু'দিনেই টের পেলেন তাদের আর তাঁর মত ও পথ এক নয়। তবু ওদের গোপনে অর্থ যুগিয়ে যেতে লাগলেন। কিছুদিন পরে সে-দলেও ভাঙন লাগল, দলের কর্মীদের অনেকেই একে একে নানা বামপন্থী দলে ভিড়ে যেতে লাগলেন ; আদিত্যর মন তাতেও সায় দিল না, থমকে দাঁড়ালেন।

ততদিনে আদিত্যের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বেড়েছে, নানা উপায়ে আয় বেড়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে এমন দু'চারটে ঘটনা ঘটেছে নীতিবাগীশদের ভাষায় যাকে বলে স্খলন। কিন্তু শান্তি পাননি। বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিও মন থেকে মুছে গেছে। তাঁর চেয়ে, কখনও মনে হয়েছে, ষাট বছরের ঠাকুমা-দিদিমাও সুখী, যাদের দেবদ্বিজে অচলা ভক্তি। সাকার পূজাকে আদিত্য মনে করেন কুসংস্কার, নিরাকার উপাসনাকে বুজরুকী, আবার ঈশ্বরকে একেবারে উড়িয়ে দেবার মত মনের জোরও নেই। ভক্তিরসে ডুবু ডুবু দেশ, ঈশ্বরকে অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখালে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার শিকড়ে টান পড়বে।

রাজনৈতিক জীবনেও তখন শূন্যবাদ চলছে। আইন-অমান্য আন্দোলন শান্ত, বিপ্লবীরা ক্লান্ত, তা-ছাড়া ওদের সঙ্গে তো কবেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আদিত্য এবার হিন্দু সংগঠন নিয়ে মাতলেন। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত একটি সমাজকে একসূত্রে বেঁধে দেবেন—হাততালি পেলেন, অনুচরও জুটল। কিন্তু শেষে তাতেও অরুচি হল। সব লীলা সাঙ্গ করে আদিত্য এখন মুক্ত পুরুষ, নির্দলীয় জননেতা। প্রতিষ্ঠাবান, আকৈশোর দেশকর্মী, অথচ কেউ জানে না আদিত্য কী চান, তাঁকে ভয় করে সব দলেই। কোন মত নেই, কোন পথ নেই, আদিত্য নিজের মনের দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে শিউরে ওঠেন, তাঁর মত সর্বস্বান্ত কেউ তো নয়। কিছু নেই, কিছু নেই ; আদিত্যের মনে না, বাইরে না। শান্তি না, স্বপ্ন না। নিখিল বিশ্ব একটা ধূধূ, রিক্ত, রুক্ষ মরুভূমি।

আছে, একটুখানি আছে। জীবনকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করবার তৃষ্ণাটুকু যায়নি; বাঁচবার সাধ, সকলের মধ্যে মিশে নয়, সকলের উপরে মাথা তুলে দাঁড়াবার বাসনা অহর্নিশি শিখা হয়ে জ্বলছে। নিজেকে আদিত্য এখনও ভালবাসেন। এই মোহ, স্বমেহটুকুও গেলে, শান্তি তো গেছেই, স্থৈর্যটুকুও খোয়ালে, আদিত্য কবে পাগল হয়ে যেতেন।

তবু ভাল লাগে না। এতো আদিত্য চাননি। মাঝে মাঝে এই প্রতিষ্ঠার পাহাড়, স্তুতির স্তূপ, ঐশ্বর্য আর সাফল্যপরিকীর্ণ চক্র থেকে বেরিয়ে পড়তে সাধ যায়। সেই সংস্কার-তিমিরান্ধ বাল্য, ভক্তি-পিচ্ছিল কৈশোর আর বিশ্বাস-দীপ্ত প্রথম যৌবনে একবারও যদি ফিরে যেতে পারতেন! তবে হয়ত শান্তির কড়িটি ফিরে পেতেন ঝুলিতে, আদিত্যের কাছে আবার পার্থিব রজ মধুময় হত, নক্ত-উষা মধুতে ভরে উঠত, সিন্ধু মধু ক্ষরণ করত।

বারান্দাটুকু রোদে ভরে গেছে, পথে ভিড়, আকাশে দু'একটি দলছাড়া চিল। অনেক দূর থেকে হল্লা শোনা যাচ্ছে, আদিত্যের জয়ধ্বনি দিচ্ছে লরীবোঝাই ছেলেরা। সামনের বাড়িটার দেয়ালের দিকে এতক্ষণে আদিত্যর চোখ পড়ল। সারি সারি পোস্টার। একটার পিঠে আরেকটা, থিয়েটারের, ক্ষতরোগের মলমের, ইলেকশনের। আদিত্যর পোস্টারও আছে। 'ত্যাগীশ্রেষ্ঠ আদিত্য মজুমদারকে ভোট দিন।' পড়তে গিয়ে আদিত্য হোঁচট খেলেন, ভ্রূ কুঞ্চিত হল। 'ত্যাগী' কথাটার উপর কারা যেন 'ভোগী' এঁটে দিয়ে গেছে।—'ভোগী-শ্রেষ্ঠ আদিত্য মজুমদারকে ভোট দিন।' ক্রুদ্ধ হলেন আদিত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাসিও পেল, লেখাটা বার বার পড়ে আয়নায় নিজেকে ভেংচি কাটার সুখ পেলেন।

প্রভাত মল্লিকের দলের কীর্তি নিশ্চয়ই। আদিত্য স্থির করলেন, ওখানে নতুন পোস্টার লাগাতে হবে। সব পরিশ্রম, অর্থব্যয় পণ্ড হল। প্রভাত মল্লিককে কোনভাবে জব্দ করা যায় কি না, তাও ভেবে দেখতে হবে।

হঠাৎ আদিত্য পিছন ফিরে বললেন, 'এস অতসী।'

অতসী এসেছে, আদিত্য পায়ের শব্দেই টের পেয়েছিলেন। ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'এস অতসী। তোমাকেই ভাবছিলাম। ভালই হল নিজে থেকে এলে। ঘরে চল, কথা আছে।'

ঘরের মাঝখানে ছোট একটি টেবিল, নানাবিধ লেখার আসবাব। পাশে সযত্ন সাজান কাগজপত্র, কোনটা টাইপ করা, কোনটা ছাপান। আদিত্য একটা চেয়ারে বসলেন, অতসীকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন আর একটা।

অতসী বসল না, টেবিল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রইল। তার দিকে অপলক কিন্তু আড়চোখে একনজর দেখে নিয়ে আদিত্য ধীরে ধীরে বললেন, 'উঁহু, এ চলবে না।'

'কী চলবে না?'

'এই পোশাক। রঙিন শাড়ি, চুড়ি—এ সব হল বিলাসের প্রতীক। সর্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসীর হয়ে যারা কাজ করছে, তাদেরও সহজ, রিক্ত, অনাড়ম্বর হতে হবে।'

'বলে দিন, কী ভাবে।'

'সাদা শাড়ি,—খদ্দর হলে ভাল হয়। সাদা ব্লাউজ। তবে হাতের কাছে সামান্য একটু সুচের কাজ থাকলে ক্ষতি নেই। গলায় সরু একগাছি হার চলতেও পারে, একটি হাত ঘড়িতেও দোষ নেই। অর্থাৎ সজ্জা করবে, কিন্তু করেছ যে, সেটুকু কেউ টের পাবে না।'

অতসী হেসে ফেলল। 'তবে এই খোঁপাটাও খুলি আদিত্যবাবু, বাথরুমে সাবান আছে? তা হলে বলুন, ঘসে ঘসে চুলগুলো রুক্ষ করে ফেলি। একেবারে যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে, কী বলেন।'

আদিত্য গম্ভীর হলেন, একটা অদৃশ্য মুখোসে মুখের সব কটি রেখা ঢেকে গেল। কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। ধীরে ধীরে বললেন, 'তুমি বড় চপল হয়েছ অতসী। শিক্ষয়িত্রীকে এতটা মানায় না।'

অতসীও অপ্রতিভ হল, চট করে মুখে কথা সরল না। মাথা নিচু করে হাতের নখ খুঁটতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে আদিত্য বললেন, 'থাক, যে-জন্যে তোমাকে ধরে এনেছি সেটা শোন। তোমাকে একবার 'জনদর্পণ' কাগজের অফিসে যেতে হবে।'

'কাগজের অফিসে, কেন?'

'প্রয়োজন আছে বলেই বলছি। ওদের কাগজে পর পর তিন দিন প্রভাত মল্লিকের দলের স্টেটমেন্ট বেরিয়েছে। তুমি গিয়ে জেনে আসবে এর রহস্যটা কী। জিজ্ঞাসা করবে ওরা আমার পাল্টা বিবৃতিও ছাপবে কি না। ' আর—' এখানে আদিত্য কণ্ঠস্বরটা যেন ঝুপ করে ঢিলের মত করে ইঁদারার ফেলে দিলেন —'আর এডিটর যদি লম্বা-চওড়া কথা, নীতি, আদর্শের বুলি ঝাড়ে তবে ফেরবার পথে ওদের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করবে। শুধু জিজ্ঞাসা করবে ওঁরা গ্যাঞ্জেটিক ডেভেলপমেন্টের বিজ্ঞাপনে ইন্টারেস্টেড কি না। শিগ্‌গিরই এই ট্রাস্ট ক্যাম্পেন শুরু করবে তাও জানিয়ে আসবে—প্রায় পাঁচ লখ টাকার পাবলিসিটি স্কীম। ম্যানেজারে চোখ-মুখের ভাব কেমন হয়, তাও লক্ষ্য করে আসতে ভুল না।'

'এই কাজ?' অতসী জিজ্ঞাসা করলে।

'আরও একটু আছে।' আদিত্য একটু এলাচদানা তুলে দাঁতে কাটলেন।—'আসবার পথে ক্যালকাটা টাইমস কাগজের অফিসে নামবে। সেখানে এই স্টেটমেন্টটা দেবে—এতে প্রভাত মল্লিকের সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত রহস্য আছে।'

'ওরা ছাপবে কেন?'

ঈষৎ হাসি-উদ্ভাসিত প্রত্যয়ের সুরে আদিত্য বললেন, 'ছাপবে, ছাপবে। ছাপবে বলেই তো তোমাকে পাঠান। নইলে এ-কাজের জন্য অন্য কাউকে কি পাঠান যেত না ভেবেছ? যেত, কিন্তু পুরোপুরি ফল হয়ত পাওয়া যেত না। লোকে যে-জন্যে দোকানে সেল্‌স্ গার্ল রাখে, এও তেমনি। এক ধরনের মুখের জয় সর্বত্র, পড়নি?'

অন্ধকার মুখে অতসী বলল, 'আপনি শুধু আমাকে অপমানই করছেন।'

আদিত্য হাসলেন, 'কম্‌প্লিমেন্ট দিলুম, সেটাকে মনে করলে অপমান? তোমাদের আজকালকার মেয়েদের ভাবনার ধারাই বড় বাঁকা। কম্‌প্লিমেন্ট আর অপমানের মধ্যে তফাৎ আসলে এক চুলের অতসী, অনেকটা গ্রহীতার মর্জির

উপর নির্ভর করে। নইলে ভেবে দেখ, আমি কিছু অন্যায় বলিনি। পুরুষ আর নারীর আলাদা অস্ত্র। পুরুষের অস্ত্র বল, মেয়েদের ছল। ক্ষেত্র বুঝে প্রয়োগ করতে হয়। তোমাকে দিয়ে এ-কাজ সহজে সিদ্ধ হবে, বল প্রয়োগের ক্ষেত্র এটা নয়। এই সহজ কথাটায় রাগ করছ কেন?'

মন্ত্রনত্রবৎ গলায় অতসী বলল, 'কিন্তু এ যে বড় নোংরা কাজ।'

'নোংরা বৈ কি। কিন্তু নোংরা দেখে ভয় পেলে পৃথিবীর অনেক সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া যেত না। তুমি বলবে পদ্ধতিটাও নোংরা। উপায় কী। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার প্রবাদ শোননি? এও তাই।'

দীর্ঘ একটা যতি দিলেন আদিত্য, টেবিলটায় আঙুল দিয়ে একটা টকটক গৎ বাজালেন। তারপর গভীর একটা শ্বাস ফেলে বললেন, 'আমারই কি এসব ভাল লাগে অতসী; জানি তৃষ্ণা থেকে তৃষ্ণা, কামনা থেকে কামনা, এ-সিঁড়ির শেষ নেই। সব ছেড়ে, ঝেড়ে ফেলে যদি শান্ত, ছোট, নিঢেউ পুকুরের জীবনে ফিরে যেতে পারতুম। কিন্তু আর হয় না। পাশার দান পড়লে আর ফেরান যায় না। জানি, একবার যখন এ-পথে নেমেছি, তখন আর নীতির সঙ্গে সন্ধি করা মিছে।' দু' হাতে মুখ ঢাকলেন আদিত্য, গাঢ়কণ্ঠে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন, 'পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে।' সেই গভীর স্বর করতলে প্রতিহত হয়ে বিচিত্র-গম্ভীর প্রতিধ্বনি তুলল। শিউরে উঠল অতসী, দু' পা সরে দাঁড়াল। ততক্ষণে মুখ থেকে হাত সরিয়ে ফেলেছেন আদিত্য, অতসী তাঁকে ভগ্নকণ্ঠে বলতে শুনল,'আমরা সব এক একটি পলিটিক্যাল ধৃতরাষ্ট্র অতসী, অন্ধ, একচক্ষু হরিণও নই।'

তারপর কয়েকটি স্তব্ধ, বিহ্বল মুহূর্ত। নীরেখ মুখোস খসে পড়েছে, সেই অবসরে অতসী দেখে নিয়েছে অন্য এক আদিত্যকে; অতৃপ্ত, অসুখী, পাপ-বোধদুষ্ট, ক্লিষ্ট-কুণ্ঠিত একটি মানুষ, করুণা প্রত্যাশী।

কিন্তু কয়েক পলক মাত্র। দেখতে দেখতে আদিত্য সম্বিৎ ফিরে পেলেন, তাড়াতাড়ি যেন এঁটে নিলেন মুখোসটা, নদীর স্রোতে নিমেষের জন্য মুখ তুলেই একটা শুশুক যেন আবার তলিয়ে গেল।

অবিচলিত আদেশের ভঙ্গিতে আদিত্য বললেন, 'তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে অতসী। নিচে গাড়ি অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে। এবার যাও।'

হঠাৎ অভিনেতা পার্ট ভুলে গিয়েছিল। মুখস্থ বুলি আদিত্যের আবার মনে পড়েছে।

খবরের কাগজের অফিস সম্বন্ধে অতসীর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। ভেবেছিল না জানি কতক্ষণ বসে থেকে এডিটারের দর্শন পাওয়া যাবে। কিন্তু দামী, ভারী গাড়ি দেখেই দরোয়ান উঠে সেলাম করল, অতসী অস্ফুটস্বরে সম্পাদকের নাম বলতে একেবারে কামরার দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে গেল।

সেখানেও কেউ ঠেকালে না, অতসী কাটা দরজা ঠেলে একেবারে এডিটরের মুখোমুখি পড়ে গেল।

সম্পাদকের নাম জীবনতোষ সরকার, পঞ্চাশোর্ধ্ব, বয়সের তুলনায় চুল বেশি পেকেছে; একদা ঢেউখেলান বাবরিটাইপ চুল ছিল, এখন প্রশস্ত মসৃণ একটি টাক সিঁথিপ্রান্ত থেকে শুরু করে তালুর দিকে গুটিগুটি অগ্রসর। শেষ বয়সের স্বাচ্ছল্য প্রথম যৌবনের অভাব-অনটনের রেখা ক'টিকে ঢাকেনি, আমসি মুখখানার যেটুকু আকর্ষণ, তা হল কৌতুক চঞ্চল দুটি চোখ। অগ্নিযুগে নাকি সক্রিয় বিপ্লবী ছিলেন, এখনও সাগ্নিক, অবশ্য শুধু ওষ্ঠলগ্ন পুরু বর্মা চুরুটে।

টেবিলের ওপাশে, চেয়ারে প্রায় ডুবে গিয়ে সম্পাদক নিবিষ্ট মনে কী লিখছিলেন, চোখ তুলে বললেন, 'বসুন'। ঘণ্টা বাজিয়ে বেয়ারা ডেকে চায়ের ফরমাস করলেন।

অতসী মৃদুস্বরে বলল, 'আমি চা খাই না।'

সম্পাদক কলমটা সরিয়ে সকৌতুকে চোখে তাকালেন, 'খান না, না, খাবেন না, বলুন ত।'

অতসী সে-প্রশ্নের জবাব দিল না। বলল, 'আমি আদিত্য মজুমদারের কাছ থেকে বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি।'

নামটা যেন মন্ত্রের কাজ করল। সম্পাদক দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, সামনের খোলা ক্যালেণ্ডারে সেদিনের পাতায় লাল-নীল পেন্সিলে কয়েকটা অর্থহীন আঁচড় কাটলেন। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ?'

এর জবাব অতসীর মনে মনে তৈরিই ছিল। বলল, 'আমি ওঁর ইলেকশন ক্যাম্পেনের একজন অর্গানাইজার।'

'কই, আপনাকে এর আগে কখনও দেখেছি বলে তো মনে হয় না।'

'এতদিন মেয়েদের ফ্রণ্টে ওয়ার্ক করেছি।'

'এখন ফ্রণ্ট বদলে এসেছেন ?' সম্পাদক একটু হাসলেন, বললেন, 'বুঝেছি।'

কী বুঝেছেন বললেন না, ক্যালেণ্ডারের পাতাটা লাল পেন্সিলের খেয়ালী রেখায় ভরে তুললেন। অতসী আরামদায়ক নরম চেয়ারে বসেও অস্বচ্ছন্দ হয়ে উঠল। যতক্ষণ সম্পাদক জেরা করেছেন, ততক্ষণ অস্বস্তি বোধ করেছে, কিন্তু এই নীরবতার চেয়ে সেই জেরা ছিল ভাল।

বেয়ারা কী একটা কাগজ নিয়ে এল, সম্পাদক সেটা সই করলেন। চুরুটটা ছাইদানীতে নিবে এসেছিল, যত্ন নিয়ে সেটাকে ফের বহ্নিমান করলেন, ক্রিং ক্রিং ফোনটা তুলে কার সঙ্গে রহস্যালাপ করলেন মিনিট দুই, স্বরচিত অর্ধ সমাপ্ত প্রবন্ধটায় চোখ বোলাতে শুরু করলেন। অনেক পরে অতসী হাতব্যাগ থেকে ছোট রুমালটা বার করে কপাল মুছতে বোতাম টিপলেন; ক্লিক শব্দ হল, সম্পাদক মুখ তুললেন। অতসীর উপস্থিতি সম্পর্কে যেন সচেতন হলেন এই প্রথম।

—'কই, কেন এসেছেন, বললেন না তো ?'

অতসী বলতে পারল না সে সুযোগ সম্পাদক নিজেই দেননি। রুমালটা ফের হাতব্যাগে পুরে আরম্ভ করল, 'আদিত্যবাবু জানতে চেয়েছেন—'

আড়ষ্টতা যেটুকু ছিল, দু' চার কথাতেই কেটে গেল। সম্পাদক অভি-নিবেশের সঙ্গে শুনে গেলেন, কিন্তু হাতের লাল-নীল পেন্সিলে আঁকি-বুকি

কাটা থামল না। সব শুনে সম্পাদক পেন্সিলটা দিয়েই টেবিলে টরে-টক্কা করলেন কয়েক সেকেণ্ড।

অতসী দেখল আমসি মুখের রেখাগুলি সংখ্যায় বাড়ছে। সম্পাদক হাসতে শুরু করেছেন।

'সব তো বুঝলুম—মিস—মিসেস—'

'মিস মিত্র। অতসী মিত্র।'

'মিস মিত্র, এবারকার ইলেকশনে আদিত্যবাবুর কোন আশা নেই।'

'নেই কেন।'

'এতদিন আদিত্যবাবুর বিশেষ কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, ফাঁকা মাঠে গোল দিয়েছেন। এবারে আছে বাঘা তেঁতুল, প্রভাত মল্লিক বড় শক্ত ঠাঁই।'

'আদিত্যবাবুকেই বা দুর্বল ভাবছেন কেন।'

'দুর্বল ভাবছি না তো। আদিত্যবাবু অত্যন্ত সরল। একটু বেশি সরল বলেই তো আশঙ্কা। ওঁর তিনটে কারখানা আছে। স্বনামে বেনামে মিলিয়ে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বিজনেসের সংখ্যা নেই—সব গত পনের বছরে অর্জিত। অথচ সেই তুলনায় সাধারণের সুখসুবিধা তেমন বাড়েনি। আদিত্যবাবু তাদের কেউ নন, সাধারণে এটা বুঝে নিয়েছে।'

'প্রভাত মল্লিকও সাধারণের কেউ নন। তিনি অভিজাত বংশ থেকে এসেছেন। তাঁর জমিদারী আছে, কলকাতায় বাড়িভাড়া থেকেই আয়—'

বাধা দিয়ে সম্পাদক বললেন, 'জানি। আদিত্যবাবু সাধারণ অবস্থা থেকে বড় হয়েছেন, সেই জন্যেই তো সাধারণের ওঁকে বেশি হিংসে অতসী দেবী। প্রভাত মল্লিকের ঐশ্বর্য ওঁর আভিজাত্যের মত, ওঁর টুকটুকে রঙ আর গোল ভুঁড়ির মতই স্বতঃসিদ্ধ, ও নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।'

অতসীকে জবাব দেবার সুযোগ দিয়ে জবাব না পেয়ে সম্পাদক ফের বললেন, 'আসলে ব্যাপারটা কী জানেন, লোকে মুখ বদলাতে চায়। আদিত্য মজুমদারকে ওরা তিন-চারটে চান্স দিয়েছে, আর দিতে রাজী নয়। প্রভাত

মল্লিকও ওদের চাঁদ পেড়ে এনে দেবে না জানে, তবু সে নতুন। সেখানেই প্রভাত মল্লিকের জিৎ।'

'অর্থাৎ।'

'অর্থাৎ গণতন্ত্রের সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতিও সইতে না পেরে লোকে কোন কোন দেশে ফের রাজতন্ত্র ডেকে এনেছে, ইতিহাসে এর নজীর আছে জানেন ত? এ ব্যাপারটাও কতকটা তাই। আভিজাত্যই প্রভাত মল্লিকের বহুদোষনাশী। নিজের লোকের জুতোর লাথি লোকের শুধু গায়ে নয় প্রাণেও বেশি লাগে।'

চুরুটের ধোঁয়ার আড়ালে শীর্ণ মুখখানা লুকিয়ে সম্পাদক ফের বললেন, 'তা ছাড়া প্রভাত মল্লিকও ভোল বদলেছে। গত তিন সপ্তাহে কাগজে ওর কটা ডোনেশনের খরচ ছাপা হয়েছে দেখেন নি? আদিত্যবাবু নিজেকে ত্যাগী বলে জাহির করছেন, কিন্তু লোকে ভোলে নি। প্রভাত মল্লিক চটি পায়ে, উড়ুনী গায়ে উস্কখুস্ক চুল নিয়ে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছে। ঠিক গুরুদশার পোজ।'

সম্পাদক হাসলেন, নিজের রসিকতায় নিজেই মোহিত হয়ে চপল গলায় বললেন, 'অবশ্য পাল্টা জবাব হিসাবে আদিত্যও দাড়ি-গোঁফ গজাতে পারেন। কোন ফল হবে কি না সন্দেহ। আদিত্য মজুমদারের সব কীর্তিকাহিনী তবু তো আমরা এখনও প্রকাশ করিনি। ফ্রেণ্ডস ব্যাঙ্কের লালবাতি জ্বালানর পিছনে একজন সর্বত্যাগী ডিরেক্টরের কতখানি হাত আছে জানতে পারলে লোকে চমকে যাবে। আদিত্য মজুমদারের পলিটিক্যাল কেরীয়র ইচ্ছে করলে শেষ করে দিতে পারি।'

সম্পাদকের হুমকিতে ভয় পেত অতসী, যদি নাকি আদিত্য মজুমদারের ভবিষ্যৎ নিয়ে তার বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা থাকত। তবু নেশার মত লাগছিল সমস্ত ব্যাপারটা। খবরের কাগজের পরিবেশটাই ওর কাছে অভিনব। বাইরের বারান্দা আর সিঁড়িতে সদা ব্যস্ত কতকগুলো লোকের চলাফেরার আভাস পাচ্ছে, টাইপ মেসিনের খট-খট, একতলায় অনেকক্ষণ থেকে মেসিন চলছে, হয়ত মফঃস্বল সংস্করণ ছাপা শেষ হয়ে এল। আর পার্টিসন করা ছোট্ট

এই ঘরে ছোট্ট একটি মানুষ, যার একহাতে কলম অন্য হাতে চুরুট, অহঙ্কারের অবধি নেই, সমগ্র জনমত যার ধারণা তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখাগ্রে এবং সেই আত্মবিশ্বাসের জোরে যে আদিত্য মজুমদারের মত প্রতাপান্বিত নেতাকেও তুচ্ছ করবার স্পর্ধা রাখে ; যে আদিত্যকে শুধু ভয়ই করে এসেছে, তার কাছে সবটাই কেমন বিচিত্র, অবিশ্বাস্য অথচ গোপন সুখাবহ বোধ হচ্ছিল।

'আদিত্যবাবুর প্রস্তাবের জবাব আপনি এখনও দেন নি,' অতসী স্মরণ করিয়ে দিলে।

'দিই নি ?' সম্পাদক হাসলেন, 'আমি তো ভেবেছিলুম দেওয়া হয়ে গেছে। এ-লাইনে প্রায় বিশ বছর হয়ে গেল অতসী দেবী, ইংরাজের আইনকেও ভয় করিনি। বার তিনেক জেলে গেছি। আদিত্য মজুমদারের ভ্রূকুটিকে কি পরোয়া করবে জীবন সরকার!'

ব্যস্তভাবে ঘণ্টা বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকলেন সম্পাদক, অতসী বুঝল এটা ওকে উঠে যেতে বলার ইঙ্গিত।

২০

একটি জানালা শুধু বন্ধ হ'য়ে গেছে।

এখনও শরীর দুর্বল, নীরক্ত চোখ, বেশি চলাফেরা মানা। প্রহরে প্রহরে দাগ মেপে ওষুধ গেলা। বিস্বাদ, সব বিস্বাদ।

জানালা খুলে সুধা অপলক বাইরে চেয়ে থাকে। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী মানুষের মুখের মত ফ্যাকাশে চাঁদটা ঢলে পড়ে, হোসপাইপে আসে ঘোলা জল সকালে, টাট্টু ঘোড়ার সওয়ার সূর্য, এ-বাড়ির দেয়াল, ও-বাড়ির ছাদ টপ্‌কাতে টপ্‌কাতে সুধাদের জানালার শিকে ঠোকর খায়। একটু একটু করে বেলা বাড়ে, ঝর্ঝর জল পড়ে কলতলায়, ভাঙা-মোটা গলায় তেলকলটায় ভোঁ-বাঁশী অনেকক্ষণ ধ'রে ককিয়ে ককিয়ে কাদের ডাকে। সদর রাস্তায় ঢং ঢং ট্রাম, গলিতে ঠুন্ ঠুন্ রিক্সা, প্রথম ঝুন্ ঝুন্ ফিরিওয়ালা, এক সুরে বাঁধা, সা-রে-গা-মা।

সব সেই আগের মত। সুধা ক'মাস আগে যেমন দেখে গিয়েছিল। দিদিমা তেমনি রাত না পোহাতে গোবিন্দকে স্মরণ ক'রে উঠছেন, ভাল করে লক্ষ্য করলে হয়ত ঠাহর হবে, কোমর ভাঙা, ধৈর্য ধরে গুণলে দেখা যাবে, কপালে, চোখের কোণে আরও ক'টি রেখা যোগ হয়েছে। তবু অভ্যস্ত হাতে উনুন ধরান ঠিকই আছে। সকাল হতেই এখান থেকে ওখান থেকে টুকরো কাগজ কুড়িয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকেন; কাগজের উপর দু' কৌটা কেরোসিন তেল, একটা দেশলাই কাঠি। দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে উনুনটা, কিল্‌বিল্ ক'রে অনেকগুলো ধোঁয়ার সাপ ঘর থেকে এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে চায়। সেই অস্বচ্ছ দুঃস্বপ্নলোক থেকে ঈষৎ কুব্জ একটি ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে, তার রেখারুক্ষ মুখে অসীম বিরক্তি। আপন মনেই বিড় বিড় করে বুড়ী। হয়ত আহ্নিকস্তোত্র পড়ে, হয়ত অভিশাপ দেয়।

বিছানায় শুয়েই সুধা সব দেখতে পায়। এ-চেহারাও সুধার চেনা। হয়ত বয়স আর বিরক্তির রেখা ক'টি গভীর হয়েছে, মিশিকালো ঠোঁটের বিড় বিড় স্পষ্টতর—তার বেশি না। আর কিছুর বদল হয়নি।

কিন্তু একটি জানালা বন্ধ হয়ে গেছে।

ঘুরে ঘুরে সুধার চোখ সেখানেই পড়ে, বন্ধ জানালার পিছনে যেখানে পিঠের কাছে বালিশ জড়ো করে আধ-শোয়া একটি মেয়ে পৃথিবীকে শাপ দিত।

কোথায় গেল নূপুর, নূপুরের মা, ডাক্তার চৌধুরী, নিশীথ? গ্রামে যাবার আগে সুধা যেন যত্ন ক'রে ঝাঁপি বন্ধ ক'রে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে সব ঠিক আছে, খোয়া গেছে শুধু কয়েকটা কড়ি।

ফুলমাসিকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না, সুধা একদিন দিদিমাকে ডেকে কথাটা পাড়ল। দিদিমা নাক সিঁটকে উঠলেন, বললেন, 'মরণ, মরণ, ওদের কথা মুখে আনাও পাপ।' কিন্তু আসল কথাটা ভাঙলেন না।

এক দৃষ্টে সুধা চেয়ে চেয়ে দেখে। অত বড় বাড়ি, কিন্তু সব বন্ধ, বোবা; প্রাণের সাড়া নেই। একতলার সিঁড়ির নিচে থাকে এক দরোয়ান, মাঝে মাঝে খইনি টিপতে টিপতে বাইরে আসে, কোন কোন রাত্রে গান ধরে উৎকট গলায়। পুরনো কয়েকটি রহস্যময় দিন ও-বাড়ি থেকে নিঃশেষে মুছে গেছে।

অনেক ভেবে ভেবে সুধা একদিন উপায় ঠিক করল। কাগজ যোগাড় করল ফুলমাসির প্যাড থেকে; কলম নেই, পেন্সিলেই লিখতে শুরু করল, নিশীথবাবু—

এইটুকু লিখেই থামতে হল। জিজ্ঞাস্য যেটা সেটা কী করে প্রথমেই লেখা যায়। অথচ আর কিছু বক্তব্যও নেই। অনেক ভেবে-চিন্তে সুধা শেষ পর্যন্ত লিখল।

'নিশীথবাবু,

আমি এখানে ফিরেছি।'

নিচে সুধা নাম সই করল। আরেকটা লাইন পেন্সিল কামড়ে, অনেক ভেবে ভেবে লিখেছিল।—'একদিন দেখা করবেন।' পরে সেটাকে কেটে দিল।

সেই চিঠি বহুদিন বালিশের নিচে চাপা ছিল। ডাকে দেওয়ার সমস্যা সহজে পূরণ হয়নি, নিশীথের ঠিকানা জানাই ছিল, ডাকটিকিটও ছিল সঙ্গে। প্রায় সাতদিন পরে সুধা সুযোগ পেল। ফুলমাসি বাড়ি নেই, দিদিমা দুধ রাখতে রান্নাঘরে ঢুকেছেন। সুধা হাত-ছানি দিয়ে ওদের গয়লাকে ডাকল, চিঠিখানি দিয়ে বলল, 'ডাক বাক্সে ফেলে দিও।'

বাড়ি ফিরে অতসী জামাকাপড় ছাড়বার অবসরও পেল না, সদরে কড়া কড়কড় বেজে উঠল। দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

আগন্তুক অনাহূতই ভিতরে চ'লে এলেন।—'আমি সিতেশ রায়।'

বিস্মিত, খানিকটা-বা অপ্রস্তুত, অতসী তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আগন্তুক বললেন, 'জানি, চিনতে পারেননি। আমি স্বনামধন্য নই। অন্তত আদিত্য মজুমদারের মত নই।' ঘরের কোণে একটা মোড়া ছিল, দেখিয়ে বললেন, 'বসতে পারি?'

অনুমতির অপেক্ষা করলেন না, মৌনকেই সম্মতি ধরে নিয়ে বসে পড়লেন। রুমাল বার ক'রতে পকেটে হাত দিলেন, অতসী সেই অবসরে আগন্তুককে লক্ষ্য করতে লাগল।

সিতেশ রায়, বয়স ত্রিশের কোঠায়, নেহাৎ যদি কায়কল্পের জাদু বা কলপের জুয়াচুরি না থাকে। স্পষ্টতই সৌখীন, কেননা কামিজটা রেশমের, উড়ুনিটা মিহি, কোঁচার অর্ধেকটাই ধরাশায়ী।

মুখ মুছে রুমালটা ফের পকেটে পুরে সিতেশ বললেন, 'ঠিক বলছেন, আমাকে আপনি চেনেন না? কাগজেও আমার নাম পড়েননি?'

অতসী পুত্তলিকাবৎ চেয়ে রইল।

সিতেশ বললেন, 'আমি এবার ইলেকশনে দাঁড়িয়েছি।'

এতক্ষণে অতসীর মনে পড়ল। জানত বটে লড়াইয়ে শুধু আদিত্য আর প্রভাত মল্লিক নয়, তৃতীয় একজন প্রার্থীও আছে। নামটা মনে ছিল না।

সিতেশ রায় বলল, 'আপনি বোধ হয় অবাক হচ্ছেন, ভাবছেন লোকটার

মাথা খারাপ। ষাঁড়ে-মোষে লড়াই, এর মধ্যে এই মেষশাবক কেন। এর কি কোন চান্স আছে?'

একটু চুপ করলে সিতেশ, ঘরটার চারদিকে একবার চেয়ে নিল। বলল, 'জবাব আপনাকে দিতে হবে না, আমিই দিচ্ছি। নেই। আমি জানি, কাঠবিড়ালি বরং সমুদ্র সাঁতরাবে, আমি এই ইলেকশন বৈতরণী পার হ'ব না। তবু নাম দিয়েছি। পৃথিবীতে এত প্রতিযোগিতা আছে অতসী দেবী, সবাই কি জেতে? অনেকে হারে ব'লেই তো জয়ীর এত গৌরব। রেসের মাঠে গিয়েছেন কখনও? যাননি। গেলে দেখতেন, শুধু একটি ঘোড়া বাজি জেতে, পরের দু'টিও পুরস্কৃত হয়। বাকি সবার কৃতিত্ব লেখা হয়, দু'টি মাত্র শব্দে—'Also ran.' আমিও তাই। জয়ে যেমন আনন্দ আছে, হেরে যাওয়ার মধ্যেও তেমনি নেশা আছে। আমি রব নিষ্ফলের, হতাশের দলে। —পড়েন নি?'

অতসী বলল, 'কী প্রয়োজনে এসেছেন সেটা এখনও বলেননি।'

মুহূর্তের জন্যে, মনে হল, সিতেশ রায় অপ্রতিভ হয়েছে। কিন্তু সামলাতে সময় নিল না। উড়নিটা কাঁধবদল ক'রে হাসল।—'ঐ দেখুন, বক্তৃতা দিয়ে আপনাকে ভোলাতে চেয়েছিলুম, পারলুম না। এতক্ষণ যা বলেছি, সব ফেনা, কথার পিঠে সাজান কথা। আসলে কী জানেন, হারতে আমিও চাই না। ঝোঁকে বা শখে প'ড়ে প্রার্থীর দলে নাম লিখিয়েছিলুম, যত দিন যাচ্ছে তত ফলের কথা ভেবে শঙ্কা হচ্ছে। খবরের কাগজে বড় বড় হরফে হেডিং দেবে সিতেশ রায়ের জামানত জব্দ—সে আমার সহ্য হবে না।'

'বেশ ত। সময় আছে, এখনও নাম প্রত্যাহার করতে পারেন।' অতসী মৃদুকণ্ঠে বলল।

'পারি। হয়ত শেষ পর্যন্ত করবও।' উদাস স্বরে সিতেশ বলল, 'কিন্তু কী জানেন, অতসী দেবী, অনেক খরচপত্র ক'রে ফেলেছি, এখন ঠিক ফিরতেও মন সায় দিচ্ছে না। নইলে, প্রভাত মল্লিকের কাছ থেকে আমার তো স্ট্যাণ্ডিং অফার রয়েছেই। নাম প্রত্যাহার করলেই কিছু টাকা।'

'বেশ তো, নিয়ে নিন।'

'বড় কম দিতে চায় যে। মোট পাঁচ হাজার। তা'তে আমার খরচ হয়ত পোষাবে। কিন্তু বদনাম—বদনামের দাম কে দেবে।'

'কী চান, তাই বলুন।'

মোড়াটা ঘষে ঘষে অতসীর প্রায় পায়ের কাছে নিয়ে এল সিতেশ, মুখ উঁচু ক'রে ধরে বলল, 'আপনি পারেন, অতসী দেবী। দিন না, আদিত্য মজুমদারকে ব'লে আমাকে হাজার দশেক পাইয়ে।'

অতসী হেসে ফেলল।—'আমি ব'ললেই আদিত্যবাবু দিয়ে দেবেন? তা-ছাড়া, আপনি নিজেই বলছেন, আপনার কোন চান্স নেই। অত টাকা তিনি দেবেনই বা কেন?'

'দেবেন।' সিতেশের মুখের একাংশ প্রার্থীর, অপরাংশ বিশ্বাস-বলিষ্ঠ, বলল, 'দেবেন। আমি বেশি ভোট পাব না, কিন্তু কিছু তো পাব। হয়ত সেই ক'টি ভোটের জন্তেই আদিত্যবাবু প্রভাত মল্লিকের কাছে হেরে যাবেন। আমি প্রবল না হতে পারি, একেবারে তুচ্ছ নই। আমার দুশো রিক্সা আছে, এই কলকাতা শহরেই আমার তিনটে ট্যাক্সি, দুটো বাস দৌড়োয়।'

'তাতে কী। আপনার নাম তো কেউ জানে না।'

'সেটায় অসুবিধে যেমন, সুবিধেও তেমনি কিছু আছে। আদিত্য মজুমদারের বস্তি আছে, লোকে তাঁকে জানে শোষক বলে, প্রভাত মল্লিকেরও গোটা কয়েক কলোনী আছে শুনেছি।'

'শোষক তো আপনিও। আপনার রিক্সা যারা টানে, বাস যারা চালায়, তারাই সাক্ষ্য দেবে।'

সিতেশ রাগ করল না, হাসল।—'তর্কের খাতিরে না হয় স্বীকার করলুম, আমি শোষক। কিন্তু আমার সেই পরিচয় ক'জন জানে, অতসী দেবী। সেখানেও আমার সুবিধে, dark horse কিনা। বেনামী ঘোড়াও অনেক সময় বাজি জেতে। যাক আমার প্রস্তাব আপনাকে জানালুম। আদিত্য-বাবুকে বলবেন।'

'বলব।' লোকটার হাত থেকে রেহাই পেতে অতসী তখন সব কিছু কবুল করতে রাজী।

চৌকাঠ পর্যন্ত এগিয়ে সিতেশ ফিরে তাকাল, 'আদিত্যবাবু রাজী হন, ভাল। নইলে—নইলে আমাকে হয়ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রভাত মল্লিকের অনুকূলেই নাম প্রত্যাহার করতে হবে।'

হতবাক্ অতসী ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি মোটরের স্টার্ট নেওয়ার শব্দ শুনল।

সব শুনে আদিত্য বললেন, 'নট্ এ পাই।' কব্জি ফুলিয়ে বললেন, 'আমরা ডাণ্ডাবেড়ি আর লপ্সীর পরীক্ষায় পাশ করেছি অতসী, সিতেশ রায় টাইপের লোককে ছুঁচোর মত জ্ঞান করি। পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে আদিত্য মজুমদার ছুঁচোমারা কল কিনবে না।'

অতসী বললে, 'বেশ তো, কিনবেন না। ভদ্রলোক আমাকে বাড়ি বয়ে বলতে এসেছিলেন। আমি আপনাকে জানালুম, ব্যস।'

চোখের মণি ছোট করে আদিত্য অর্থপূর্ণ হাসলেন, 'ব্যাপার কী বলতো? তোমার অত গরজ কেন? সিতেশ কিছু দালালি দেবে কবুল করে যায়নি তো?'

দাঁতে দাঁত ঠেকিয়ে অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করল অতসী। কিন্তু ওর মুখের ভাবান্তরটুকু আদিত্যের চোখ এড়াল না। উঠে দাঁড়িয়ে অতসীর পিঠে একখানি হাত রেখে বললেন, 'কী হল?'

সরে দাঁড়াল, অতসী মুখ ফিরিয়ে নিল। যেন দেয়ালের ঘড়িটাকে বলল, 'ভাবছি আপনি আমাকে কত সস্তা মনে করেন।'

সস্তা? অভিনেতা আদিত্য সঙ্গে সঙ্গে গাঢ়স্বরে বললেন, 'না অতসী, সস্তা মনে করি না। তোমার মূল্য অনেক বেশি, জানি। সে-মূল্য তো আমি দিতে প্রস্তুতও আছি। তোমাকে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলাম, মনে নেই?'

অতসী কেঁপে উঠল।—'প্রতিশ্রুতি? কিসের প্রতিশ্রুতি?'

সাহস পেয়ে আদিত্য আবার অতসীকে স্পর্শ করলেন, আহত একটি মুখ

ফিরিয়ে দিলেন সামনের দিকে। চোখে চোখ রেখে বললেন, 'আমাদের দু'টি জীবন এক হবে। শুধু এই ইলেকশনটা তরে যেতে দাও।'

কণ্টকিতদেহ অতসী বলল, 'আমার ছেলেকে আমি ফিরে পাব?'

আদিত্য বললেন, 'পাবে। শুধু একটা কথা। শুনলুম তুমি একদিন অরফ্যানেজে গিয়েছিলে। এখনও মাঝে মাঝে যাও, কম্পাউণ্ডের বাইরে ঘোরাঘুরি কর। আমার একটা অনুরোধ রাখ, আর যেও না। কলঙ্ক আগুনের মত, জ্বলে সহজে, নিবতে চায় না, নিবলেও অনেক কিছু পুড়িয়ে রেখে যায়। লোকে যাকে অপুত্রক বলে জানে, সেই শিক্ষয়িত্রীকে দিনের পর দিন একটা অরফ্যানেজের আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করতে দেখলে লোকে নানা কথা রটাবে, অতসী।'

অতসী আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছিল, আদিত্য ডাকলেন, 'শোন। আর একটা কথা, সিতেশ রায় বা ওর দলের কেউ এলে আমল দিও না। ওদের আমি চিনি। ওদের ব্যবসাই এই। ইলেকশনে দাঁড়ায়, প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে কিছু টাকা খসাতে। হাজার টাকা খরচ করে পাঁচ হাজার টাকা আদায়ের ফিকির।'

অতসী সোজা বাসায় ফেরে নি, শহরতলীর বাসে উঠেছিল।

পরিচিত কম্পাউণ্ড, গম্ভীর ডাক্তার, শুক্লবাস ব্যস্তসমস্ত নার্সদের চলাফেরা, লোশন-ওষুধের গন্ধ, বেডে বেডে সারি সারি বুক অবধি চাদরঢাকা রোগী। ঘরে ঘরে ঘুরল অতসী, মুখ থেকে মুখে সার্চলাইটের মত চোখ ঘুরিয়ে আনল। যাকে খুঁজছে সে কই!

'কাকে খুঁজছেন? কত নম্বর পেসেন্ট?'

অতসী চমকে দেখল গলায় চামড়ার নল ঝোলান একজন ডাক্তার। থতমত খেয়ে ঢোঁক গিলে নম্বর বলল।

'নাম?'

অতসী তাও বলল।

ডাক্তার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'ও-নামে ওই বেডে কোন পেশেন্ট নেই।'

'নেই?'

ডাক্তার বললেন, 'না!'

অতসীর পা অবধি কেঁপে গেল। ব্যাকুল গলায় বলে উঠল, 'কী হল, কী হল তার ডাক্তারবাবু? সেকি—'

নির্বিকার গলায় ডাক্তার বললেন, 'জানি না, এনকোয়ারি অফিসে খোঁজ নিতে পারেন। এখানে ভিড় বাড়াবেন না।' খট খট জুতো পায়ে ডাক্তার এগিয়ে গেলেন, ন-যযৌ গিরিসুতার মত অতসী কিছুক্ষণ বিমূঢ় চোখে চেয়ে রইল।

এনকোয়ারি অফিসে ভিড় ছিল, বহু উৎসুক মুখ কাউন্টার ঘিরে দাঁড়িয়ে। সেখানে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করবার মত মনের স্থৈর্য অতসীর ছিল না। পা টলছে, কম্পাউণ্ডের প্রশস্ত লনে দাঁড়িয়ে অতসী যেন পৃথিবীর আহ্নিক গতি ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করল। তবু বাসে উঠল ঠিক, নির্দিষ্ট স্টপ এলে চিনতেও পারল।

গলির পথটুকু কোনক্রমে ফুরোলে বাঁচে অতসী, চোখে মুখে জল ঢেলে বিছানায় অসাড় শরীরটাকে সঁপে দিতে পারে।

কিন্তু সদর দরজা ঠেলেই বাইরের ঘরে আধ অন্ধকারে এই ছায়ামূর্তি দেখতে পেল, দু' পা পিছিয়ে এল অতসী। গলা দিয়ে অস্ফুট একটি কথা শুধু বেরুল, 'আপনি!'

আদিত্য উঠে দাঁড়ালেন।—'বিশেষ প্রয়োজন হল, তাই তোমার খোঁজে এসেছি। তুমি বুঝি হাসপাতালে গিয়েছিলে অতসী?'

অতসী জবাব দিল না, দেয়াল ধরে নিজেকে কোনমতে সোজা করে রাখল।

আদিত্য বললেন, 'যাবার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করলে না কেন, তা হলে বৃথা কষ্ট ভোগ করতে হত না। নীলাদ্রি তো ওখানে নেই।'

হাতের মুঠো কঠিন হয়ে উঠল অতসীর। বলল, 'সে কোথায়? সে কি বেঁচে আছে?'

মৃদু হেসে আদিত্য বললেন, 'ব্যস্ত হয়ো না, আছে। নীলাদ্রি ভালই আছে।'

ধুলোভরা মেজে, অতসী সেখানেই বসে পড়ল। আস্তে আস্তে বলল, 'আপনিই তাকে সরিয়েছেন।'

আদিত্য হাসলেন, 'সরিয়েছি, আমি সরিয়েছি। ওর প্রতি তোমার এত মমতা, জানি ত। একদিন দেখতে গিয়েছিলুম। ওখানে নীলাদ্রির শরীর সারছিল না, আমার কাছে একে একে সব অসুবিধে অভিযোগের কথা খুলে বললে। আমি বললুম, বেশ ত নীলাদ্রি বাবু, এখানকার ব্যবস্থায় আপনার যদি কোন উন্নতি না হয়, আপনাকে আমি সাউথ ইণ্ডিয়ার একটা স্বাস্থ্যাবাসে পাঠাব। সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ দুটিতে কী কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল তুমি যদি দেখতে অতসী!'

আদিত্য দম নিয়ে বললেন, 'মৃত্যুর কাছাকাছি গিয়ে নীলাদ্রি তার চেহারাটা দেখতে পেয়েছিল। ভয় পেয়েছিল। ওর সেই রূপ তুমি যদি দেখতে: রোগক্ষীণ শরীর, মুখে আতঙ্ক। আমার হাত দুটি চেপে বলেছিল, 'আমাকে বাঁচান আদিত্য বাবু, বাঁচান।' নীলাদ্রির মনে তখন একটিমাত্র সাধ, বেঁচে থাকার। কোন লাভ নেই, বেঁচে থাকা মানে আরও কিছুদিন কষ্ট ভোগ, তবু নীলাদ্রি মরতে রাজী নয়। আমি ওকে বাঁচিয়েছি।'

অবিশ্বাসের সুরে অতসী বলল, 'বাঁচিয়েছেন!'

শান্ত গলায় আদিত্য বললেন, 'তুমি অন্য রকম অর্থ করবে জানি। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমার আর কোন অভিসন্ধি ছিল না। যা কিছু করেছি, তুমি ওকে ভালবাস বলে। লজ্জা পেও না, আমি জানি। লোকের কাছ থেকে সারাজীবন শুধু ভক্তি না হয় ঘৃণা পেয়েছি অতসী, তবু ভালবাসা জিনিসটা দেখলে চিনতে পারি।'

একটি দীর্ঘশ্বাস তীক্ষ্ণ মুখ হয়ে অতসীর মর্মে গিয়ে বিঁধল। বিবর্ণ মুখে বলে উঠল, 'সে তবে শুধু বেঁচে থাকার লোভে আমাকে আপনার হাতে ছেড়ে গেছে?'

আদিত্য অতি স্নিগ্ধ হেসে বললেন, 'জানি না। সেটা আমার জানবার কথা নয়, তোমাদের দু'জনের মধ্যে বোঝাপড়ার ব্যাপার।'

অনেক পরে অতসী বলল, 'তবে ওর ঠিকানাটা দিন আমাকে।'

আদিত্য বললেন, 'দেব। ইলেকশনের পরে দেব।'

অকস্মাৎ যেন সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে আদিত্য বললেন, 'তোমার সেই বোনঝিটির অসুখ শুনেছিলাম, এখন কেমন আছে? চলো, দেখে আসি।'

অতসী নীরবে অনুসরণ করল।

সুধার শিয়রে ওর দিদিমা বসেছিলেন, আদিত্যকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন, হাসি-হাসি মুখে অভ্যর্থনা করলেন, 'আসুন।'

আদিত্য বললেন, 'বসব না। এখন কেমন আছে খুকি।' সুধার কপালে হাত দিলেন।

দিদিমা বললেন, 'আজ বিকেলে আবার জ্বর এসেছে। আপনি যাবেন না আদিত্যবাবু, আপনার জন্যে মশলা নিয়ে আসি।'

মশলা নিয়ে দিদিমা যখন ফিরলেন, আদিত্য তখন ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত, চৌকাঠের বাইরে পা দিয়েছেন। রেকাব থেকে একটিমাত্র এলাচ তুলে নিয়ে বললেন, 'যাই।'

দিদিমা আবদারের সুরে বললেন, 'আপনি আজকাল মোটে আসেন না, আদিত্যবাবু।'

আদিত্য দোষ স্বীকার করলেন। 'কী করি, সময় পাই না। ইলেকশন নিয়ে এমন জড়িয়ে পড়েছি।'

'জানি। অতসীও তো সেইজন্যে মোটে ফুরসৎ পায় না। ও-ও খুব খাটছে আদিত্যবাবু।'

সস্নেহ প্রশ্রয়ে অতসীর দিকে একনজরে চেয়ে আদিত্য বললেন, 'খাটছেই তো। অতসী না থাকলে এই অথৈ জলের কিনারা পেতাম না মাসিমা।'

সুধা বিছানায় শুয়ে আত্মীয় সম্বোধনে পুলকিত দিদিমার গদগদ গলা শুনল, 'এসব হাঙ্গামা চুকে যাক, তারপর আমাকে কিন্তু একবার সব তীর্থ ঘুরিয়ে আনতে হবে আদিত্যবাবু, কবে মরি ঠিক নেই, আমি এখনও কাশী, বৃন্দাবন মথুরা দেখিনি।'

বরাভয় দানের ভঙ্গিতে আদিত্য বললেন, 'দেখবেন, সব দেখবেন। পুষ্কর দ্বারকাও বাকি থাকবে না। শুধু আশীর্বাদ করুন, সামনের এই পরীক্ষাটা যেন পার হতে পারি।'

২৯

'আমি বাঁচতে চাই না।' চিঠি লেখা শেষ ক'রে অতসী খামে হেড্-মিস্ট্রেসের নাম লিখল। অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'আমি' বাঁচতে চাই না।'

সামনে সাদা দেয়াল, কোনদিন সেখানে বুঝি একটি ক্যালেণ্ডার ছিল, এখন নেই। হয়তো বছর ফুরিয়েছে, হয়ত না-ফুরোতেই পাতাগুলো ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়ে গেছে। এখনও তার চিহ্ন আছে পুরনো একটা পেরেকে; ছোট্ট, কালো একটি কলঙ্কবিন্দু। অতসীর চোখ সেখানে। কিম্বা তার পাশে আরেকটি রক্তাভ আঙুলের ছাপে, যেখানে সে নিজেই কবে যেন একটা ছারপোকা টিপে মেরেছিল।

অতসীর চোখ সেখানে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, মনও সেখানে। কিন্তু সেখানে না, হয়ত কোথাও না। অতসী তার না-কিনারা ভাবনা আর লোনা কান্না নিয়ে বুঝি নিজের মধ্যেই ডুবে গেছে। চোখ দুটি খোলা কিন্তু দৃষ্টিহীন।

খাম থেকে চিঠিটা খুলে অতসী আরেকবার পড়ল। ঠিক আছে। এই চিঠি হেড্-মিস্ট্রেসের হাতে পৌঁছে দিলেই জীবনের আরও একটি অধ্যায়ের ইতি হবে। লেডী সমাদ্দার স্কুলের টীচার নয়, আদিত্য মজুমদারের প্রচারিকাও না,—এর পর শুধু অতসী।

শুধু অতসী? কে সে। সে কি কখনও ছিল। দেয়ালে দৃষ্টি রেখে অতসী নিজেকে, কিম্বা দেওয়ালের কালো ওই লোহার ফোঁটাটাকে, প্রশ্ন করল। যে শুধুই অতসী ছিল তার মুখখানা আজকের স্কুল টীচার কিছুতে মনে করতে পারছে না। আলোড়িত জলের তলার প্রতিচ্ছবির মত সে কেবলি ভেঙে ভেঙে যায়, ছড়িয়ে পড়ে, সম্পূর্ণ, স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দেয় না।

অথচ এই দেহেই সে বাস করে গেছে। সে আগে ছিল, এই অতসী এসেছে পরে। খুঁজে খুঁজে খুঁটে খুঁটে দেখছে পুরনো ভাড়াটের কোন চিহ্ন যদি প'ড়ে থাকে কোথাও; যদি সামান্ত একটি স্মারক থেকে একটু নিরুদ্দিষ্ট মেয়ের স্বরূপ চেনা যায়।

এই শরীরটারই চোখের জানালা দিয়ে সেই অনভিজ্ঞ কুমারী নির্নিমেষ বিস্ময়ে পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকত; ক্ষণে ক্ষণে আকাশ রঙ বদলে নতুন হয়, সোনালি ওড়না ফেলে বিকেল-রঙের শাড়ি পরে, দেখতে ভাল লাগত। কান পেতে শুনত রাস্তায় প্রতিটি পায়ের ধ্বনি। একজনের চোখে চোখ রাখতে সুখে-পুলকে বুক কেঁপে উঠত। ভাবত স্বপ্ন, সাধ, সুখ আর প্রীতির কয়েক-গাছি রঙীন সুতোয় জীবনটাকে এক গুচ্ছ ফুলের মত বেঁধে নেবে।

দেহকে সে ভেবেছিল দেবায়তন, মনকে স্মিত স্নিগ্ধ ঘৃতদীপ।

সেই কিশোরী কবে যে এই বাসা ছেড়ে নিরুদ্দেশ হ'ল, কেউ লক্ষ্য করেনি। নতুন যে ভাড়াটে এল, তার স্বপ্ন নেই, মোহ নেই, বিস্ময় নেই। লাবণ্য ঝরে গেছে, নিষ্পত্র শীতার্ত সত্তা নিজের চারপাশে পুরু একটা আবরণ রচনা করেছে। সতর্ক, সাবধানী, সন্দিগ্ধ। অনেক ঠেকেছে সে, অনেক ঠকেছে। এই দেহ কবে দেবায়তনের মত শুচি ছিল মনেও নেই। মন-প্রদীপের সলতে পুড়ে পুড়ে কালি হ'ল। শুধু তিক্ততা, শুধু গ্লানি, তবু অতসী মরতে চায়নি, পোড়া সলতেয় নতুন করে শিখা জ্বালতে গেছে।

সেই শিখাটুকুও আদিত্য এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়েছেন। লুব্ধ শকুনির ডানা দিয়ে অতসীর সব কামনা-বাসনা আবৃত ক'রে রেখেছেন। এই অন্ধকারে অতসীর এতটুকু বাঁচবার সাধ নেই।

কাল আদিত্য চলে যাবার পর অতসী অনেকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে ছিল। আহারে রুচি নেই, আলোটা নিবিয়ে দিল, শুয়ে পড়ল বিছানায়।

বিছানা তো নয় ভাবনার ভেলা। ভেসে ভেসে অতসী কতদূর গেল হিসাব নেই। বিনিদ্র, স্থির চোখের পাতা দু'টি জলতে শুরু করেছে, কপালের কাছে অবাধ্য একটা শিরার টিপ্ টিপ্। ঠিক তখনি সব ভাবনা একটা

সঙ্কল্পের আবর্তে প'ড়ে বার বার ঘুরপাক খেতে থাকল। ঠিক হয়েছে। এই ছোট সুখ, সামান্য শখের নুড়ি কুড়োন আর না। পায়ে পায়ে স্বার্থের কাঁটা ফোটে, চারধারে চক্রান্তের রুদ্ধশ্বাস দেয়াল। এর বাইরে যেতে চায় অতসী, আদিত্যের শকুনি-ডানার আওতা ছাড়িয়ে রৌদ্রস্পর্শ পেতে চায়।

সে রৌদ্র যদি মৃত্যু হয়, তবুও। মৃত্যুও মুক্তি।

সকালে উঠেই আজ তাই অতসী চিঠি লিখতে বসেছে। সংক্ষিপ্ত কয়েকটা কথায় হেড-মিস্ট্রেসকে জানিয়েছে, আসছে মাস থেকে কাজে যাবার ইচ্ছে তার নেই।

সুধা একটু দূর থেকে দেখছিল ফুলমাসিকে। কাল সারারাত উস্‌খুস্ করেছে, আজ সকাল থেকেই কেমন যেন হ'য়ে গেছে ফুলমাসি। মুখ ধোয়নি, রাত-কাপড়টা পর্যন্ত ছাড়েনি। ভেঙেপড়া খোঁপা থেকে রুক্ষ রুক্ষ চুল উড়ছে, ফুলমাসির ভ্রূক্ষেপ নেই, চিঠি লিখছে।

দিদিমা পাশে এসে দাঁড়ালেন।

'কী করছিস্?'

'চিঠি লিখছি।'

ঝুঁকে পড়ে দিদিমা চিঠিটা একবার দেখলেন, কিছু বুঝলেন না।—'কাজে যাবি না?'

'ইস্কুলের তো ঢের দেরি।'

'ইস্কুলের কথা বলিনি।'

'ও, ইলেকশনের।' অতসী মুখ তুলে মার দিকে চাইল। 'ইলেকশনের কাজ আর করব না ঠিক করেছি।'

'ইলেকশনের কাজ করবি না!' দিদিমা অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠতেও ভুলে গেলেন। সুধাও দুরু-দুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগল।

অতসী শুকনো গলায় বলল, 'তুমি কী ভাবছ জানি, মা। ভাবছ তোমার আর ইহজন্মে তীর্থ দেখা হ'ল না। কী করবে বল। প্রার্থনা করি, আসছে জন্মে এমন কাউকে পেটে ধ'র, যে তোমাকে তীর্থদর্শন করাতে পারে।'

কঠিন আঘাতেও দিদিমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল না। বললেন, 'তীর্থের কথা ভাবছি না। ইলেকশনের কাজ ছাড়লে ইস্কুলের চাকরিই কি থাকবে তোর।'

নিশ্চিন্ত গলায় অতসী বলল, 'থাকবে না। সেইজন্য নিজে থেকেই ছাড়ছি।'

'নিজে থেকেই ছাড়ছিস,' দিদিমা আর নিজেকে ধ'রে রাখতে পারলেন না, তীব্র স্বরে ব'লে উঠলেন, 'হতভাগী, তুই খাবি কী। বুড়ি মা-র কথা না হয় নাই ভাবলি, তুই নিজে কী করে বাঁচবি ভেবে দেখেছিস্?'

'আমি বাঁচতে চাই না।' শান্ত, স্থির কণ্ঠে অতসী, একটু আগে দেয়ালকে যা বলেছিল, মাকেও তাই বলল। মন্ত্রের মত করে উচ্চারণ করল, 'আমি বাঁচতে চাই না।'

চিঠিটা হাতে নিয়েই সীতাদি খামটা ছিঁড়েছিলেন, পড়তে শুরু ক'রেই যেন হোঁচট্ খেলেন। ভ্রূ কুঞ্চিত হল, খাপ খুলে চশমাটা এঁটে নিলেন। তবু চিঠিটার দুর্বোধ্যতা গেল না। পড়তে পড়তে সীতাদির মুখে ছোট্ট একটু হাঁ দেখা দিল, বেরিয়ে পড়ল ঝকঝকে কিন্তু বাঁধান কয়েকটি দাঁত। শেষ লাইনে পৌঁছে সীতাদি দু' দু'বার নামটা পড়লেন, ব্যাঙ্কের কেরাণী যেমন ক'রে চেকের সই মেলায়, তেমনি ক'রে মেলালেন। তারপর চিঠিটা ভাঁজ ক'রে অতসীর দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ?'

প্রশ্নের উত্তর চিঠিতেই আছে, অতসী চুপ করে রইল।

সীতাদি ধীরে ধীরে বললেন, 'ভুল করছ, খুব ভুল করছ, অতসী। কোন কারণ নেই—'

'আছে!'

সীতাদি বললেন, 'কিন্তু কারণ তো তুমি দেখাওনি।'

অস্থির গলায় অতসী বলল, 'চিঠিতে কারণ দেখান যায় না, সীতাদি, সব কথা খুলে লেখা যায় না। আপনি দয়া করুন, চিঠিটা গ্রহণ করে আমাকে রেহাই দিন।'

'অন্ত কোথাও কাজ ঠিক করেছ ?'

'না।'

'আশ্বাস পেয়েছ ?'

অতসী আবার বলল, 'না।'

'ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষ।' সীতাদি অস্ফুট গলায় প্রায় স্বগতোক্তি করলেন।

বয়স ষাটের কাছে, সীতাদিকে তার চেয়েও প্রাচীন দেখায়। হ্রস্বদৃষ্টি, গম্ভীর, সর্বদাই চিন্তাক্লিষ্ট মুখ। এই স্কুলে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর ভার পেয়েছেন, সে আজ বছর কুড়ি হ'য়ে গেল, এর মধ্যে সীতাদি যদি কোনদিন হেসে থাকেন তো নিজের ঘরে, আয়নার সমুখে, দরজায় খিল তুলে। প্রকাশ্যে কখনও না। মাইনে বাড়লে না, স্কুলের কোন ছাত্রী পরীক্ষায় ভাল ফল দেখালেও না। দৃঢ়, অনড় গম্ভীর, এই মানুষটির সান্নিধ্যে রাশভারী ইন্সপেক্‌ট্রেসরাও কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, জুনিয়র টিচারেরা তটস্থ থাকে।

'আমি এবারে যাই, সীতাদি।'

সীতাদি ক্ষণেক অন্যমনস্ক হ'য়ে থাকলেন, বললেন 'যাও।' তারপর নতমুখ অপস্রয়মান অতসীর দিকে চেয়ে কী মনে পড়ল, ডাকলেন, 'শোন।'

অতসী ফিরে এল।

'আজকের সব ক'টা ক্লাশ নিয়েছ ?' জিজ্ঞাসা ক'রেই বুঝি মনে পড়ল, অতসী পদত্যাগ করেছে, চিঠিটা এখনও ওঁর হাতে। একটি অসুখী, রণক্লান্ত মেয়েকে দেখতে পেলেন। করুণা হ'ল। সীতাদি চিরকুমারী, সন্তানস্নেহ তাঁর কাছে ছবিতে-দেখা বইয়ে-পড়া দেশের মত, অস্পষ্ট একটা ধারণা মাত্র তবু অননুভূতপূর্ব মমতা বোধ করলেন।

বললেন, 'ব'স। তোমাকে কয়েকটা কথা বলি।'

অতসী অনুদ্ধত কিন্তু স্থির স্বরে বলল, আপনি কী বলবেন জানি, সীতাদি। আমার মাও আমাকে ওই কথা বলেছিলেন। কী খেয়ে বাঁচব, এই তো। কিন্তু সীতাদি, আমি বাঁচতে যে চাই না।'

আস্তে আস্তে ওর পিঠে একটি হাত রেখে সীতাদি বললেন, 'চাও। বাঁচার সাধ আর মৃত্যুর সাধ দুই-ই মনের মধ্যে থাকে অতসী। প্রথমটা স্থূল, উচ্চারিত, ওপরে থাকে; দ্বিতীয়টা গোপনে, নিচে। কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা জৈব নানা আকাঙ্ক্ষার মত মৃত্যুকামনাও সত্য, সেও মাঝে মাঝে মাথা তোলে। তাই ব'লে বেঁচে থাকার বাসনা সঙ্গে সঙ্গে লোপ পায় না। নইলে—নইলে' হঠাৎ কেমন থতমত খেলেন সীতাদি, কথার সুতো যেন ছিঁড়ে গেল—'নইলে আমি বেঁচে আছি কেন। এতখানি বয়স পেরিয়ে এলুম, মাথার চুলে কবে পাক ধরেছে। একটু ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে গলায় মাফলার জড়িয়ে রাখি, পান ছেঁচে ছেঁচে খাই। সামান্য একটু ঝোল-ভাত, তাও আজকাল সয় না। তবু তো আমি, আমিও মরতে চাইনে অতসী। বলতে পার, আমি বেঁচে আছি কোন্ লোভে?'

'আপনি এই মেয়েদের ভালবাসেন।'

একটু চুপ ক'রে থেকে সীতাদি বললেন, 'হয়ত বাসি। আজ বাসি। এ-ভালবাসা কিন্তু একদিনে আসেনি অতসী, ধীরে ধীরে অর্জন করেছি। কৃপণের একটি একটি ক'রে টাকা জমানর মত এদের জন্যে মনে ফোঁটা ফোঁটা স্নেহ জমেছে। নইলে আমিও একদিন সংসার খুঁজেছিলাম; যে-হাত বেত ধরেছে সে-হাত দোলনা ঠেলতে চেয়েছিল। যাক্, সে আরেক গল্প। যেদিন টের পেলাম আমি ঠকেছি, সেদিন আমিও মরতে চেয়েছিলাম। মরিনি তো। তার বদলে নিলুম এই চাকরি। কী-যে ঘৃণা ছিল তখন, তোমাকে বোঝাতে পারব না। যখনই ভাবতুম সারা জীবন এই শুকনো মাস্টারি ক'রে কাটবে, গায়ে কাঁটা দিত। নিজের জ্বালা মেটাতে এই মেয়েদের মারতুম। বুকফাটা চীৎকার করত এরা, পায়ের উপর আছড়ে পড়ত, তবু ছাড়িনি। এখন বুঝি, ওদের মারিনি, মেরেছি আমি নিজেকেই।' বলতে বলতে সীতাদির চোখ জলে ভরে গেল, সামলে নিয়ে বললেন, 'আস্তে আস্তে জ্বালা আপনি জুড়োল, মনের ভিতরের অশান্ত খুকিটা যেন ঘুমিয়ে পড়ল। দেখলুম, সুখ শুধু একজনের কাছে নিজেকে উজাড় করে দেওয়াতে নয়, সকলের জন্যে কিছু-

কিছু রাখাতেও। শান্তির পাখিটিকে খুশি হ'লে আকাশে উড়িয়ে দেওয়া যায়, আবার মনের মধ্যে ছোট্ট কৌটোয় বন্দী করেও রাখা চলে।' চিঠিটা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'এটা আজ পেশ করব না। তুমি এখন উত্তেজিত। ভেবে-চিন্তে আমাকে তিন দিন বাদে জবাব দিও।'

সবে মাত্র গেট পর্যন্ত এগিয়েছিল, তখনও কম্পাউণ্ডের বাইরে পা দেয় নি, মায়া পিছন থেকে অতসীকে ধরে ফেলল। আঁচলে টান দিয়ে বলল, 'এই পোড়ামুখি, কোথায় পালাচ্ছিস?'

মায়া ইংরেজীর টীচার, বয়সে অতসীর কিছু বড়।

আঁচল ছাড়িয়ে নিয়ে অতসী বলল, 'পালাব কেন।'

'তবে যে একা-একা চলে এলি, কাউকে না বলে?"

অতসী বলল, 'এমনি। শরীরটা ভাল নেই তাই।'

'মনটাও নেই, না?' মায়া চোখ টিপে বলল। যৌবনের বেলা গড়িয়ে বিকেল চলছে মায়ার, দেহের গঠন একটু থলথলে, কিন্তু মুখখানার বয়স বাড়েনি, এখনও কচি, ঢলঢলে। —'আমি সব জানি। চল, চা খেতে খেতে কথা হবে।'

চায়ে অতসীর আসক্তি ছিল না, কিন্তু মায়ার হাত থেকে সহজে রেহাই নেই; সুতরাং নিস্পৃহ-কণ্ঠে বলতে হল, 'চল।'

চায়ের দোকানে ঢুকল দু'জনে, পর্দা-টানা আলাদা খুপ্‌রি বেছে নিল। সামান্য কিছু খাবারের ফরমাস করে মায়া তার চেয়ারটা টেবিলের যতটা সম্ভব কাছে টেনে, ঝুঁকে পড়ে অতসীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'যা শুনছি, সব সত্যি?'

'কী শুনছিস।'

'এই,—এই তুই নাকি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছিস।'

'ধরে নে, দিয়েছি—'

মুচকি হেসে অন্তরঙ্গ গলায় মায়া বলল, 'ব্যাপার কী বল দেখি। বিয়ে করছিস?'

অতসী বলল, 'দূর।'

মায়া এটাকে স্বীকৃতি বলেই ধরে নিল। গরম চায়ে ফুঁ দেবার মত করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।—'হিংসে হয় তোদের দেখলে।'

'হিংসে কেন'

'এই তো দিব্যি ম্যাপ আঁকান, অঙ্ক বোঝানর হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেলি। আমাদের আর মুক্তি নেই—হাড়মাস এই সমাদ্দার ইস্কুলেই কালি করে চিত্তেয় উঠতে হবে।'

মায়ার ব্লাউজের-হাতা-ফাঁসান বাহুর দিকে স্মিত চোখে চেয়ে অতসী বলল, 'এই বা মন্দ আছিস কী—বেশ তো ফুলছিস।'

মায়া কপট রাগে বলল, 'তুই তো বলবিই। নিজে পালাচ্ছিস কিনা।'

হেড মিস্ট্রেসের ওখানে ভারী আবহাওয়াটা যেন অতসীর বুকে চেপে ছিল। এতক্ষণে, রেস্তোরাঁর এই নিরালা কোণে সহজ, চপল একটু ইয়ার্কি দিতে পেরে বেঁচেই গেল।

মায়া বলল, 'হেড মিস্ট্রেস কী বলল রে। মিশন-টিশন, বড়ো বড়ো কথা শুনিয়ে দেয়নি?'

অতসী বলল, 'দিয়েছে।'

মায়া হিতৈষীর গলায় বলল, 'ওসব কথায় কানও দিসনি। ওই পেত্নী নিজে সময়মত বর জোটাতে পারেনি, তাই সব শেয়ালকেই লেজ-কাটা হয়ে থাকতে বলে।'

অতসী নিরীহ গলায় বলল, 'বিয়ে করলেই লেজ গজায় বুঝি।'

মায়া কুপিত হয়ে বলল, 'জানি না। তোর তো একবার লেজ গজিয়েছিল, কেটে আমাদের দলে ভর্তি হয়েছিলি। আবার ছিটকে পড়তে চাইছিস। তোমার বাবা মহিমা বোঝা ভার।'

আলোচনার লঘু চাপল্য নিমেষে কেটে গেল, অন্ধকার নেমে এল অতসীর মুখে। মায়া গলায় বিষ ঢেলে দিয়ে বলল, 'তা আদিত্য মজুমদারের মত নিয়েছিস? সে ইলেকশন শেষ না হতেই তোকে যে বড় ছেড়ে দিলে?'

কঠিন কণ্ঠে অতসী বলে উঠল, 'তার মানে?'

কটু গলায় মায়া বলল, 'মানে তুই ঠিকই বুঝেছিস। তোদের কথা কারুর জানতে বাকি নেই। তা তোর বুকের পাটা আছে অতসী।'

ঠিক সেই মুহূর্তে চায়ের দোকানের একটি ছেলে পেয়ালা সরাতে না এলে দু'জনের মধ্যে কী ঘটত বলা যায় না। অতসী চট করে নিজেকে সামলে নিল,—ব্যাগ থেকে খুচরো কয়েক আনা টেবিলে ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—'চলি।'

সঙ্গে সঙ্গে মায়া ওর দু'হাত চেপে ধরল।—'মাপ কর, ভাই। হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেলেছি।'

আশেপাশের লোক ইতিমধ্যে চাইতে শুরু করছিল, হাত ছাড়াতে গেলে চেচাঁমেচি আরও বাড়বে। অতসীকে অগত্যা বসে পড়তে হল।

মায়া একটু পরেই শুরু করল, 'কাকে জোটালি বল। পয়সা আছে? সুন্দর দেখতে?'

গম্ভীর গলায় অতসী বলল, 'মায়া, অন্য কথা বলো।'

অন্তরঙ্গ তুই'য়ের ঠাণ্ডা তুমি-তে রূপান্তর লক্ষ্য করে মায়া বলল, 'তুই এখনও রাগ করে বসে আছিস। বলেছি তো, কথাটা হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছে।'

অতসী গম্ভীর হয়ে বলল, 'মনে পুষে রাখতে দোষ নেই, মুখ থেকে ফসকালেই ক্রটি, তোমাদের এই মেকি ভদ্রতায় আমি বিশ্বাস করি না মায়া।'

মায়া ধরা-ধরা গলায় বলল, 'কিছু মনে ক'র না, ভাই। ইস্কুলে তোমার কথা বলাবলি হচ্ছিল, চলে যাচ্ছ শুনে মনটা কেমন করে উঠল, ভাবলুম আসল কথাটা জেনে আসিগে যাই। যাচ্ছ ভাল, প্রার্থনা করি, আর কখনও ফিরে আসতে না হয়।'

'ফিরে আসতে হবে কেন।'

অভিজ্ঞ কণ্ঠে মায়া বলল, 'আমাদের সীমাকে মনে নেই। বিয়ে করল কলেজের এক ছোকরাকে, একসঙ্গে পড়ত, সেই থেকে ভাব। চাকরি ছেড়ে দিলে বিয়ের এক মাস আগে। বিয়ের পর বড় মুখ করে এক মাথা ঘোমটা আর চওড়া সিঁথের সিঁদুর দেখিয়ে গেল। ছ'মাস বাদেই আবার এসেছিল

এখানেই। সীতাদি বললেন চাকরিটা আবার পাওয়া যায় কি না খোঁজ নিতে এসেছিল। ওর স্বামী লড়াইয়ের কী অফিসে কাজ করত, সেই অফিস শুদ্ধ উঠে যাচ্ছে। সীমার পেটে তখন একটা বাচ্চা,—ওর অবস্থাটা কী একবার ভেবে দেখ তো?'

'পেয়েছিল চাকরি?'

'এখানে পায়নি, অন্য কোথায় পেয়েছিল শুনছি। অনেক হাঁটাহাঁটির পর। সেখানে আবার মেটার্নিটি লীভ নেই, এক মাস যেতে না যেতেই কাজে যোগ দিতে হয়েছিল, নইলে বিনে মাইনেয় উপোস দেবে কে। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল সীমার—সেদিন দেখা হয়েছিল। চেনা যায় না, শরীরের এমন হাল হয়েছে।'

'আর ওর স্বামী?'

'বাড়িতে বাচ্চা রাখছে, বাজার করছে, বৌকে সন্দেহ করছে,—মাঝে মাঝে দু'জনের কথাবার্তা বন্ধ, বেশির ভাগ সময়েই ঝগড়া।'

আরো এক কাপ করে চা ফরমাস করে মায়া বলল, 'আমাদের রেখার কেস অবিশ্যি আলাদা। সেও বিয়ে করেছিল, জানই তো, মোটামুটি ভাল অবস্থা দেখেই। গহনা পেল বাক্স ভর্তি, আলমারি বোঝাই শাড়ি। কাজ কর্ম নেই,—শুধু পায়ের ওপর পা রেখে হুকুম। আমরা প্রথম যেদিন দেখতে গেলুম, রেখার মুখ হাসিতে থৈ-থৈ, সারাক্ষণ ধরে ওর শ্বশুড়বাড়ির গল্পই শুনতে হল। ···সেই রেখাও বছর না পুরতে চাকরির খোঁজে এসেছিল।'

অতসীকে 'কেন' জিজ্ঞাসা করার সুযোগ দিতে মায়া এখানে একটু থামল। কিন্তু শ্রোত্রী প্রশ্নহীন নির্বিকার মুখে চেয়ে আছে, মায়া একটু হতাশই হল। নিজে থেকেই ফের শুরু করল, 'ভাবছ, স্বামী ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিল? তা নয়। দুশ্চরিত্র ছিল? তাও না। রেখা আমাকে বলেছে সাতটা বাজতে না বাজতেই ওর স্বামী রোজ বাসায় ফিরেছে। ক্লাব, হোটেল, রেস, কোন কিছুর দোষ ছিল না।' বলবার ভঙ্গী অকস্মাৎ রহস্যগাঢ় করে মায়া বলল, 'ওর স্বামী ওকে বাক্সে পুরে রাখতে চেয়েছিল।

'বাক্সে!'

"বাক্স বৈকী। একলা কোথাও যাবার স্বাধীনতা নেই, স্বামী কি শাশুড়ি যেদিন দয়া করে কোথাও নিয়ে যাবেন সেদিন রেখা বেরুতে পেত। দু'দিনে হাঁপিয়ে উঠল, এতদিন স্বাধীনভাবে রোজগার করেছে, কারও তোয়াক্কা রাখেনি। এই শিকলের ভার রেখা সইতে পারবে কেন। একদিন চুপে চুপে দুপুরে পালিয়ে এসেছিল। চাকরি চায়। চাকরি মানেই মুক্তি; চলাফেরার স্বাধীনতা, নিজের উপার্জন। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে সব কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিল রেখা। বলেছিল—"সপ্তাহে একটা সিনেমা, মাসে একটা শাড়ি, ছ' মাসে নতুন গহনা আর বছরে একটি ছেলে, এর বাইরেও মেয়েদের যে কিছু চাইবার থাকতে পারে, সেটা ওরা, পুরুষেরা বোঝে না কেন। বলতে পারিস মায়া কেন ওরা আমাদের গন্ধভরা রুমালের মত শুধু বুক পকেটে পুরে রাখতে চায়। মাঝে মাঝে খুশিমত নাকের কাছে ধরবে, মেয়েমানুষ কি শুধু এই।'

নিজের টীকা যোগ করে মায়া অতসীকে বলল, 'আসলে কী জান, চাকরিটাও একটা নেশার মত। ওর স্বাদ যে মেয়ে পেয়েছে তার দৃষ্টিভঙ্গীই গেছে বদলে; ঘর আর হেঁসেলে তার মন বসে না।'

'চাকরিতেই কি শান্তি আছে।' অতসী মৃদুকণ্ঠে বললে।

মায়া স্বীকার করল।—'নেই, কিন্তু মদ খাওয়াতেও তো নেই। তবু পুরুষেরা নেশা করে। না করে পারে না। আমাদেরও সেই দশা। ছেলের কাঁথা বদলান আর হাতা-বেড়ি ঠেলার মন খুইয়েছি, আবার বাইরে বেরিয়েও টিকতে পারিনে স্বস্তি পাইনে; ঘর গেছে, পথ জোটেনি, আমাদের, এ-কালের মেয়েদের, ট্র্যাজেডি কেউ বোঝে না ভাই।'

আড়াল থেকে কে সুইচ টিপে দিলে, ছোট খুপরিটা হঠাৎ ভরে গেল আলোয়। মায়া চমকে উঠে দাঁড়াল, ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'ইস সন্ধ্যে হয়ে গেছে। চল, যাই।'

'চল।' অতসীও উঠে দাঁড়াল। অবশ পায়ে যন্ত্রচালিতের মত অনুসরণ করল মায়াকে।

২২

চাকরি শেষ পর্যন্ত ছাড়তে পারেনি অতসী।

বাড়ি ফিরে সেদিন দেখল সব অন্ধকার, এমন কি, লক্ষ্মীর পটের সমুখেও জ্বলেনি আলো। রান্নাঘরে শেকল তোলা। সিঁড়িটার নিচে দুটো বেড়াল পরস্পরের টুঁটি ছেঁড়াছেঁড়ি করছে।

শোবার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে অতসী ডাকল, 'মা!' সাড়া এল না। ডাকল 'সুধা!' ঝন ঝন শব্দ হল, পালিয়ে যেতে যেতে গোটা কতক ইঁদুর ওষুধের শিশি ফেলে দিল বুঝি। অতসীর হাতঘড়িটি অতি ছোট, সময় দেখতে হলে চোখের সমুখে নিয়ে আসতে হয়, কিন্তু এখন, এই আড়ষ্ট স্তব্ধ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, তারও ভয়ার্ত টিকটিক, ক্ষীণ হৃৎস্পন্দ শোনা গেল।

আশ্চর্য, আজ গলির গ্যাসের আলোটা জ্বেলে দিতে কি ওরা ভুলে গেছে।

এই নিদ্রিত-মৃত পটভূমিতে সে একা, চরাচরে আর কেউ জেগে নেই, কিছু বেঁচে নেই, অন্তত ক্ষণিকের জন্যেও এই রকম একটা অসুস্থ সম্ভাবনা কল্পনা ক'রে অতসী শিউরে উঠল, পরমুহূর্তেই সাহস দিল নিজেকে। একা যদি, তবে ভয় কেন, কাকে। মানুষের ভয় তো অপরকে, দ্বিতীয় প্রাণসত্তাকে। নিজেকেই কি শেষ পর্যন্ত ভয় করতে শুরু করেছে অতসী।

একবার ভাবল চীৎকার করে ওঠে, একটা আর্ত স্বরের শাণিত ছুরিতে এই স্তব্ধতার কণ্ঠনালী ছিঁড়ে দেয়; আবার ভাবল পায়ের লাথিতে দূর করে দেয় এই ভালুক অন্ধকারটাকে। পা উঠল না, অতসী স্থির জেনেছে, এই জানোয়ারটা পদাঘাতেও দূর হবে না, হয়ত দু-পা সরে যাবে, তার পর থাবা তুলে, হিংস্র দাঁত বিস্তার করে অতসীকেই তাড়া করে আসবে। সেই ভয়াল রূপটি সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতেই যেন অতসী চোখ বুঁজল।

চোখ মেলল অতসী, এবার মনে হল সে তো একা নয়। এই তো সে বিপুল, মহামহিম, এক আদিম পুরুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আভূমিনত দীর্ঘ দেহ, নিশ্চক্ষু সেই পুরুষের সর্বাঙ্গ কাকোল-কালো আলখাল্লায় আবৃত, মুখে কথা নেই, হাতে একটিমাত্র ঘোলাটে-চাঁদ টর্চ। সেই টর্চ বার বার মুখে ফেলে সে বুঝি অতসীর বুকের কথাটিও পড়ে নেবে।

কণ্টকিত দেহ থরথর কেঁপে উঠল, কোনমতে দেয়াল ধরে অতসী সামলে নিল। কিছুটা শব্দ, হয়ত কিছুটা উত্তাপ সৃষ্টি করতে, পাপোষে বারকয়েক পা ঘষল। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে জ্বালিয়ে দিল আলো।

দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে সুধা শুয়ে। জেগে আছে, না ঘুমিয়ে, বোঝবার উপায় নেই। বিছানার চাদরটা ময়লা, কোঁচকান, পাশে-রাখা টেবিলে একটা কাৎ হয়ে পড়া শিশি থেকে ওষুধ গড়িয়ে গড়িয়ে ঢাকনিটা ভিজে যাচ্ছে। মেজেয় ধুলো, এখানে-ওখানে ছেঁড়া কাগজের টুকরো, আজ সারাদিন বোধ হয় ঝাঁটও পড়েনি।

অতসী আলগোছে কপালে হাত দিল সুধার। জ্বর তো নেই। চাপা গলায় আবার ডাকল, 'সুধা!'

পাশ ফিরলো সুধা, চোখ রগড়ে বিছানায় উঠে বসল, 'ফুলমাসি!'

অতসী ছাড়া এই মৃত-নিথর বাড়িতে এতক্ষণ যেন দ্বিতীয় প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না, সুধা জেগে উঠে অতসীর ভয় ঘুচিয়ে দিল।

'এখন ঘুমোচ্ছিস, কিরে! মা কই।'

সুধার ঘুমের ঘোর তখনও কাটেনি, বললে, 'জানিনে তো ফুলমাসি। ও-ঘরে নেই?'

অতসী বলল, 'কী জানি, দেখিনি। ডেকে ডেকে কারও সাড়া পেলুম না, গোটা বাড়িটা থমথমে, চুপ। ছোড়দাও অফিস থেকে ফেরেনি?'

'ফিরেছিল তো ফুলমাসি! ছোটমামা আজ বেলা থাকতেই ফিরে এসেছিল। তখন বোধ হয় তিনটে হবে। এসেই ও-ঘরে ডেকে নিয়ে গেল দিদিমাকে। দুজনে চুপে চুপে কী কথা হল, একটু পরেই দিদিমাকে

কেঁদে উঠতে শুনলুম, ছোটমামা কড়া গলায় ধমক দিয়ে উঠল, 'চুপ কর।' খানিক পরেই সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হল, বুঝলুম ছোটমামা নেমে যাচ্ছে।'

'আর মা?'

'দিদিমাকে আর দেখিনি।'

মা আর আসেইনি এ-ঘরে? সন্ধ্যাবেলা আলো জ্বলেনি, ওকে ওষুধ পর্যন্ত দিয়ে যায়নি?

'দিদিমা রান্নাঘরে নেই?'

অতসী বলল, 'রান্নঘরের দরজায় শেকল তোলা।'

অস্বচ্ছন্দ, আড়ষ্ট কয়েকটি মুহূর্ত কাটল। ততক্ষণ নারকেল গাছের পাতার ফাঁকে মাতালের চোখের মত ঘোলাটে চাঁদ উঁকি দিয়েছে, থেমে গেছে সিঁড়ির নিচে দুটি বেরালের টুটি ছেঁড়াছেঁড়ি।

'তুই ঘুমো।' আলোটা ফের নিবিয়ে দিল অতসী, বারান্দায় এসে দাঁড়াল। অন্ধকার অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে, অতসী ভেবে পেল না, প্রথমবার অত ভয় পেয়েছিল কেন। রাতটা এখন আর ভয়ঙ্কর কোন কৃষ্ণ শ্বাপদ নয়, বরং মৃদু জ্যোৎস্নায় ভিজে সাদা বেরালটি যেন, হৃষ্ট, শান্ত, নির্জীব। মাঝে মাঝে হিমের ছোঁয়াচ তার রোঁয়াগুলো কেঁপে কেঁপে ফুলে উঠছে, বুকের ভিতর থেকে শব্দ উঠছে ঘর্ঘর। একটু কান পেতে থেকে অতসী টের পেল, বেরালের বুকের ঘর্ঘর নয়, ওটা অনেক দূরে, সদর রাস্তায় ট্রামের চাকা টেনে টেনে চলার শব্দ।

সেই বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল অতসী, অনেকক্ষণ পরে অতি ক্ষীণ একটা কান্নার শব্দ এল কানে। একটানা একঘেয়ে শ্রান্ত কণ্ঠ, হেলে-পড়া কলসীর কানা বেয়ে শীর্ণ একটি ধারা যেন গড়িয়ে যাচ্ছে! এই পুঞ্জ স্তব্ধতা আর নিবিড় অন্ধকারের মত, অন্ধকারের সঙ্গে, তার অঙ্গ হয়ে, এই কান্নাও বুঝি এতক্ষণ ছিল, অতসী শুনতে পায়নি।

ক্ষীণসূতো কান্নার রেখা ধরে ধরে অতসী উঠে এল ছাদে, চিলেকোঠার

সামনে থমকে দাঁড়াল। সামনে, মেজের লুণ্ঠিত একটা কাপড়ের স্তূপ, আপাত-নিশ্চল, কিন্তু কান্নার উৎস যে ওখানেই, সন্দেহ নেই।

অতসী ডাকল, 'মা।'

কাপড়ের পুঁটলি নড়ে উঠল, নিমেষে কান্না গেল থেমে। মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন মা, অতসীর পা দুটোর ওপর আছড়ে পড়লেন।

—'কী হয়েছে বল তো, মা।'

—'চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলি অতসী? আমাকে সত্যি করে বল।'

শরীর কঠিন হয়ে উঠল অতসীর, পা দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়াল। ও, এই। এর জন্যে এত।

অনেক দিনের পুরোনো, ঝাপসা একটা ছবি মনে এল। বিয়ের পর মাস না ফুরোতেই অতসী যেদিন ফিরে এসেছিল। সেদিনও সন্ধ্যা হিম-মলিন, গলিতে গ্যাসের আলো জ্বলেছে কি জ্বলেনি। যাবার দিন কত শঙ্খরব, উলুধ্বনি, কিন্তু অতসী ফিরে এসেছিল নিঃশব্দে। চৌকাঠের উপর আধো-অন্ধকারে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। ভয়ে ভয়ে, মুদিতপ্রায় গলায় ডেকেছিল, 'মা।'

তখনো পরনে ছিল রক্তাম্বর, সীমন্ত জুড়ে সিঁদুর-রেখা।

মা চমকে উঠেছিলেন। ফিরে চেয়ে বলেছিলেন, 'একী, অতসী!' তাড়াতাড়ি আলো জেলে দেখেছিলেন মেয়ের মুখ। ত্রস্ত স্বরে বলেছিলেন, 'জামাই আসেনি?'

অতসীর মাথা নিচু, থরথর করে কাঁপছিল। জবাব দেয়নি।

জেরা চলেছিল অনেকক্ষণ ধরে। অতসী কোনটার উত্তর দিল কোনটার বা দিল না। শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করতে পারল না, ভেঙে পড়ল, আকুল গলায় বলল, 'তোমার পায়ে পড়ি মা, এখন আর কিছু জিজ্ঞাসা কর না। কাল সব বলব। এইটুকু শুধু জানিয়ে রাখি, শ্বশুরবাড়ি আর ফিরে যাব না।'

'আর ফিরবি না!' পা ছুটি সরিয়ে নিয়ে মা ছুটি মাত্র কথা উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন।

তারপর অতসী খুলেছিল রক্তাম্বর, সীমন্তের সিঁদুর মুছে ফেলেছিল।

সেদিন সে মার পা ছুটি জড়িয়ে ধরেছিল, আজ মা আছড়ে পড়েছেন তার পায়ের কাছে, তবু ছুটো দৃশ্যের মধ্যে কোথায় যেন সাদৃশ্য আছে।

'শশাঙ্কর চাকরি গেছে।' বিহ্বল অতসী মাকে একটু পরে বলতে শুনল।

'গেল কেন?'

'কী জানি। ছ'পুরে এসেছিল, খবরটা জানিয়েই উধাও হল, এখনও ফেরেনি।'

অতি সূক্ষ্ম ধারায় হিম ঝরছে আকাশ থেকে। সদর রাস্তার কোলাহলও যেন সংযত হয়ে এসেছে। কে যেন সারাদিন শব্দের কড়ির দান ফেলে ফেলে খেলছিল, এখন ফের সব কুড়িয়ে নিয়ে থলিতে পুরছে! একটা দিক্‌ভ্রান্ত রাতপাখি নারকেল পাতায় মুহূর্তের জন্যে আন্দোলন তুলে ফের উড়ে গেল। অন্যমনা অতসী অলস চেতনা দিয়েও মাকে বলতে শুনল, 'এবারে কী হবে মা, আমরা উপোস করব? চাকরিতে আর তো ফিরে যাবিনি তুই?'

সঙ্গে সঙ্গে অতসী সেদিনের সঙ্গে আজকের কোথায় মিল, সেটা আবিষ্কার করল। সেদিন মা বলেছিলেন, 'শ্বশুরবাড়ি আর ফিরবি নে'; আজকের কথাটা তারই প্রতিধ্বনি।

একটু তফাৎও আছে। সেদিন মা শুধু অতসীর ভবিষ্যৎ ভেবেই ব্যাকুল হয়েছিলেন। তারপর এই ক'বছরে নানা আঘাতে, তাপে মাতৃস্নেহের সবটুকু রস ঝরে গিয়ে মা আত্মসর্বস্ব আমসিতে পরিণত হয়েছেন। এখন ভাবছেন শুধু নিজের কথা, নিজের ভবিষ্যৎ।

ভবিষ্যৎ? জীবনের তিনভাগ কেটে গিয়ে একভাগ মাত্র যার অবশিষ্ট আছে, তারও ভবিষ্যৎ চিন্তা? আছে বই কি। ভবিষ্যৎ নেই বলেই তো চিন্তা আছে। সীতাদির কথাটাও মনে পড়ল অতসীর, আদিত্য নীলাদ্রি সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তা-ও। সব সাধের শেষ আছে, বেঁচে থাকার নেই।

সব ভালবাসা ফুরোয়, মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃপ্রীতি, পত্নীপ্রেম—একটির পর একটি পাতা খসে পড়ে—শেষ পর্যন্ত যে নগ্ন, নিষ্পত্র, গুঁড়িটা টিকে থাকে, সেটা আত্মপ্রীতি। ফুলের ইন্দ্রজাল নেই, পাতার সজ্জা নেই, ফলের সমারোহও না; চঞ্চুক্ষত বাকল, কোটরে কোটরে সাপ, তবু সে মরতে চায় না, যায় না সূর্যস্নানের নেশা, সহস্র শিকড়ের জিহ্বা মেলে মৃত্তিকা-রস-পিপাসা।

চাকরি ছাড়ার সঙ্কল্পের ভিত্তি কখন যে শিথিল হল, অতসী নিজেই টের পেল না।

শশাঙ্ক সেদিন বাড়ি ফেরেনি, পরদিন সকালেও না। বিকালের দিকে কয়েক মিনিটের জন্যে এসেছিল, হঠাৎ অতসীর মুখোমুখি পড়ে গেল।

'তোর কি এখন খুব কাজ আছে, অতসী।'

'না। কেন বল তো।'

শশাঙ্ক ইতস্তত: করল কিছুক্ষণ, বলল, 'তোর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

'বল।'

অভয় পেয়েও শশাঙ্ক সাহস পেল না। রুক্ষ, বিপর্যস্ত চুলে একবার হাত বুলিয়ে আনল, আঙুল টেনে পরীক্ষা করল চোখের কোলের গভীরতা কত।

অতসী বলল, 'তুমি পারবে না ছোড়দা। আচ্ছা, আমিই জেরা করছি, তুমি শুধু জবাব দিয়ে যাও। তোমার চাকরি গেছে?'

সোজাসুজি প্রশ্নে শশাঙ্ক কেমন বিব্রত হয়ে পড়ল। বলল, 'যায়নি, নোটিশ দিয়েছে।'

'ওই একই কথা হল। কেন দিয়েছে জান!'

'জানি।' বলে শশাঙ্ক কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর সব দ্বিধা ঠেলে বলে উঠল, 'অতসী, তুই আমাকে বাঁচাতে পারিস।'

বাঁচান, আবার সেই বাঁচান। অতি তিক্ত যে কথাটা অতসীর মুখে এসেছিল, সেটা খানিকটা বাঁকা হাসিতে রূপান্তরিত হয়ে অতসীর ঠোঁটে লেগে রইল।—'কী করে।'

অতসীর ঠাণ্ডা চোখের দিকে চেয়ে শশাঙ্ক কথাটা ব্যক্ত করতে পারল না।
—'আজ থাক অতসী, কাল বলব।'

অস্থির উদ্‌ভ্রান্তের মত শশাঙ্ক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অতসী বিস্মিত হয়ে সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আয়নার সমুখে দাঁড়াল। তাকেও আবার এখনি বেরতে হবে।

•

শশাঙ্ক বলতে পারেনি, বলল কেতকী।

আদিত্যের বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখেছিল একটি মেয়ে গেটের বাইরে ঘোরাঘুরি করছে। ওকে দেখেই মেয়েটি সরে দাঁড়াল, কী যেন বলতে চাইল, কিন্তু অতসী ততক্ষণে কিছুটা এগিয়ে গেছে। খানিকটা গিয়েই মনে হল, কে যেন পিছু নিয়েছে। ফিরে চেয়ে দেখল মেয়েটি।

কালো রঙটাকে ধূসর করবার চেষ্টামাত্র নেই, রোগা, ভাঙা-ভাঙা গাল, কিন্তু চোখ দুটিতে তীব্র একটা জ্যোতি। বলল, 'আপনি—আপনিই কি অতসী মিত্র।'

অতসী বলল, 'হ্যাঁ। আপনার কি চাই বলুন তো।'

আন্দাজেই অবশ্য ধরে নিয়েছিল মেয়েটির প্রয়োজন কী। দুস্থ মেয়ে হয়ত ইলেকশনে ক্যানভাসার হতে চায়।

মেয়েটি বলল, 'আমার নাম কেতকী সোম। অতসীদি, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে। এই পার্কটায় একটু বসবেন?'

আত্মীয় সম্বোধনে অতসী বিস্মিত, ততোধিক বিব্রত হয়ে পড়ল। বলতেই হল, 'বেশ, আসুন।'

কেতকী বলল, 'আপনি বলবেন না, আমি আপনার ছোট বোনের মত। অতসীদি, শশাঙ্কদা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে।'

অতসীর বিস্ময় ক্রমশ বাড়ছিল। শশাঙ্ক, তার ছোড়দা, পাঠিয়েছে কেতকীকে!

চতুর কেতকী অতসীর মনের কথা বুঝে নিয়ে বলল, 'আপনি অবাক হচ্ছেন,

আমি শশাঙ্কদাকে কি করে চিনলুম, তাই না? শশাঙ্কদাকে আমরা অনেকদিন থেকে চিনি। উনি আর আমার দাদা এক অফিসে কাজ করেন।'

অতসী বলল, 'ও।'

তীব্র কিন্তু কালো দুটি চোখ অতসীর মুখের উপর রেখে কেতকী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। কথার খেই হারিয়ে গেছে, মনে মনে খুঁজছে কী দিয়ে ফের শুরু করা যায়। ঝরে-পড়া একটা কৃষ্ণচূড়ার ডাল কুড়িয়ে নিল কেতকী, শুকনো বিবর্ণ ফুলটির পাপড়ি খুঁটতে থাকল। তারপর হঠাৎ ঝোঁক দিয়ে বলে উঠল, 'শশাঙ্কদাকে নোটিশ দিয়েছে, জানেন অতসীদি।'

অতসী বলল, 'জানি।'

কেতকী বলল, 'কেন দিয়েছে জানেন না। আপনার জন্যে, অতসীদি।'

'আমার জন্যে।' এতক্ষণ বিস্ময়মাত্র ছিল, এবার অতসীর স্তম্ভিত হবার পালা।

কেতকী বলল, 'আপনারই জন্যে। শশাঙ্কদা যে অফিসে কাজ করেন, প্রভাত মল্লিক তার একজন বড় অংশীদার, জানেন তো। ওরা কী করে টের পেয়েছেন, আপনি আদিত্য মজুমদারের দলের লোক, তার হয়ে কাজ করছেন।'

অতসী চটে উঠতে গিয়ে হেসে ফেলল।—'অদ্ভুত বিচার তো। বোনের জন্যে ভাই সাজা পাবে?'

কেতকী হঠাৎ অতসীর হাত দুখানা মুঠো করে চেপে ধরল।—'আপনি আদিত্য মজুমদারের কাজ ছেড়ে দিন অতসীদি, আমার, আমাদের সর্বনাশ করবেন না।'

'তোমার সর্বনাশ, তোমাদের সর্বনাশ?' অতসী কেতকীর দুর্বোধ্য কথাটারই পুনরুক্তি করল।

মাথা নিচু করল কেতকী। ধীরে ধীরে বলল, 'শশাঙ্কদা আমাকে বিয়ে করবেন।'

অতসীর হাত তখনও কেতকীর মুঠিতে, দুর্বল, লিকলিকে, প্রস্ফুটশিরা

দুখানি হাত, কেতকী কাঁপছে। অতসী ইচ্ছে হলে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতে পারত, নিল না, পারল না।

একটু পরে কঠিন গলায় বলে উঠল, 'তোমরা নিজেরাই এ-বিয়ে ঠিক করেছ বুঝি।'

কেতকী চোখ তুলে তাকাল। কালো দুটি আঁখিতারকা এখন অশ্রুবাষ্পাভ, হয়ত সেই জন্যেই দৃষ্টি কিছু স্নিগ্ধ। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আমার মা, বাবা, দাদা সব জানেন।'

'তোমার মা, বাবা, দাদা।' কী নিষ্ঠুরতায় যে পেয়েছে অতসীকে, তীব্র গলায় বলল, 'আর আমরা বুঝি কেউ না, কিছু না?'

অতসীর হাত দুটিতে আবার গভীর চাপ দিল কেতকী, অনুনয় স্বরে বলল 'অভিমানের সময় এটা নয় অতসীদি। আপনি যদি মুখ তুলে না চান, কালকেই শশাঙ্কদাকে পথে দাঁড়াতে হবে, আর, আর—'

'আর তোমাদের দুজনের একসঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হবে, না?'

কেতকী উত্তর দিল না, কিন্তু ওর কালো, কোমল দুটি চোখ উপচে জলের কয়েকটি ঈষদুষ্ণ ফোঁটা অতসীর করপল্লবে টপ টপ করে পড়ল। অতসী হাত সরিয়ে নিল না, আচ্ছন্ন, অবসন্ন দেহে পার্কের সেই নির্জন কোণে বসে বড় রাস্তার দ্রুতবহ প্রাণস্রোতের দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল। গাড়ির পর গাড়ি পরস্পরের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে চলেছে, একটা রিক্সা বুঝি টক্কর খেয়ে পড়ল রাস্তার পাশে, মুহূর্তে সেটাকে ঘিরে ছোট খাটো ভিড় জমে গেল। পার্কের পাশে কখন একটা মোটর এসে থামল, পৃথুদেহ এক ভদ্রলোক নামলেন, শিষ দিলেন একবার, সঙ্গে সঙ্গে একটা কুকুর গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ল। নেমেই কুকুরটা অলক্ষ্য কাকে তাড়া করে ছুটতে শুরু করেছিল, ভদ্রলোক তাড়া দিলেন, কুকুরটা অমনি থমকে দাঁড়াল, তেমনি লাফাতে লাফাতে ফিরে এসে শুঁকতে থাকল ভদ্রলোকটির চটিজুতো।

'আশ্চর্য ট্রেনিং', কেতকী আপন মনে বলল।

কিন্তু অতসীর মনে হল, ট্রেনিং আশ্চর্য নয়, কুকুরটাও নয়, ভদ্রলোকই

আশ্চর্য। নিজের প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়ে এই জন্তুটির সব ইচ্ছা, স্বভাবপ্রবণতা শৃঙ্খলিত করে রেখেছেন। ভদ্রলোকটির বিপুল দেহ ধীরে ধীরে ছায়ায় মিলিয়ে গেল, তবু যেন গেল না, সেখানে অতসী দেখতে পেল অন্য দুটি লোক; তাদের মুখ দেখা যায় না; কিন্তু ভঙ্গীটা অতসী চেনে। ওই ভদ্রলোকটির মত এঁরা প্রায়-ঐশী ক্ষমতার অধিকারী—একটু শিষ, একটু অঙ্গুলি হেলনে নিয়ন্ত্রণ করছে অতসী, কেতকী, শশাঙ্ক এবং ঈশ্বর জানেন, আরও কতজনের জীবন। তাঁদের নালবাঁধান জুতোর নিচে বশীভূত পশুবৎ অসংখ্য মানুষের ছোট ছোট আশা, বাসনা, ভালবাসা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।

বহুদিন পরে মল্লিকাকে মনে পড়ল অতসীর। সেই গ্রামান্তরিত মেয়েটি অনেক ভাল আছে। সেখানে দৈন্য আছে, হীনতা নেই; ক্লেশ আছে গ্লানি নেই। আর, সবচেয়ে যা স্বস্তির, আদিত্য মজুমদার আর প্রভাত মল্লিকেরা নেই।

১

প্রথম দিন ভাল লেগেছিল। শেয়ালদা ইস্টিশানের আলো, রাস্তায় সারিসারি গাড়ি, কাতারে কাতারে লোক, চিড়িয়াখানা, গড়ের মাঠ।

তারপর সেই ভাল লাগাটুকু যেন দেশলাইয়ের মত ফস করে জ্বলে উঠেই নিবে গেছে।

এই মাটিহারানো, আকাশখোয়ানো শহরটাকে সুধার মোটে পছন্দ না। পর পর সাজানো লোহা-কাঠের কতগুলো খাঁচা, এরা তার নাম দিয়েছে কলকাতা।

কল টিপলে জল, বোতাম ছুঁলে আলো। হ'ক তবু ভাল না। কেমন চাপা-চাপা, ছাইছাই অন্ধকার, সর্বক্ষণই যেন একটা বিষণ্ণ বিকেল। দোতলা পর্যন্ত সিঁড়িটা পাকা, শানবাঁধান, তারপর লোহার, কর্কস্ক্রুর মত বাঁকোনো। প্রথম দিনই সুধা পা টিপে টিপে উঠে এসে পেয়ে গেছে চিলেকুঠিটাকে; সেখানে ভাঙা তোরঙ, ছেঁড়া তোষকের স্তূপ। তার পরেই ছাত।

ছুটি পেলেই সুধা ছাতে চলে আসে। নিচের সিঁড়িটা তরতর করে, ওপরেরটার রেলিং ধরে ধরে। কার্নিসের ওপর ঝুঁকে নারকেল গাছটা ছুঁতে যায়।

নাগাল পায় না। মাটি থেকে সোজা উঠে এসেছে গাছটা, দেয়াল শুঁকে শুঁকে দোতলা অবধি উঠেছে। তারপর কী খেয়ালে কে জানে, ঘাড় এলিয়ে দিয়েছে পশ্চিমে, গলিটা কোণাকুণি পাড়ি দিয়ে ও-পাশের সিকদার বাড়ির মাথায় ছাতা ধরেছে।

সারাদিন ঝরঝর থথর, কাঁপে পাতাপত্তর। সারাদিন তো কাঁপে না। মাঝে মাঝে নারকেল গাছটা ভাবুকের মত এমন থম ধরে যায়, বাতাস কানের কাছে ফিস ফিস করেও সাড়া পায় না। সুধার গা ছমছম করে তখন।

এখন ঝাঁঝাঁ দুপুর, গলি নিঝুম, নিচে কলতলায় পাইপ থেকে চুইয়ে পড়া জলের শব্দটুকু পর্যন্ত শোনা যায়। কোথায়, কতদূরে ডাকছে কর্কশ একটা কাক; শেষ সওয়ারি নামিয়ে দিয়ে একটা রিক্সা গলিপথে ঘরে ফিরে এল।

নড়ে না শুধু নারকেল গাছটা। আকাশসাঁতারক্লান্ত একটা চিল এসে বসল, ফের উড়ে গেল, পাতাগুলো একবার কাঁপল শুধু। হাতী যেন কুলোর মত কান নাড়িয়ে মাছি তাড়াল একটা।

কে জানে গাছটা এত গম্ভীর কেন। এই শহরটা ওরও বুঝি পছন্দ না। সব ছেড়ে, ছিঁড়ে পালাতে চায়, কিন্তু পথ কই। সহস্র শিকড়ের শিকলে বাঁধা আছে জন্মাবধি, একটু বয়স হতেই এক পায়ে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়েছে আকাশে। ভরগোড়ালি কৌতূহল, দেখে নেবে কী আছে এই ইঁটকাঠচুণসুরকির ওপারে।

আছে, পাখি আছে, আর আকাশ, সকালে পানটুকটুকে, বিকেলে সিঁদুর।

'এই, এই।'

ছোট্ট একটা ঢিল গড়িয়ে পড়ল সুধার পায়ের কাছে, আর একটু হলে হয়ত লাগত। চমকে সুধা দু'পা পিছিয়ে গেল, কিন্তু চোখাচোখিও হল সঙ্গে সঙ্গে।

'এই।'

ও-বাড়ির জানালায় একটা মেয়ে, পিঠের নীচে বালিশ জড়ো করে বসেছে। সুধা জানে ওর নাম নূপুর।

কার্নিসের ওপর ঝুঁকে সুধা বললে, 'কী।'

'এস না ভাই, আমাদের বাড়ি।'

সুধা এদিক ওদিক তাকাল। কেউ নেই।

কেউ নেই, কিন্তু নিষেধ আছে। ফুলমাসি অফিসে যাবার সময় বারবার বলে গেছেন, বাড়ির বাইরে যেও না। নিচের ঘরে দিদিমার পাহারা আছে।

সুধা ইশারায় বললে, এখন না।

'এস না! পুতুল দেব।' নুপুর তিনটে আঙুল তুলে দেখালে। অর্থাৎ তিনটে পুতুল দেবে।

এ-বাড়ির ছাত থেকে ওদের ঘরের ভেতরটা কেমন অন্ধকার লাগে, তবু সুধা দেখতে পেয়েছে কাচের আলমারিটা, থাকে থাকে সাজান খেলনা, ডল পুতুল।

ওরই তিনটে দিয়ে দেবে। কেমন দেওয়া। বরাবরের মত। মা যেমন সুধাকে দিয়েছে ফুলমাসির হাতে। জন্মের মত।

সুধার ডল পুতুল নেই। গ্রামের বাড়িতে খেলনাই ছিল না। তবু সুধা ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলী কয়েকটা তৈরি করেছিল। কুচ্ছিত, তবু তো মেয়ে। মার চোখে সব মেয়েই সমান।

সমান? নিঃসঙ্গ নারকেল গাছটার দিকে চেয়ে সুধা কী যেন ভাবল। একটু একটু করে চোখের পাতা ভিজে উঠল। সমান যদি, তবে কেন মা পর করে দিয়েছেন সুধাকে। ফুলমাসি তো মার কাছে যে-কোন একটা মেয়ে চেয়েছিলেন। মা দিতে পারতেন লতুকে, পীতুকে, বিনুকে। বেছে বেছে সুধাকেই দিলেন কেন?

'সুধা, ও সুধা।'

দিদিমার গলা। ঘুম ভেঙে ওকে দেখতে না পেয়ে ডাকছে। ডাকুক, সুধা সাড়া দেবে না। বুড়ির সাধ্য নেই, লোহার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে আসে।

'কী ভাই, আসবে।'

নূপুর এখনও হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

'সুধা, ও সুধা।'

থপথপে শরীরটা নিয়ে দিদিমা বুঝি সিঁড়িটার ঠিক নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। উদ্দেশে একবার ভেংচি কেটে সুধা নিচে নামতে শুরু করল।

'একটু চোখ বুঁজেছি, অমনি পালিয়েছিস।'

'পালাইনি তো, ছাতে গিয়েছিলাম। জানো দিদিমা, কাকগুলো খালি আচারে এসে বসছে।'

'স্কুলমাসি অঙ্ক কষতে বলে গেছে না ?'

'কষেছি তো—অনেকগুলো। ক'টার উত্তর মিলছে না। দিদিমা তুমি একবারটি দেখিয়ে দাও না।'

এটুকু সুধার চালাকি। দিদিমা গুণ ভাগ জানে না।

'চোখে কি দেখতে পাই রে। আন্‌তো আমার চশমা। কিত্তিবাস পড়ি। তুই বরং গোটা দুই পাকা চুল তুলে দে।'

হাঁটু ভেঙে সুধা বসল মাথার কাছে। 'কত দেবে বল।'

'দশটায় এক পয়সা।'

'না, পাঁচটায়।'

'আচ্ছা, পাঁচটাতেই পাবি। আগে তোল দিকিনি।'

'আগে দাও।'

আঁচলের খুঁট খুলে বুড়ি এক আনা বার করলে। কুড়িটা চুল তুলবি কিন্তু গুণে গুণে।

দু' চারটে চুল তুলতে না তুলতেই বুড়ির চোখ আরামে বুঁজে এল, একটু পরেই নাকের আর দেয়ালঘড়িটার ঘর্ঘর একাকার হয়ে গেল।

তারপর ঝুমঝুমি বাজিয়ে একটা লোক বাঁদর নাচ দেখাতে এল, গলির মুখে শোনা গেল বাসনউলির হাঁক। সদর দরজা একটু ফাঁক করে সুধা দেখছিল। পরনে ঘাঘরা, হাতের কব্‌জি থেকে বাহুমূল অবধি উল্কির দাগ।

'বাসন লেবে ?'

সুধা ঘাড় নেড়ে জানালে নেবে না, তারপর ভয়ে ভয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে। একটু পরে উঁকি দিয়ে দেখলে বাসনউলি চলে গেছে। তখন পা টিপে টিপে চৌকাঠের বাইরে এল।

ও-বাড়ির দরজায় যখন টোকা দিলে তখনও হাঁটু দুটো কাঁপছে। খিল দেওয়া ছিল, খুলে দিলে একটা ঝি। কোমরে আঁচল শক্ত করে বাঁধা, হাতে ছাইমাখা শুকনো শালপাতা, বোধহয় বাসন মাজছিল।

সুধা বললে, 'নূপুর ?'

ঝি বললে, 'দিদিমণি ? ওপরে।' ইঙ্গিতে সিঁড়ি দেখিয়ে দিলে।

পায়ে ধুলো, জামাটাও বিশেষ ফর্সা নয়, সুধা একটা টুলে বসতে যাচ্ছিল, নূপুর ওকে বিছানায় টেনে বসালে। কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে, 'এতক্ষণে এলে। আমি কখন থেকে বসে আছি।'

ধবধবে বিছানা নূপুরের, কোমর অবধি একটা চাদর, পিঠের নিচে—এক···ছুই···তিন···চারটে বালিশ। এত আরাম, তবু দীপ্তি নেই চোখের মণিতে, অবশ হাত ছুটিতে প্রাণ নেই।

সেই হাত ছু'টি দিয়ে নূপুর সুধার হাত চেপে ধরল। 'কী দেখছ।'

'তুমি কী ফর্সা, ভাই।'

স্থির কাল চোখ ছু'টি ওর চোখে রেখে নূপুর বললে, 'ফর্সা নয়, ফ্যাকাশে। আমার গায়ে এক ফোঁটা রক্ত নেই। দেখছ না, কতগুলো ওষুধের শিশি জমে গেছে। এর ওপর ইঞ্জেকশন আছে। তবু তো রক্ত হয় না। দেখ না আমার হাতখানা টিপে।'

সুধা আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিল, তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'ডল পুতুল কখন দেবে।'

বলেই বুঝল ভুল হয়ে গেছে। এখুনি কথাটা তোলা ঠিক হয়নি। আঙুল বুলিয়ে দেওয়া উচিত ছিল হাতে, অন্তত একবারটি আহা বলা উচিত ছিল।

বিছানার নিচে থেকে নূপুর চাবি বার করে দিল। 'খুলে নাও ভাই। সব আলমারিতে আছে। আমি তো উঠতে পারিনে।'

'উঠতে পার না ?'

না। ছোটবেলা কী অসুখ হয়েছিল, তারপর থেকেই নূপুরের পা ছু'টো শুকিয়ে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। 'হাঁটাচলা দূরে থাক, ও দুটো নাড়তে পর্যন্ত পারিনে। দেখবে ?'

কোমর থেকে নূপুর চাদরটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে ঠেলতে শুরু করলে। সুধা মুখ ফিরিয়ে নিলে। ওর দেখার সাহস নেই। এতক্ষণে স্পষ্ট

বোঝা যাচ্ছে, কেন পিঠের নিচে বালিশ জড়ো করে মেয়েটা সারাদিন আধশোয়া হয়ে থাকে বিছানায়, জানালা দিয়ে কেন রাস্তায় চেয়ে থাকে।

'চেয়ে দেখ না! আমি দিনরাত সইতে পারছি, আর তুমি চাইতে পর্যন্ত পারছ না?'

সুধা ঘাড় ফেরালে। কোমর পর্যন্ত তবু একটু মাংসের আভাস আছে নূপুরের শরীরে, তার পরে, ফ্রকটা সরে গেছে, সিল্কের একটা জাঙ্গিয়া, আর ঠিক তার নিচে থেকেই পা দুটো কে যেন নিষ্ঠুরভাবে দুমড়ে, বাঁকিয়ে কাঠিসার করে দিয়েছে।

'সারবে না?' সুধা ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল।

'কই আর সারে। ডাক্তারগুলো রোজ আসে যায়, ওষুধ দেয়, ইঞ্জেকশন দেয়, টাকা নেয়। কী রোগ তাই ওরা ধরতে পারেনি। বাকী জীবনটা হয়ত আমাকে বিছানায় শুয়েই কাটাতে হবে।

জীবন। জীবন কী। শ্বাস নেওয়া, শোয়া, বসা, হাঁটা, চলা, খাওয়া এর নামই জীবন। মা-মাসি-দিদিমার কাছে রোজ কথাটা শুনে শুনে সুধা মানে জেনেছে। কিন্তু নিজে কখনও শব্দটা ব্যবহার করেনি। আজ সমবয়সী একটি মেয়ের মুখে জীবন কথাটা কেমন পাকা-পাকা শোনাল। ফিক করে হেসে ফেলল সুধা। হাসিটা লুকতে মুখ ফেরাল।

'কই, ডল পুতুল নাও?'

'নিই।'

নিতে গেল বটে, কিন্তু আলমারির কাছে গিয়ে সুধার হাত সরে না। ডোমকানা যাকে বলে। সারি সারি সাজান মোমের পুতুল, তাদের দুধে-আলতা রঙ্, টানা টানা চোখ, ভ্রূ; রেশমের পোশাক, পুঁতির কাজ করা।

ওর ন্যাকড়ার পুটলীগুলোর কথা মনে পড়ল। পুরনো জুতোর বাক্সে কতদিন থেকে ঠাসাঠাসি হয়ে পড়ে আছে, আলোর মুখটুকু দেখেনি।

'বেছে নাও।'

সুধা আলমারির ডালা বন্ধ করে দিল। নেবে, তবে আজ না। পরের

জিনিস শুধু শুধু নেওয়া কি ভাল। নিজেই একটা ডল পুতুল কিনবে সুধা, দিদিমার দেওয়া পয়সা ক'টা তো এখনও হাতের মুঠোয় আছে। তারপর তার সঙ্গে বিয়ে দেবে নূপুরের যে-কোন একটা মেয়ের; বরণ করে বৌ ঘরে তুলবে।

'কত দাম ভাই, এক একটার?'

'মনে কি আছে,' নূপুর ঠোঁট উল্‌টিয়ে বললে, 'তিন-চার টাকা হবে।'

'তিন-চার টাকা! দিদিমার দেওয়া আনিটা সুধার মুঠো থেকে খসে টুপ করে বিছানায় পড়ল। নূপুর কুড়িয়ে দিল।—'তোমার পয়সা?'

সুধা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল। মনে মনে হিসাব করল এমন ক'টা আনি জমলে তবে তিন টাকা হয়।

কতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিল ঠিক নেই, নূপুরের কথায় সুধার চমক ভাঙল—'নেবে না পুতুল?'

সুধা আড়ষ্ট স্বরে বললে, 'এই যে নিই। একটা পুতুল নিলে হাত বাড়িয়ে। কোথায় রাখবে ঠিক করতে পারল না, কিছুক্ষণ এ-হাত ও-হাত করল। তারপর চলে আসতে যাবে, নূপুর খপ করে ওর কনুই চেপে ধরল। '—এক্ষুণি চলে যাবে ভাই, এক্ষুণি?'

সুধা লজ্জা পেল। পুতুল নিয়েই চলে আসবার কথা ভাবা ঠিক হয়নি। ফের বসল নূপুরের বিছানায়, ফ্রক হাঁটু পর্যন্ত টেনে দিয়ে সভ্য হল, কিন্তু তাতেও পায়ের নখগুলো ঢাকা পড়ল না। নূপুরও সেদিকে চেয়ে আছে। টের পেতেই সুধা অল্প অল্প ঘেমে উঠল, কিন্তু নূপুর কোন মন্তব্য করল না।

'বই পড়?' অনেক পরে নূপুর হঠাৎ, হয়ত কোন কথা না পেয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল।

'চারুশিক্ষা, দ্বিতীয় ভাগ।' সাঁ সাঁ করে পাখা ঘুরছে, সেদিকে চোখ রেখে সুধা বলল।

'মোটে?' নূপুরের নীল নিষ্প্রভ চোখের মণি দু'টি চকিত হয়ে উঠল,—'তোমার বয়স তো—'

'প্রায় পনেরো।' মাথা নিচু করে সুধা কোন মতে উত্তর যোগাল, 'এতদিন দেশের বাড়িতে ছিলুম ভাই, ঠিকমত পড়াশুনা হয়নি। ফুলমাসি বলেছেন আমাকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেবেন।'

'ফুলমাসি কে?'

'আমার মাসিমা। রোজ দশটায় ইস্কুলে যান, দেখনি।'

'ওহ, লেডী সমাদ্দার ইস্কুলের মাস্টারনীটাই বুঝি তোমার মাসি।'

কী একটা তাচ্ছিল্য ছিল নূপুরের কথা বলার ঢংয়ে, সুধার ভাল লাগল না।

নূপুর বলে গেল, 'তোমার মাসি। কিন্তু কিছু মনে কর না ভাই, ওটা ভারি বজ্জাত। আমাকে একবার বেত মেরেছিল।'

আলাপ করবার সবটুকু স্পৃহা উবে গিয়েছিল, তবু সুধা কতকটা যান্ত্রিক গলায় বললে, 'কেন।'

'ওই জানে। সেই থেকে, ভাই, ও-ইস্কুলে পড়াই ছেড়ে দিলুম। অন্য ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলুম, দিনকতকের জন্য। তারপর'—অলক্ষিতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল নূপুরের, 'তারপর তো অসুখে পড়লুল, ইস্কুলে পড়াই জন্মের মত ঘুচে গেল।'

'আহা।' যেটুকু তিক্ততা জমেছিল সুধার মনে, উবে গিয়ে একটা অব্যয় বেরল শুধু।—'আহা।'

'এখন বাড়িতে পড়ি। নইলে এতদিনে'—আঙুল গুণে গুণে হিসেব করে নূপুর বললে, 'নইলে এতদিনে আমার সেকেণ্ড ক্লাশে ওঠবার কথা। লেডী সমাদ্দার ইস্কুলের সব কেচ্ছাই জানি ভাই, মায়া দিদিমণি, রেখা দিদিমণি, মিনতি—সব দিদিমণির নাড়ীনক্ষত্রের খবর রাখি। ওদের মধ্যে সবচেয়ে শয়তান মায়াটা। ডুবে ডুবে জল খেত।'

একরকম ইশারা করল নূপুর, সুধা ভাল বুঝল না। অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। নূপুর তখন ভেঙে বলল, 'সতী সাবিত্রী সবাই। ডুবে ডুবে জল সবাই খেত। পেট ফুলে ঢোল হল শুধু মায়ার।' এবার নূপুর চোখ টিপল, ফ্রকের কোণটা মুখ অবধি তুলে খিল খিল একটা হাসির তোড় সামলে নিল, সুধা তবু

বুঝল না, কিন্তু কোথাও বিশ্রী একটা ইঙ্গিত আছে অনুভব করল, গায়ে কাঁটা দিল।

'আমি এবার যাই।' এই দ্বিতীয়বার সুধা বলল শুকনো স্বরে।

সঙ্গে সঙ্গে চকমকি জ্বলে উঠল নূপুরের চোখে, কৃশ লিকলিকে হাত দুটো বাড়িয়ে ধরে ফেলল সুধাকে। উঠে বসে ও কানের কাছে মুখ নামিয়ে গাঢ় ফিস ফিস গলায় বলল, 'যেতে দিলে ত। ধরে রেখে দেব তোমায়, অ-নে-ক ক্ষণ ধরে।' বলতে বলতে ভিজে গেল নূপুরের গলা, 'আমার এখানে যে আসে সেই পালাই পালাই করে কেন বল ত। খোঁড়া একটা মেয়ে, একলাটি পড়ে থাকি, তবু কেউ আমার সঙ্গে গল্প করতে চায় না। কে-উ না।' শেষ কথা দু'টো নূপুর বলল অলস, শিথিল ভঙ্গিতে, টেনে টেনে, সুধা আর আপত্তি করতে পারল না। একটি দুর্বল, অসাড়প্রত্যঙ্গ পাকামেয়ের হাতের বাঁধনে কাঠ হয়ে বসে রইল।

ঠিক তখনই বাইরে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল, পর্দার ওপাশ থেকে একজন ডাকল, 'নূপুর।'

সঙ্গে সঙ্গে নূপুরের হাত দু'টি সুধার গলা থেকে আলগা হয়ে খসে পড়ল। বুক অবধি চাদর টেনে দিয়ে শুয়ে পড়ল নূপুর, আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি এবার যাও ভাই, নিশীথ এসেছে!' সুধার সপ্রশ্ন চোখের দিকে চেয়ে নিজেই ব্যাখ্যা করে দিল, 'আমার ডাক্তার। রোজ ঠিক এই সময়ে ইঞ্জেকশন দিতে আসে।'

২

ডল পুতুলটা লুকতে পারিনি, ফুলমাসি ইস্কুল থেকে ফিরেই ওটা দেখতে পেয়েছিলেন।

'এটা কে দিলে রে।'

সুধা বললে, 'নূপুর।'

ফুলমাসি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। 'নূপুর কে।'

আঙুল দিয়ে জানালাটা দেখিয়ে সুধা বললে, 'ওই ও-বাড়ির—'

সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে উঠল ফুলমাসির মুখের পেশি।—'বুঝেছি, ওই পাকা মেয়েটা। তুই গিয়েছিলি ও-বাড়ি?'

সত্যি মিথ্যে কোনরকম জবাব দেবার অবসরও সুধার হল না, ফুলমাসি এগিয়ে এসে ওর চুলের মুঠি ধরলেন।—'কেন, কেন গিয়েছিলি ওদের বাড়ি।'

যন্ত্রণায় সুধার মুখ সাদা হয়ে গেল, দাঁতে ঠোঁট চেপে অস্ফুট একটা আর্তনাদ ঠেকালে, কিন্তু কিছুতেই সামলান গেল না চোখের জল, বড় বড় কয়েক ফোঁটা ঠিক নখ-না-কাটা পায়ের পাতা দুটির ওপর পড়ল।

ওকে ছেড়ে দিল ফুলমাসি, চেঁচিয়ে ডাকল, 'মা।'

দিদিমা বুঝি রান্নাঘরে ছিলেন, সামনে এসে দাঁড়াতেই ফুলমাসি আরও জোরে চীৎকার করে উঠল, 'তোমাকে পই পই করে বলে দিয়েছি না, সুধাকে কোথাও বেরতে দেবে না?'

'দিইনি ত।' দিদিমা লজ্জিত মুখে বললেন, কতকটা স্নায়ুভীতি থেকেই হয়ত আঁচলে হলুদমাখা হাত মুছে ফেললেন।

'দাওনি—দাওনি?' প্রায় গর্জন করে উঠল ছোটমাসি, যেন ভুলে গেছে এটা তার ইস্কুল নয়। সামান্য ছুতোতেই বেরিয়ে পড়েছে রুক্ষ, রুষ্ট মাস্টারনী।

'ওটা ভারি বজ্জাত'—পলকে নূপুরের কথাগুলো সুধার মনে পড়ে গেল, কিন্তু থেকে থেকে হাঁটু দুটো ঠক ঠক কাঁপতেই থাকল।

'দাওনি?' এক টানে ফুলমাসি মেজেয় ছুঁড়ে ফেলে দিল ডল পুতুলটা, 'তবে ও কোথা থেকে পেল ওটা। আঃ মা, এই বুড়ো বয়সেও কি তোমার মিথ্যে কথা বলার অভ্যাস যাবে না?'

'আমি মিথ্যেবাদী?' দিদিমাও দাঁড়িয়েছেন রুখে, 'তোর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা হয়েছে পেঁচি।' (ফুলমাসির নাম অতসী, কিন্তু ঝগড়ার সময় দিদিমার সেটা মনে পড়ে না, ছেলেবেলাকার অবহেলার ডাক-নামটাই ব্যবহার করেন)।

'ভেঙে দেব না আমি তোর ওই থোতা মুখের বড়াই, আমি তোরটা খাই, না পরি?'

'চুপ কর দিদিমা, ও ফুলমাসি, চুপ কর', সুধা একবার এর একবার ওর কাছে ছুটোছুটি করতে লাগল, 'চুপ কর না, ও ফুলমাসি। বলছি তো, আর কোনদিন আমি ও-বাড়ি যাব না, কক্ষণ না।'

সে-কথা শুনল না ফুলমাসি, ঠেলে দিল সুধাকে। কোমরে আঁচল বেঁধে নিয়েছে শক্ত করে, ফোঁস ফোঁস রুদ্ধশ্বাসে বলছে, 'আমারটা খাও না, পরও না তুমি?'

'না।'

'তবে কারটা খাও-পর, শুনি?'

'আমার ছেলেরটা।'

'ওরে আমার পুত্রসোহাগীরে', বিকট গলায় ফুলমাসি টিটকিরি দিয়ে উঠল, 'তবু যদি তার মাস গেলে ত্রিশটা টাকা আনার ক্ষমতাও থাকত। উদয়াস্ত খেটে মুখে রক্ত উঠে মরছি আমি, আর উনি দেখছেন ওঁর ছেলের টাকার স্বপ্ন। মুখ খসে পড়বে মা।'

'খসুক। এ-মুখে যেন তোর ভাত আর না গিলতে হয়। এ-দেহে যেন তোর দেওয়া কাপড় আর না তুলতে হয়।' দিদিমা মুখে বললেন বটে,

কিন্তু কান্না চাপা দিতে ফুলমাসির দেওয়া কাপড়টাই চোখে তুললেন। খোনা গলায় বলে যেতে লাগলেন, 'উদয়াস্ত খাটিস, সে কি আমাকে খাওয়াতে পরাতে পেঁচি। বিয়ে ত তোকে দিয়েছিলুম, সব্বস্ব বাঁধা রেখে। সে কার সুখের জন্যে লো? কপাল তোর মন্দ, স্বামী-সুখ সইল না স্বভাবের দোষে।'

সঙ্গে সঙ্গে ফুলমাসির ফণা যেন নেতিয়ে পড়ল। ব্যথিত দু'টি চোখের পাতা বিস্ফারিত করে বললে, 'স্বভাবের দোষ—আমার, মা?'

'দোষ, দোষ, দোষ। একশ' বার দোষ।'

'তুমি ত সব জান, মা। জেনে শুনে এ-কথা বলছ?'

'জানি না, কিছু জানতে চাই না। পেটের মেয়ে হয়ে তুই আমাকে ভাত-কাপড়ের খোঁটা দিস?'

গলির মুখে দু'চার জন লোক জমে গেছে, আশে-পাশের বাড়ি থেকে খুলে গেছে চার-পাঁচটা উৎকর্ণ জানালা, অনেকগুলো মাছি-মন মায়ে ঝিয়ে ঝগড়ার ব্রণ খুঁটে খেতে চায়।

তাড়াতাড়ি যে-ক'টা পারল, সুধা জানালা বন্ধ করে দিল। তারপর পাশের ঘরের বিছানায় উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ভাল না, কলকাতা ভাল না, তার লোকগুলো ভাল না, ফুলমাসি, দিদিমা—কেউ না। পুরনো কষ্টটা আবার উথলে উঠেছে বুক থেকে গলা অবধি—কেন মা পর করে দিলেন সুধাকে। ফুলমাসি ত যে-কোন একজনকেই মানুষ করে দিতে চেয়েছিল। মা দিতে পারতেন লতুকে, পীতুকে, বিলুকে, মিতুকে। বেছে বেছে সুধাকেই দিলেন কেন। এখানে সে বন্দী। নারকেল গাছটা যেমন বাঁধা আছে শিকড়ের শিকলে, সুধাও তেমনি ফুলমাসির শাসনের বেড়িতে। তার লেখাপড়া হয়ে কাজ নেই, নতুন ফ্রকের লোভ নেই। বেঁচে যায় যদি ফের ফিরে যেতে পারে সেই দেশের বাড়িতে, ছেঁড়া জামা পরে যেমন খুশি যখন খুশি ছুটোছুটি করতে পারে। কোঁচড় ভরে তুলতে পারে আকন্দ আর শিউলি, দত্তদের পাঁচিল টপকে কুল পেড়ে আনতে পারে। মা কেন তাকে সঁপে দিলেন ফুলমাসির হাতে। কেন, কেন।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল হুঁশ নেই, হঠাৎ এক সময়ে চোখ মেলে সুধা দেখল ফুলমাসি ওর শিয়রে দাঁড়িয়ে। এর মধ্যে কখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, মোড়ের গ্যাসের আলোটার চোখ দপ দপ জ্বলছে, সারাদিন ডুব সাঁতারের পর চাঁদটা হুস করে মাথা তুলেছে পশ্চিম আকাশে। আজ বুঝি তৃতীয়া।

বিকেলের বিশ্রী চেচাঁমেচির লেশমাত্র যেন ওর মনে নেই, সুধা এমন আধো-আদর গলায় বললে, 'কী, ফুলমাসি।'

'বেড়াতে যাবি? আয়।'

ফুলমাসি ওকে নিয়ে গেল কলতলায়, হাত মুখ মুছিয়ে দিল তোয়ালে দিয়ে ঘষে ঘষে। ফ্রকটাও বদলে দিতে যাবে, সুধা তখন বেঁকে বসল।

'না ফুলমাসি, আমি নিজে। তুমি বাইরে যাও একবার, যাও না?'

অতসী ফিক করে হেসে ফেলল।

'বাইরে যেতে হবে কেন রে? আমি বরং এখানেই চোখ বুঁজে থাকি, তোর হয়ে গেলে বলিস।'

সুধার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

'না, না, সে কিছুতেই হবে না। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি একটু বাইরে যাও না ফুলমাসি।'

অগত্যা অতসীকে বাইরে এসে দাঁড়াতে হল। বলল, 'তাড়াতাড়ি করবি কিন্তু।'

বেরিয়ে আসতে সুধার মিনিট দুইয়ের বেশি লাগল না। চিরুনি হাতে নিয়ে অতসী বলল, 'মাথাটা আমাকে আঁচড়ে দিতে দিবি ত, নাকি তাও তুই নিজে করবি।'

নিজে করারই ইচ্ছা ছিল সুধার, কিন্তু দু'দুবার ফুলমাসির ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করতে সাহস পেল না। বলল, 'তুমিই আঁচড়ে দাও ফুলমাসি।'

মেজেয় হাঁটু ভেঙে বসে তবে অতসী মাথায় সুধার সমান হল। ওর মাথাটা কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে জোরে জোরে চিরুনি চালাতে লাগল।

হু'একবার সুধা যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল, উঃ। অতসী তখন ধমক দিল কড়া সুরে।—'কী জট হয়েছে তোর মাথায়, ভাল করে তেল দিসনে বুঝি?'

'দিই ত ফুলমাসি।'

'ছাই দিস। কাল আমি নিজে নাইয়ে দেব তোকে।' বলেই অতসীর কী মনে পড়ে গেল, মুচকি হাসল, 'তাতে তো তোর আবার লজ্জা করবে, নারে?'

অতসীর কোলে মুখ লুকিয়ে সুধা বলল, 'না, ফুলমাসি। কাল তোমার ইস্কুল নেই?'

অতসী বলল, 'আছে। তবে আসছে রবিবার। তোর মাথায় সেদিন সোডা-সাবান ঘষে তবে তেল মাখিয়ে দেব। চল এবারে।'

'চল।' সুধা উঠে দাঁড়াল, অতসীর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি সাজবে না, ফুলমাসি।'

হাসি চেপে অতসী বলল, 'বুড়ো হতে চললুম আমি আবার সাজব কিরে।' তারপর পরনের শাড়িটার দিকে চেয়ে কী যেন ভাবল।—'আচ্ছা, দাঁড়া, এটাকে বদলে আসি।'

শেষ পর্যন্ত শুধু শাড়িটা নয়, অতসী ব্লাউজটাও বদলে এল। চিরুনি বুলিয়ে চুলটাও নিল ঠিক করে। ছোট্ট ব্যাগটা হাতে নিল।

মাস্টারনীর খসখসে খোলসটা খসে পড়েছে, স্নিগ্ধ-চিকণ একটি মেয়ে এসেছে বেরিয়ে, ওপাশের বাড়ির রেবা সিপ্রাদিদের মত। তাদের চেয়েও সুন্দর। মুগ্ধ চোখে চেয়ে থেকে সুধা বলল, 'তোমাকে কী চমৎকার দেখাচ্ছে ফুলমাসি।'

অতসী রাগ করল না, সুধার গালে আলগা একটা টোকা দিয়ে বলল, 'পাকা মেয়ে।'

বড় রাস্তায় এসে ওরা ট্রামে উঠল। ভিড় ছিল, ওদের দেখে খাকির জামা পরা লোকটা কী যেন বলল চেঁচিয়ে, দুজন লোক আসন ছেড়ে দাঁড়াল।

সুধা জানালার ধারে বসল, তার পাশে ফুলমাসি।

বড় একটা বাগান, ফুলমাসি তার নাম বলল ইডেন গার্ডেন। ছোট একটা

মন্দিরের গা ঘেঁসে আঁকা-বাঁকা একটা নালা, সেটার নাম প্যাগোডা। ফুলমাসি বলল, 'আয় এখানে বসি।'

একটা ফিরিওলা হেঁকে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে ফুলমাসি চীনেবাদাম কিনল চার পয়সার। ঘাসের ওপর সেগুলো ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'খা।'

আরও একটু পরে ফুলমাসি আইসক্রীম কিনল একটা, সুধার হাতে তুলে দিল। সুধা একটু একটু খায় আর আড়চোখে চায়। কত কাছে এসেছে ফুলমাসি। কত সহজ হয়ে গেছে। যে মানুষটা তাকে কড়া শাসনে রাখে দিনরাত; সামান্য অঙ্ক ভুল হলে বকে, বাড়ি থেকে এক পা বেরতে দেয় না, এ-যেন সে নয়।

আস্তে আস্তে অতসী একখানা হাত বাড়িয়ে ওর মাথায় রাখল।—'সুধা।'

সুধা চোখ তুলে তাকাতেই বলল, 'আজ বিকেলে তোকে বকেছি বলে রাগ করেছিস?'

সুধা মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল, না।

ওর পিঠে আলগোছে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অতসী বলল, 'নূপুরদের বাড়ি যেতে কেন মানা করি, তোকে বলতে পারব না। এটুকু জেনে রাখ, ওরা ভাল না।'

'কে ভাল না? নূপুরের ত অসুখ, দিনরাত বিছানাতেই শুয়ে থাকে।'

'নূপুরের কথা বলছি না। ওর মা।'

'ওর মা কী, ফুলমাসি?'

অতসী সংক্ষেপে আবার বলল, 'ভাল না।'

সুধা ভেবেছিল, ফুলমাসি হয়ত আরও কিছু বলবে। কিন্তু অনেকক্ষণ ওদিক থেকে কোন সাড়া এল না। নূপুরের মা ভাল না, কথাটা জানিয়ে দিয়েই অতসী চুপ করে গেছে, অনেক দূরের মাস্তুলটার দিকে নির্নিমেষ চেয়ে আছে।

আইসক্রীমটা ফুরিয়ে গিয়েছিল। সুধা কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলল, টপ করে শব্দ হল জলে। অতসী তবু ঘাড় ফেরাল না। সুধা কয়েকটা ঘাস ছিঁড়ল আপন মনে, এক দুই তিন করে আকাশের তারা গুণতে শুরু করল। গুণে গুণে যখন

আর ফুরয় না, ওর জানা অঙ্কের সব সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন সুধা অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল, 'বাড়ি ফিরবে না, ফুলমাসি।'

অতসীর যেন চমক ভাঙল। শাড়ি থেকে চীনেবাদামের খোসাগুলো ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল।—'চল, যাই।'

তারপরেও আরও ক' মিনিট কাটল। দূরের জাহাজটার মাস্তুলে ফুলমাসির মনের কী কথা লেখা আছে সেই জানে।

সেদিন বাড়ি ফিরতে রাত হয়েছিল।

কী নেশায় পেয়েছিল ফুলমাসিকে, ইডেন গার্ডেন থেকে বেরিয়ে এসেও ট্রামে ওঠেনি। বলেছিল, 'মাঠটুকু হেঁটে পার হই, চল।'

ময়দানের ঘাস ভিজে-ভিজে। সবে ত শেষ আশ্বিন, হিম ঝরার রাত কি এসে গেল এখনই। মনে আছে কেল্লাটা সেদিন অনেক দূর পর্যন্ত নিঃশব্দে ওদের পাশাপাশি চলেছিল,—উঁচু ঢিবিগুলো আধ-অন্ধকারে ছায়া-ছায়া, অস্পষ্ট দীর্ঘ ভূতুড়ে খুঁটিগুলো রক্তচক্ষু। রাস্তায় লোক চলাচল এরই মধ্যে কমে এসেছে, মাঝে মাঝে ওদের পাশ কাটিয়ে ব্যস্ত কয়েকটা মোটরের ঊর্ধ্বশ্বাস গতি ; কচিৎ আইসক্রীম ছোকরা দিনের বেচাকেনার শেষে হাতগাড়ির উপর ক্লান্ত কনুই রেখে-চুপচাপ দাঁড়িয়ে। পিছনে মাঝ গঙ্গায় নোঙর-ফেলা জাহাজটা হঠাৎ বুঝি সিটি দিয়ে উঠল ভাঙা-ভাঙা গলায়, সুধার গায়ে কাঁটা দিল, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাত ধরল অতসীর। —'তোমার ভয় করছে না ফুলমাসি ?'

অতসী বলল, 'ভয় কিসের, কাকে। ওই দেখতে পাচ্ছিস না, খানিক দূরে আকাশটা আলোয় আলো ? ওই হল চৌরঙ্গী, আমরা ওখানে গিয়ে ট্রামে উঠব।'

দিদিমা জেগেই ছিলেন। দরজা খুলে দিয়ে বললেন, 'এত দেরি হল তোদের। আমি ভয়ে মরি। বয়সের মেয়ে।'

অতসী দরজায় খিল তুলে দিল প্রথমে। মার কথার জবাবটা হয়ত তখুনি

ভেবে নিল।—'বয়সের মেয়ে বলেই ত ভয় নেই মা। নেহাৎ চোখের মাথা না খেলে এ-বয়সের মেয়ের কেউ পিছু নেয় না।'

দিদিমা কিছু একটা উত্তর দেবার আগেই অতসী তর তর করে উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে, কিন্তু ঘরে ঢোকার আগেই তাকে থমকে দাঁড়াতে হল।

ওর লেখার টেবিলের উপরে মাথা নুইয়ে কে যেন ঘুমুচ্ছে।

নীলুদা!

সুধাও চুপে চুপে কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল, অতসী ঠোঁটের ওপর তর্জনী রেখে ইশারায় তাকে মানা করল কথা বলতে। পা টিপে টিপে গেল ঘরের মধ্যে। আগন্তুকের মুখের সবটাই ভাঁজকরা কনুয়ের ভিতর ডুবে আছে। তবু তাকে চেনা যায় পাঞ্জাবির ভিতর থেকে ফুটে ওঠা শিরদাঁড়ার হাড় ক'খানি থেকে, ঘাড় অবধি নেমে আসা ঝাঁকড়া-কোঁকড়া চুলের বহরে।

'নীলুদা!' অতসী একটিমাত্র আঙুল দিয়ে মানুষটিকে স্পর্শ করল।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে লোকটি মাথা তুলে তাকাল। তামাটে, পোড়া রঙ, চোখের কোণ ক্লান্ত, কাল, নাতি-উঁচু নাকটার সমুখের ভাগটা কেমন একটু থেঁতলান।

'কখন এলে নীলুদা।'

চোখ কচলাতে কচলাতে, যাকে নীলুদা বলা হল, সে বললে, 'অনেকক্ষণ —সেই সন্ধ্যে থেকে বসে আছি। কেন, মাসিমা তোমায় বলেন নি?'

অতসী অকারণেই ঘুরপাক খেয়ে গেল ঘরের মধ্যে। বলল, 'মাকে কিছু বলবার সময়ই দিইনি। তারপর, চিঠি দিয়ে এলে না কেন?'

সুধা সেই যে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়েছিল, আর এগয়নি। এতক্ষণ অতসীর বুঝি নজর পড়ল। ইঙ্গিতে ওকে আসত বলল কাছে।

'প্রণাম কর সুধা। তোর নীলাদ্রি মামা। এ হল সুধা, আমার বোনঝি।'

সুধা লক্ষ্য করলে নীলাদ্রি চুপ করে বসে বসেই তার প্রণাম গ্রহণ করলেন, একটা কথাও বললেন না। একটাও না। এই ছোট মেয়েটি সম্বন্ধে তাঁর

সামান্য ঔৎসুক্যও নেই। প্রণাম সেরে সুধা তক্তাপোশ ঘেঁষে সরে দাঁড়িয়ে রইল।

অতসী বললে, 'ওকে আমার কাছে এনে রেখেছি। বাড়িতে ওরা অনেক ভাই-বোন, ঠিকমত দেখাশোনা হত না, ওর ভার আমিই নিয়েছি ; এখানেই ও লেখা-পড়া শিখবে।'

এত কথার জবাবে নীলাদ্রি শুধু বললেন, 'ও।'

তারপর একটা মোড়া টেনে এনে অতসী বসল নীলাদ্রির পায়ের কাছে। আস্তে আস্তে দু' একটা কথা জিজ্ঞাসা করল, নীলাদ্রি জবাব দিল তেমনি আস্তে আস্তে।

অতসী বলল, 'তুমি কিন্তু ভারি রোগা হয়ে গেছ নীলুদা।'

নীলাদ্রি অস্বীকার করল না, বলল না, 'কই, তেমন কি আর—', রগ-বেরন হাতের পাতা দু'টি প্রসারিত করে বলল, 'তা বোধ হয় হয়েছি। সব সময় ক্লান্ত লাগে, দেখলে না. তোমার জন্যে বসে থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' বলে একটু হাসল নীলাদ্রি, 'বয়সও ত কম হল না। বুড়ো হতে কতই বা আর দেরি। তোমার কিন্তু শরীর সেরেছে অতসী, আগের চেয়ে ঢের সুন্দর হয়েছে।'

আবীর ছড়িয়ে গেল অতসীর মুখে ; আঁচলটা বাহুমূল অবধি এসে খসে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, অতসী সেটাকে ফের ভাল করে জড়িয়ে নিল গায়ে। নীলাদ্রি যেখানে বসেছে সেখান থেকে ওর পা দেখা যায় না, তবু শাড়ির পাড় দিয়ে পাতা দু'টি ঢেকে দিল। হাতের নখ দিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল, কিন্তু তুমি এখানে উঠলে না কেন নীলাদ্রিদা ; ছোটদা এখন টুরে গেছে, তার ঘরখানায় অনায়াসে থাকতে পারতে।'

'শশাঙ্ক এখানে নেই ?' নীলাদ্রি জিজ্ঞাসা করল।

'না।' অতসী বলল, 'শীগগির ফিরবেও না। তুমি কালকেই এখানে চলে এস নীলুদা।'

একটা হাই তুলল নীলাদ্রি, কী জবাব দিল সুধা বুঝল না। কিন্তু দেখল,

ফুলমাসি মোড়াটাকে আরও একটু কাছে নিয়ে গেছে চেয়ারটার, নীলাদ্রির হাঁটুর ওপর একখানা হাত রেখেছে।

আরও কত কথা হল দু'জনে, কোনটায় হাসির ঝিলিক খেলে গেল ফুলমাসির চোখের কোণে, কোনটায় বা গলায় ভিজেবাষ্প অভিমানের ছোঁয়াচ লাগল, সুধা সব বুঝল না, শুনল না, শুনতে চাইল না। ওদের দিকে চোখ রেখে খাটে পিঠ দিয়ে সরে চলে গেল দরজার কাছে, তারপর এক-পা দু' পা করে পিছু হঠে হঠে, এক সময় বারান্দায় বেরিয়ে পড়ল, ওরা লক্ষ্যও করলে না।

না করুক, বয়ে গেছে। সুধা একবার মুখ তুলে আকাশের দিকে চাইল, নারকেল গাছটার পাতা সর সর কাঁপছে বাতাসে, তার ফাঁকে অগুণতি জোনাকি। জোনাকি তো নয়, তারা। সন্ধ্যারাতে ইডেন গার্ডেনে বসে যে ক'টা তারা গুণতে গুণতে খেই হারিয়ে ফেলেছিল, তাদের কোন কোনটাকে মাঝ রাতে চিনতে পারে কিনা চেষ্টা করে দেখল। পারল না। কোনটা হয়ত উঠে এসেছে মাথার উপরে, কোনটা দিগন্তের ডাঙা থেকে ঝাঁপ দিয়েছে অলক্ষ্য অন্ধকারের সাগরে, কিম্বা জলে বুঝি ঝাপসা হয়ে গেছে সুধার নিজেরই চোখ দুটি, কিছুই আর চেনা যায় না। কেন ফুলমাসি এত কথা বলছে তখন থেকে লোকটার সঙ্গে, যে-লোকটা সুধাকে কাছে ডাকা দূরে থাক, একটা কথাও বলেনি। কেন, কেন।

৩

নূপুরের বাড়ির দিকে সেদিন সুধা চেয়ে দেখেছিল, অন্ধকার। ওখানে জানালার পাশে পালঙ্কে গলা অবধি চাদরে ঢেকে একটি মেয়ে শুয়ে আছে, কঠিন একটা রোগ যার শরীরের আধখানায় দাঁত বসিয়ে নিঃশেষে শুষে নিয়েছে রক্ত, মজ্জা, মাংস। যাকে রোজ ডাক্তার আসে দেখতে, ওষুধ দেয়, ইঞ্জেকসন দেয়, টাকা নেয়। যার মা, ফুলমাসি বলেছিল, ভাল না।

ভাল না? কাকে ভাল বলে ফুলমাসি, কাকে মন্দ, সুধার বুদ্ধি-বিবেচনায় কুলল না। এই যে এত রাত পর্যন্ত একটা লোকের সঙ্গে চাপা গলায় ফুলমাসি গল্প করে চলেছে, এও কি ভাল। ভাল না, ভাল না, কিছুতে না। ফুলমাসি ভাল না, তার নীলাদ্রি ভাল না, কেউ না।

হঠাৎ নারকেল গাছটার পাতা কেঁপে উঠল জোরে, একটা বিকট ঝটপটডানা কাল পাখি বিকট আওয়াজ করে নূপুরদের বাড়ির চিলেকুঠরির উপর গিয়ে বসল। গায়ে কাঁটা দিল সুধার, বারান্দাটা পার হয়ে দিদিমার ঘরের সামনে গিয়ে চাপাভয় গলায় ডাকল, 'দিদিমা!'

সাড়া এল না। বুড়ো মানুষ, অশক্ত শরীর, সারাদিন খেটে খুটে বেশিক্ষণ জেগে থাকবার সামর্থ্য দিদিমার নেই।

সুধা বসে পড়ল বারান্দাতেই। ওঘর থেকে তখনও নিচুগলা আলাপের আভাস আসছে। আসুক, কথা বলে বলে ক্ষয়ে যাক ওদের জিভ, খুশি হয় তো রাত পুইয়ে দিক ওরা, সুধা আর পারছে না, সুধা একটু ঘুমবে।

ঠাণ্ডা সিমেন্টের ওপর গাল রেখে সুধা কাৎ হয়ে পড়ল।

ঘুম ভেঙে দেখল ফুলমাসি ঠেলছে ওকে।

'এই সুধা, ওঠ, ওঠ। খেতে হবে না?'

সুধা চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসল, বলল, 'আজ আর খাব না ফুলমাসি।'

ফুলমাসি সেকথা শুনল না, টেনে নিয়ে গেল ওকে রান্নাঘরে, পিঁড়েয় বসিয়ে দিল। থালায় ওকে ভাত বেড়ে দিয়ে নিজে গেল কলঘরে। একটু পরেই সুধার কানে ঝর্ঝর্ জল ঢালার শব্দ এল, কিন্তু সব ছাপিয়ে মৃদুকণ্ঠ গুন-গুন।

চৌবাচ্চায় বালতি ডুবিয়ে কত জল যে ঢালল ফুলমাসি, একই গানের কলি ফিরে ফিরে গাইল, হিসেব নেই।

শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে অতসী ঘরে ফিরে আসতেই, সুধা বলে উঠল, 'তুমি গান গাইছিলে ফুলমাসি?'

আরক্ত মুখে অতসী বলল, 'কই, না তো।'

'বারে আমি পষ্ট শুনলুম।'

চুলের বিনুনী খুলতে খুলতে অতসী বলল, 'ভুল শুনেছিস।'

'তোমার নীলাদ্রিদা চলে গেছে ফুলমাসি?'

অতসী ধমক দিয়ে বলল, 'ও আবার কেমন ধারা কথা শিখছ? নীলু মামা বলতে পার না?'

চিরুনি হাতে নিয়ে অতসী দাঁড়িয়েছে আয়নার সম্মুখে। একটু দূরে তক্তাপোশে বসে সুধা অনুভব করল, একটু একটু করে মুখের পেশি কঠিন হয়ে আসছে ফুলমাসির, রুক্ষ, ক্লান্ত শিক্ষয়িত্রী এসে আজ বিকেল-সন্ধ্যার একটি খুশী খুশী মেয়েকে ছেয়ে ফেলছে।

'ফুলমাসি, শোবে না?'

'একটু পরে। ইস্কুলের কাজ আছে। তুই ঘুমো।'

অতসী খাতাপত্র খুলে বসল। সাহস করে সুধা যদি যেত, দেখত স্কুলের খাতা দেখছে না ফুলমাসি, কাগজের ওপর হিজিবিজি দাগ কাটছে; আন্দাজী একটা ফুল, সৃষ্টিছাড়া কোন পাখি, এলোমেলো দু'য়েকটা বা গানের কলি; আর একটা নাম—নীলাদ্রি।

পরদিন সকালে অতসীর ঘুম ভাঙল দেরিতে। ধড়মড় করে উঠে বসে পুবের জানালা খুলে দিল, ভিজে ভিজে এক ঝলক রোদ পড়ল বিছানায়।

বারান্দায় এসে ডাকল, 'মা।'

সাড়া পেল না। সুধাকে জিজ্ঞাসা করল, 'দিদিমা কই রে?'

সুধা বলল, 'দিদিমা সেই কোন ভোরে উঠে রান্নাঘরে গেছে। উনুন ধরিয়েছে—আমার সকাল বেলাকার চা জলখাবার খাওয়া হয়েও গেছে, জান ফুলমাসি।'

অতসী রান্নাঘরের চৌকাঠে গিয়ে দাঁড়াল। সুধা দেখল, দিদিমা এক পেয়ালা চা তুলে দিলেন ফুলমাসির হাতে।

ফুলমাসি বলল, 'আমাকে ডেকে দাওনি কেন মা। কেন এত ভোরে উঠে নিজের হাতে সব করতে গেলে।'

দিদিমা এবারও কোন জবাব দিলেন না।

অতসী বিব্রতভাবে চায়ে চুমুক দিল, আড়চোখে বার বার চেয়ে দেখল মার মুখের দিকে, নিঃশব্দে কাপটা মেজেয় নামিয়ে রাখল।

ঘরে ফিরে এসে চাকরকে ডাকল, চাইল বাজারের হিসেব। সে কিছু বলার আগেই তাকে এমন ধমক দিয়ে উঠল যে, হিসেব দেবার ফুরসৎই পেল না রঘু, মাথা চুলকে সরে পড়ল। অতসী তখন পড়ল সুধাকে নিয়ে।

সুধা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে নূপুরদের বাড়ির দিকে চেয়েছিল, যদি কৃশ একখানি হাত ভেসে ওঠে গরাদের ওধারে, কালকের মত আজও ইশারায় ডাকে। অতসী ওকে হিড়হিড় করে টেনে আনল ঘরের মধ্যে, ঠাস করে গালে একটা চড় কষিয়ে বলল, 'ওখানে দাঁড়িয়ে হাঁ করে কী দেখছিস। আজ পড়াশোনা নেই?'

সুধা শব্দ করে কেঁদে ওঠার আগেই বারান্দার রেলিংয়ে বসে একটা কাক কর্কশ কণ্ঠে ডেকে উঠল, অতসী হাতের কাছে যা পেল তাই নিয়ে তাড়া করে গেল সেটাকে।

ফিরে এসে আলনা থেকে তুলে নিল শাড়ি, ব্লাউজ, তোয়ালে, কলঘরে যেতে

যেতে সুধাকে বলল, 'আজ সব ক'টা অঙ্ক দুপুরে বসে কষে রাখবি, আর ওয়ার্ড বুকের চাপ্‌টার মুখস্থ করবি।'

সুধা গোঁজ হয়ে বসে রইল। এ-যেন সে ফুলমাসি নয় যে কাল সন্ধ্যাবেলা অপলক চেয়ে ছিল জাহাজের মাস্তুলের আলোর দিকে, গভীর রাতে যার খুশী উপছে পড়েছিল কলঘরে ঝর্ঝর জলঢালায়।

স্নান সেরে অতসী মুখ বুঁজে খেয়ে নিল, মার সঙ্গে একটা কথাও হল না।

বেরবার মুখে রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি যাচ্ছি মা। নীলুদা জিনিসপত্র নিয়ে আসতে পারে। ওকে ছোড়দার ঘরটা খুলে দিও।'

এতক্ষণ একটা কথাও বলেননি দিদিমা, এবার শক্ত করে আঁচল বেঁধে নিলেন কোমরে। মেয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, 'কেন আসবে শুনি।'

মার চোখে স্থির দু'টি চোখ রেখে অতসী বলল, 'আমি বলেছি।'

'তুমি বলেছ, জানি। কিন্তু কেন বলেছ তাই জানতে চাইছি।'

অতসীর চোখে ঘৃণা লিকলিক করে উঠল। বলল, 'আমার খুশি। নীলুদার শরীর খারাপ, এখানে চিকিৎসা করাতে এসেছেন।'

'চিকিচ্ছে না ঢলাঢলি লো?' এতক্ষণ দিদিমা নিজেকে ধরে রেখেছিলেন, এবারে গলায় বিষ ঢেলে চেঁচিয়ে উঠলেন, ডুবে ডুবে জল খাস তুই, ভাবিস আমি কিছু বুঝি না? কাল রাত বারটা পর্যন্ত বাইরের একটা পুরুষমানুষের সঙ্গে ঘরে বসে ফুস ফুস, গুজ গুজ করেছিস, আর কী করেছিস ভগবান জানেন, মেয়েটাকে তো বারান্দায় বার করে দিয়েছিলি—'

'মা!' প্রচণ্ড একটা চীৎকার করে উঠল অতসী, কিন্তু দিদিমা তাতেও দমলেন না।—'বলবই তো, এক শ' বার বলব, নেহাৎ পেটে ধরেছি, তাই পাঁচ-জনের কাছে মুখ খুলিনে, নইলে তোর ঢলাঢলির বিত্তান্ত জানতে আমার বাকী আছে। বিয়ে দিলুম, শ্বশুরবাড়িতে মন টেঁকাতে পারলি না, তেরাত্তির না পোয়াতে পালিয়ে এলি। ইস্কুলের সেক্রেটারীর সঙ্গে সেবার গিরিডি গিয়ে ক' হপ্তা কাটিয়ে এলি, কিছু বলিনি, ভেবেছি যা করছিস চাকরির খাতিরে।

এখন আবার বলা হচ্ছে', দিদিমা এখানে একটা ভেংচি কাটলেন, 'নীলুদা এখানে থাকবেন! নীলু তোর কোন্ জন্মের ভাতার লা?'

এগিয়ে এসে অতসী চেপে ধরল মার একটা হাত, প্রাণপণ জোরে চেঁচিয়ে বলল, 'চুপ কর, চুপ কর বলছি, নইলে—'

'নইলে কি, মারবি? হাত ছেড়ে দে বলছি, অতসী, ভাল হবে না। মুখ যখন একবার খুলেছি, তখন হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব—সবাইকে জানিয়ে দেব কত বড় সতী তুই।'

অতসী তবু ছাড়ল না, চোখ দিয়ে ফুলকি ঝরছে, নিষ্ঠুর আক্রোশে মার হাতের কব্জি দুমড়ে মুচড়ে দিতে দিতে বলল, 'থাম তুমি। তুমি কত বড় সতী ছিলে তাও আমার জানতে বাকী নেই। তবু যদি বাবা মারা যাবার পর তাঁর চিঠিগুলো আমার হাতে না পড়ত।'

'কী, কী বললি তুই' এক ঝটকায় দিদিমা ছাড়িয়ে নিলেন হাত, হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন, 'পেটের মেয়ে এত বড় কথা বললি, তোর বিচার যেন ভগবান করেন। কুষ্ঠ হবে তোর, সব্বাঙ্গ খসে খসে পড়বে, যে পীরিতের মানুষদের জোরে এত বড়াই, তারা পায়ের কড়ে আঙুল দিয়েও তোকে ছোঁবে না।'

অতসী তখনও ফোঁস ফোঁস করছে। 'বেরও, বেরও তুমি এ-বাড়ি থেকে। বেরও শিগ্‌গির।'

মুচড়ে যাওয়া হাতখানাই আস্ফালন করে দিদিমা বললেন, 'বেরব কেন, শুনি। এ আমার ছেলের বাড়ি। সে আসুক, তবে এর পিতিকার হবে। তোকেই ঝেঁটিয়ে তাড়াব আমি—'

নাক সিঁটকে অতসী বললে, 'ছেলের বাড়ি তোমার? মরে যাই, যাই। আমি উদয়াস্ত খেটে মুখে রক্ত উঠে মরছি, আর তোমার ছেলে এদিক ওদিক ফুর্তি করে বেড়ায় সারা বছর, মাসে দশটা টাকা আনে কিনা সন্দেহ, এ-বাড়ি তার হয়ে গেল?'

'হলই ত।' জখম হাতখানায় ফুঁ দিলেন দিদিমা, হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'আমার ছেলে সোনার টুকরো অতসী, শত্তুরেও তার নামে কিছু বলতে সাহস

পাবে না। টাকা রোজগারের বড়াই আমার কাছে কি করছিস। দু' বেলা দু' মুঠো খেতে দিস, তার বদলে প্রাণপণ খাটিয়ে নিস। হাঁড়ি ঠেলা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, তোর সংসারে আমি ত দাসীগিরি করছি।' চোখে আঁচল তুলে দিদিমা ফুঁপিয়ে উঠলেন।

সুধা একটু দূরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, আশে পাশের সব ক'টি জানালা খুলে গেছে, খুক খুক কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছে গলিতে। সুধা করল কি, ঝাঁপিয়ে পড়ল দু'জনের মাঝখানে, 'ও দিদিমা, ও ফুলমাসি, চুপ কর। তোমরা কি আজ থামবে না,—ও দিদিমা, ও ফুলমাসি।'

অতসী একবার সময় দেখল হাতের ঘড়িটায়, তারপর এক পা এক পা করে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

দিদিমা সেদিন খেলেন না, স্নান করলেন না, পুজোয় বসলেন না পর্যন্ত। শিক দিয়ে খুঁচিয়ে উনুনের আঁচ ফেলে দিলেন। সুধাকে দু' মুঠো ভাত বেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন মেজেয়, আঁচল বিছিয়ে। খেতে প্রবৃত্তি সুধারও ছিল না, কোনমতে মুখে দু' গ্রাস তুলে ফিরে এসে দেখল, দিদিমা তখনও শুয়ে।

'কিত্তিবাস পড়বে না, দিদিমা।'

উত্তর এল না।

'পাকা চুল তুলে দিই?'

দিদিমা পাশ ফিরে শুলেন।

অগত্যা সুধা উঠে এল ছাতে। নারকেল গাছটা স্তব্ধ, কী যেন শুনবে বলে কান খাড়া করে আছে। মোড়ের কামারশালা থেকে লোহা পেটানর শব্দ আসছে, ঠিক নিচেই গলিতে একটা নেড়ী কুকুরের সঙ্গে ও-বাড়ির পোষা বেড়ালটার বিষম ঝগড়া লেগেছে। চিলেকুঠিতে রাখা ছেঁড়া তোষকের ভিতর থেকে দু'টো ইঁদুর তর তর করে পাইপ বেয়ে নেমে গেল দোতলায়, সুধা শিউরে সরে এল ছাতের এ-পাশে, যেখান থেকে নূপুরদের বাড়ির সবটা দেখা যায়।

পিঠের নিচে বালিশ জড়ো করে নূপুর জানালার কাছে তেমনি আধশোয়া, সুধাকে দেখেই হাতছানি দিলে।

ইশারায় সুধা বললে, যাবে না। অনেকগুলো অঙ্ক কষা বাকী। সবচেয়ে যেটা বড় কথা, ফুলমাসির বারনের বেড়ি আছে।

নূপুর ইশারাতেই জিজ্ঞাসা করলে, কেন। হাত দু'টি তুলে জানালে পুতুল দেবে।

সুধা তবু দাঁড়িয়ে রইল শক্ত হয়ে। কী করে নূপুরকে বোঝাবে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে গুটি গুটি সরতে লাগল।

নিচে গিয়ে দেখল, দিদিমার নাক ডাকছে, অঙ্কের খাতা খুলে বসল, দু'একটার ফল মিলল, কোনটার বা মিলল না, উত্তরমালা দেখে ঠিক ঠিক ফলটা যে বসিয়ে দেবে সে-সাহস হল না।

ঠিক তখনই একের পর এক ফিরিওলা ডেকে গেল গলিপথ দিয়ে ; চীনে বাদাম, কমলা লেবু, বড়ি, শায়া, শেমিজ, সব শেষে বাসনউলি।

বাসন লেবে ?

সুধা আর স্থির থাকতে পারল না, নিচে নেমে সদর দরজাটার পাল্লা আলগা করল, ইঁদুরের মত কুতকুতে ভয়ে মাথাটা বাইরে বাড়িয়ে দিল।

বাসন লেবে খুকি ?

সুধা মাথাটা ঝাঁকলে জোরে জোরে, দরজাটাও বন্ধ করে দেবে কিনা ভাবছে, এমন সময় একটা রিক্সা এসে দাঁড়াল ঠিক ওদের রক ঘেঁসে, ঘর্মাক্তদেহে একজন ভদ্রলোক নামলেন।

সুধা দেখল, নীলাদ্রি মামা। একেবারে তল্পিতল্পা নিয়ে এসেছেন।

ভাড়া চুকিয়ে নীলাদ্রি সুধার দিকে চেয়ে বললেন, 'অতসী নেই ?'

সুধা কথা বললে না।

নীলাদ্রী ওকে চুপ দেখেই ধরে নিলে অতসী নেই। বললেন, 'তবে তোমার দিদিমাকে গিয়ে খবর দাও খুকি। আমাকে চিনতে পারছ তো, সেই যে কাল

এসেছিলাম।' কতকটা অপ্রতিভ, কতকটা কৈফিয়তের সুরে বললেন, 'আমি এখানে থাকতে এসেছি, দিদিমাকে বল গিয়ে।'

সুধা নড়ল না তবু। কাল কথা বলেনি লোকটা, আজ ঠেকে গিয়ে ভাব করতে এসেছে।

'যাও খুকি, দিদিমাকে বল গিয়ে?'

উত্তরে সুধা আস্তে আস্তে রাস্তার দিকে পা বাড়াল। দিদিমাকে খবর দিতে সুধা পারবে না; জানে ও, নীলাদ্রি মামার মুখোমুখি হলে কী কেলেঙ্কারি করবেন দিদিমা, হয়ত চেঁচামেচি করে একটা অনর্থ বাধিয়ে বসবেন। তার চেয়ে সে নূপুরের ওখানে যাবে, ফুলমাসি ফিরে এলে কপালে যাই থাক।

'ও খুকি, শোন।' বিব্রতভাবে কপালের ঘাম মুছলে নীলাদ্রি, সুধা তবু ফিরল না, রাস্তায় নেমেই সে শুরু করেছে ছুটতে।

সেদিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে নীলাদ্রি নিজেই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

৪

নূপুর আজ একবারে গোড়া থেকে 'তুই' দিয়ে শুরু করল। বলল, 'তোদের বাড়ি কে এল রে?'

জানালার কাছে অহোরাত্র অনন্ত শয়নে পড়ে আছে মেয়েটা, কিছু ওর নজর এড়াবার জো নেই।

সুধা বলল, 'আমার মামা।'

'কেমন মামা।'

সুধা জানত না কেমন, কোন সম্পর্ক আছে কিনা তাও না। তবু নূপুরের কাছে মান বাঁচাতে বললে, 'দূর সম্পর্কের।'

মুখ টিপে হাসল নূপুর।—'দেখিস, মেসো নয়তো।'

ইঙ্গিতটা চট করে সুধার বোধগম্য হল না, সেদিকে তার মনও ছিল না। সে উৎকর্ণ হয়েছিল, কখন ও-বাড়ি থেকে বিশ্রী একটা চেঁচামেচি শোনা যাবে, দিদিমা হয়ত ঝাঁটা নিয়েই তাড়া করবেন নীলুমামাকে, পাড়া মাথায় করবেন।

কিন্তু ঠিক তখনই নিচতলায় বুঝি বাসন ধুতে আরম্ভ করল ঝি, একটা ছ্যাকরা গাড়ি সময় বুঝে গলির এমুখ থেকে ওমুখ অবধি নিস্তব্ধতাকে থেঁৎলে চলে গেল, কামারবাড়ির কারিগরেরা বুঝি শুরু করল ক্যানেস্তারা পেটাতে, আর কিছু শোনা গেল না।

নূপুর পুরনো কথার জের টেনে বললে, 'মামা টামা নয়রে, লোকটা তোর মেসো। নইলে তোর ফুলমাসিকে ও চুমু খাবে কেন।'

সুধার মুখটা সাদা হয়ে গেল—'চুমু খাবে কেন, দূর। বড় মেয়েকে কেউ চুমু খায়?'

চোখের তারা নাচিয়ে নূপুর বললে, 'খায়, খায়। কাল রাত্রেই তোর

ফুলমাসিকে নীলুমামা খেয়েছে। আমি এখান থেকে সব দেখেছি যে। ও লোকটা হল তোর ফুলমাসির লাভার।'

সুধাকে লজ্জানীল মুখ নিচু করে বসে থাকতে দেখে নূপুর আবার বললে, 'ভাবছিস কেন, মেয়ে হলেই তার লাভার থাকে, লাভার হলেই চুমু খায়।' বলতে বলতে বালিশের নিচ থেকে নূপুর খান দুই বই বার করল, 'এ-বইয়ে সব লেখা আছে।'

'বইয়ে বুঝি এ-সব কথা লেখা থাকে?'

'থাকে না?' সবজান্তা ঢংয়ে হাসল নূপুর, 'তুই তো পড়িস শিশুশিক্ষা না কথামালা, তুই কি জানবি।'

'এসব বই কোথা থেকে পাও, ভাই।'

ভুরু টান করে নূপুর একবার বলল, 'বলব কেন'; পরমুহূর্তেই ফিক করে হেসে বলে দিল।

'এসব আমাকে এনে দেয় নিশীথ,—সেই যে কাল আমাকে ইঞ্জেকসন দিতে এসেছিল, মনে নেই?'

সুধার মনে ছিল, কিন্তু সেকথা জানাবার প্রয়োজন বোধ করলে না।

নূপুর নিজেই বলে গেল, 'ও আমাকে বই এনে দেয়, রোজ। এ পর্যন্ত কমসেকম দু'শ বই ত পড়ে শেষ করেছি।'

'তোমার মা বকে না?'

নূপুর বলল, 'ফুঃ। মা নিজেই আমার কাছ থেকে মাঝে মাঝে চেয়ে নিয়ে যায়।' সুধা কতখানি অবাক হল দেখে নিয়ে নূপুর ফের বলল, 'আর বলবেই বা কেন। মা জানে আমার দৌড় ওই বই পড়া অবধি। খারাপ তো হব না, হবার সাধ্যই নেই। খোঁড়া হয়ে বিছানায় পড়ে থাকি, শরীরের আধখানা দড়ির মত শুকনো। আমার আবার ভয় কী ভাই।'

হালকা সুরে শুরু করেছিল, কিন্তু এরই মধ্যে কখন গাঢ় হয়ে গেছে নূপুরের গলা, একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস অন্য কোন পথ না পেয়ে চোখ দু'টি দিয়ে দু' ফোঁটা জল হয়ে বেরিয়ে এসেছে।

সেই জল লুকতে নূপুর দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাল। একটা ক্ষুব্ধ গুঞ্জনের সুরে বলে গেল, 'মন চঞ্চল হয়, শরীরে সাড়া আসে না, খুব কষ্ট হলে দু' গ্লাস জল ঢক ঢক খেয়ে ফেলি, কি বালিশটা চেপে ধরি বুকে। আমার দুঃখ তুমি বুঝবে না ভাই।'

কিছু বলার ছিল না, সুধা কিছুক্ষণ নূপুরের বই দু'খানা হাতে নিয়ে নাড়া-চাড়া করল, আঁচড় কাটল মলাটে, তারপর উঠে জানালার ধারে গেল।

ও-বাড়িও একেবারে ঠাণ্ডা, চুপ। দিদিমার সেই কাঁসা গলা শোনা যায় কই, নীলাদ্রিকে শাপ শাপান্তই বা করছেন না কেন, সুধা যে-ভয় করেছিল।

তবে বোধহয় এতক্ষণ যা হবার হয়ে গেছে, দিদিমা তাড়িয়ে দিয়েছেন নীলাদ্রিকে, ফের একটা রিক্সা ডেকে এনে লোকটা যে-পথে এসেছিল সে-পথেই ফিরে গেছে।

নূপুর তখনও দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে। বিছানার কাছে এসে সুধা আস্তে বলল, 'আমি তবে আজ আসি ভাই, নূপুর।'

নূপুর চোখ মেললে। জলের ফোঁটা দু'টি শুকিয়ে গেছে, চোখের কোণে এখন একটু লালচে ছোপ লেগে আছে শুধু। নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, 'যাবে, এখুনি?

'ফুলমাসির ফিরে আসার সময় হল।'

'যাও তবে।' আলমারির দিকে আঙুল দেখিয়ে নূপুর বলল, 'ওখান থেকে দু'টো ডল পুতুল নিয়ে যাও।'

আলমারির কাছে গিয়ে সুধার হাত সরল না—'আরও দুটো নেব? তোমার তবে আর ক'টা থাকবে ভাই।'

'আমার আরও ঢের আছে, বাক্সে।' তিক্ত, বীতস্পৃহ গলায় নূপুর বলে উঠল, 'নিয়ে যাও, নিয়ে যাও তুমি। আমি চাই না। রক্ত নেই, মাংস নেই, এই খেলার পুতুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে কতকাল ভাল লাগে, ভাই?'

রক্ত। মাংস। কী গভীর অনুভূতি দিয়ে শব্দ দু'টো উচ্চারণ করল নূপুর, প্রতিটি অক্ষর জিভ আর ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করে করে। চাদরের নিচে শরীরের

আধখানা মৃত, বাকী আধখানা দ্রুতশ্বাস উত্তেজনায় অতিজীবন্ত। সুধা বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে পারল না, মুখ ফেরাল।

বাড়িতে ফিরে সুধা অবাক হয়ে গেল।

বারান্দায় বসে নীলুমামা চা খেতে খেতে গল্প করছে দিদিমার সঙ্গে, ফুলমাসি ছোটমামার ঘরের তক্তাপোশে নীলুমামার বিছানা করছে।

ফুলমাসিকে দেখে মনে পড়ে গেল, অঙ্ক কষা হয়নি, সুধা বারান্দার এক কোণে সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়াল। অতসী, আশ্চর্য, কিছুই বললে না। দু'টো বালিশ যথাস্থানে রেখে ফর্সা একটা চাদর টান টান করে বিছিয়ে দিল তোষকের ওপর। এক সময় গুন-গুন থামিয়ে বলল, 'নীলুদা, শুনে যাও।'

চায়ের বাটি হাতে নিয়েই নীলু ঘরের ভিতর গেল। অতসী বলল, 'দেখ, এই ঘর তোমার জন্যে ঠিক করেছি। চলবে ত?'

নীলাদ্রী বলল, 'না। একটু খুঁৎ আছে।' বালিশ দু'টো একটার ওপর আর একটা সাজান ছিল, নীলাদ্রী সেদুটো পাশাপাশি রেখে দিল।

অতসী আরক্ত মুখে শুধু বলল, 'অসভ্য।'

দিদিমা ডাকলেন, 'সুধা কলে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে আয়, খেতে বস।'

সুধা ওঘরে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল। মুখ ধোবে না, খাবে না, কিচ্ছু করবে না সে। কেন ফুলমাসি ওকে ডাকল না কাছে, নূপুরদের বাড়ি গিয়েছিল তবু বকল না?

নূপুর বলেছে নীলুমামা ফুলমাসির লাভার। সুধা ভেবে পেল না কী এমন জাদু জানে লাভারেরা যা মানুষকে সব ভুলিয়ে দেয়, এমন কি সুধা যে অঙ্ক কষেনি সেই কথাটাও।

দিদিমাকেই বা নীলুমামা জাদু করল কী দিয়ে।

পাশের ঘর থেকে যতবার ওদের খিলখিল হাসির তোড় ভেসে এল, ততবার সুধা এঘরে কাঠের মত শক্ত হয়ে গেল। বালিশটা ধরল শক্ত করে, কখনও বা দেয়ালে গিয়ে কান পাতল। ভাল বোঝা যায় না, ইনিয়ে বিনিয়ে কী যেন

বলছে ফুলমাসী, নীলাদ্রি হেসে হেসে জবাব দিচ্ছে। ঠোঁটে দাঁত চেপে সুধা বলল, বেহায়া।

একটু পরেই অতসী ঢুকল এ ঘরে। পায়ের সাড়া পেতেই সুধা দেয়াল থেকে কান তুলে নিয়েছিল, কিন্তু একেবারে সরে আসতে পারেনি।

অতসী জিজ্ঞাসা করল, 'কী রে, কী করছিস ওখানে।' জবাবের অপেক্ষা করল না, আলনা থেকে তুলে নিল ভাঁজকরা একটা শাড়ি আর ব্লাউজ, কল-ঘরে চলে গেল।

ফিরে এসে বলল, 'পাউডার কোথায় রেখেছি রে।' নিজেই খুঁজে বার করল। স্নোর কৌটো খুলে বলল, 'একটুও রাখিসনি যে। দিনরাত এইসবই মাখিস বুঝি।'

সুধা অপলক রুদ্ধশ্বাসে দেখছে চেয়ে চেয়ে। মুখের মধ্যে অভিমানের রুমাল ঠাসা, একটা কথাও বেরচ্ছে না।

ডান হাতের তর্জনীতে একটুখানি স্নো তুলে নিল অতসী, বাঁ হাত দিয়ে একটা চড় কষিয়ে দিল সুধাকে, 'পড়া শোনা নেই, কলকাতা এসে শুধু এই সব বিবিয়ানা শিখছ, না ?'

সুধা কাঁদল না, চেঁচাল না একটু। চোখ দুটি দিয়ে শুকনো ফাগের মত ঘৃণা ঝরতে লাগল শুধু। বুঝতে পেরেছে, ফুলমাসী আজ নীলু মামাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে, সুধাকে একবার বলবেও না সঙ্গে যেতে। না বলুক, সুধা চায়ও না।

অতসী ফেরতা দিয়ে শাড়িটা পরছিল, নীলাদ্রী চৌকাঠের বাইরে এসে দাঁড়াল। —'কই তোমার হল ?'

সঙ্গে সঙ্গে অতসী দরজার আড়ালে গিয়ে লুকোলে। —'এক মিনিটের মধ্যে আসছি। তুমি কিন্তু এ-ঘরে এস না নীলুদা, লক্ষ্মীটি। একটু বাইরে দাঁড়াও।'

নীলাদ্রী হেসে বলল, 'আচ্ছা।'

তৈরি হতে অতসীর এক মিনিটের ঢের বেশি লাগল, আয়নাটাই দেখল

কতবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে; জুতোর ফিতে বেঁধে গটগট করে বেরিয়ে গেল, সুধার দিকে একবার পিছন ফিরে চেয়েও দেখল না।

দিদিমা কিন্তু আশ্চর্য চুপচাপ তখন থেকে। সিঁড়ির মুখে মেয়ের সামনা-সামনি পড়ে গেলেন একবার; অতিশয় বাধ্য, নিরুৎসুক গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাচ্ছিস।'

অতসী বললে, 'ডাক্তারের কাছে মা। নীলুদাকে দেখিয়ে আনি।'

'ফিরতে দেরি হবে?'

ঘড়িবাঁধা কবজিটা ঘুরিয়ে সময় দেখে অতসী বললে, 'কত আর। ধর সাড়ে আটটা? ন'টার ওপিঠ হবে না, দেখো।'

সুধা সেদিনই প্রথম দেখল আদিত্য মজুমদারকে।

ফুলমাসির বেরিয়ে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দামী একটা মোটর এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। গাড়ি থেকে যিনি নামলেন তাঁর এক হাতে ছড়ি, অন্য হাতে কোঁচা, সাদা পাঞ্জাবি, সাদা ধুতি, চোখে চশমা, কাঁচা-পাকা চুল।

দিদিমাই দরজা খুলে দিয়েছিলেন, আদিত্য মজুমদারকে দেখে ঘোমটা টেনে সরে দাঁড়ালেন একপাশে, অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'আপনি!'

অন্ধকার হয়ে এসেছিল, ছড়ি দিয়ে ঠুকে আদিত্য সিঁড়ির উচ্চতা ঠাহর করে নিলেন। বললেন, 'অতসী—মিস মিত্র নেই?'

দিদিমা সোজাসুজি জবাব দিলেন না, প্রীত, বিগলিত কণ্ঠে বললেন, 'আসুন।' একটা চেয়ার নিয়ে টানাটানি শুরু করলেন বারান্দায় আনবেন বলে।

আদিত্য বললেন, 'বসব না, অনেক কাজ বাকী। ঘুরতে ঘুরতে একবার এসেছিলুম। মিস মিত্র নেই, বুঝতে পারছি, গেল কোথায়?'

দিদিমা এ-কথাটারও জবাব এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'চা খান, অন্তত?'

আদিত্য ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না, জানেন না, আমি বিলিতি সব কিছু বর্জন করেছি, সিগারেট, চা, সব?' একটু অমায়িক হেসে বললেন, 'চা

অবশ্য বিলিতি নয়, কিন্তু ওতেও কেমন যেন সাহেবিয়ানার গন্ধ আছে। জানেন মিসেস মিত্র, এই সাহেবিয়ানাই আমাদের সর্বনাশ করেছে; পরের নকল করে, পরের অভ্যাস অর্জন করে, আমরা আত্মমর্যাদাটুকু বিসর্জন দিয়েছি—'

আদিত্য একটু দম নিলেন, মনে হল জাতীয়তার উপর নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতা ঠিক করছেন মনে মনে। বক্তৃতাটা হয়ত দিতেনও, যদি না সেই মুহূর্তে নীলাদ্রির ঘরখানার দিকে তাঁর নজর পড়ে যেত।

থমকে গিয়ে বললেন, 'শশাঙ্কবাবু এসেছেন নাকি?'

দিদিমা বললেন, 'না তো।'

'তবে যে ঘরখানা সাজান গোছান, ধবধবে বিছানা—কেউ এসেছেন নাকি?'

দিদিমা হঠাৎ জবাব দিতে পারলেন না, খানিক ইতস্তত করলেন, তোলা ঘোমটাটাই মাথায় আর একটু টেনে দিতে গিয়ে পিঠের খানিকটা খালি করে ফেললেন।—'কই না, কে আবার, ও হ্যাঁ, এসেছে বটে, আমার এক ভাইপো।'

উত্তরের ভঙ্গি দেখেই খট্‌কা লাগল আদিত্য মজুমদারের; সন্দিগ্ধ ভ্রূ কুঁচকে ছড়িটা মেজেয় ঠুকলেন কয়েকবার।

'ভাইপো? বেশ বেশ। এখানে কিছুদিন থাকবেন বুঝি?'

দিদিমা ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন 'না, না। থাকবেন কেন, থাকবেন কেন আদিত্যবাবু। শরীর ভাল না, এখানে এসেছে ডাক্তার দেখাতে। ডাক্তার দেখিয়েই চলে যাবে। আপনি অন্তত এক গ্লাস শরবৎ খান আদিত্যবাবু।'

আদিত্য তাতেও রাজী হলেন না।—'না, তাহ'লে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। আমার কি একদিনও শুয়ে থাকলে চলে মিসেস মিত্র—এই দেখুন না, এখনও পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে হবে, কর্পোরেশনের ইলেকশন সামনে। মিস মিত্র এলে বলবেন, কাল স্কুলের গভর্নিং বডির মিটিং আছে, উনি যে রিকোয়েস্ট করেছেন কালই সেটা পেশ হবে, সম্ভব হলে উনি সকালেই যেন আমার সঙ্গে দেখা করেন।'

দিদিমা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'দেখা করবে আদিত্যবাবু, দেখা করবে। আজ রাত্রে ফিরলেই ওকে বলব—'

আদিত্য হেসে বললেন, 'আজ রাত্রেই দরকার নেই। ভাল কথা, মিস মিত্রের শরীর ভাল আছে ত ?'

'কোথায় আর ভাল তেমন। এটা ওটা লেগেই আছে। সেবার আপনার সঙ্গে গিরিডি গিয়ে কিন্তু বেশ সেরে এসেছিল।'

অস্পষ্ট আলোয় আদিত্য মজুমদারের মুখের কোন রেখা পরিবর্তিত হল কিনা, বোঝা গেল না। ছড়ি দিয়ে মেজে ঠুকতে ঠুকতে বাইরের দিকে পা বাড়ালেন। যাবার আগে হাত দুটি তুলে নমস্কার করে বললেন, 'আচ্ছা, আজ তবে চলি মিসেস মিত্র।'

ফুলমাসি আর নীলাদ্রি ফিরল সাড়ে নটায়।

হাতের ওষুধের শিশি দেখিয়ে নীলাদ্রি বলল, 'ডাক্তার দেখিয়ে এলাম মাসিমা। এই ওষুধটা খেতে বলেছে। ফল হয়, ভাল। নইলে সাতদিন পরে আবার যেতে বলেছে। শরীরটা আমার বুঝেছেন মাসিমা, এই বাইরে থেকেই যা ঠিক আছে, ভেতরে কিচ্ছু নেই।'

এইখানে নীলাদ্রি একটু যতি দিলে, কিন্তু তার মাসিমা একটা আহা না, উহু না, কোন রকম ঔৎসুক্য দেখালেন না।

নীলাদ্রি অগত্যা ফের শুরু করলে, 'ডাক্তার তো কত কথাই বললে। ফলমূল, ছানা, ডিম, হাজার জিনিসের ফরমাস। বলুন তো মাসিমা, গরীবের এত কিছুর যোগান আসে কোথা থেকে। দেখি সাতটা দিন, সুবিধে না দেখি তো ফের দেশেই ফিরে যাব।'

কোন সাড়া না পেয়ে নীলাদ্রি ওর ঘরে চলে গেল। ইতিমধ্যে জামাকাপড় ছেড়ে অতসী এসে বসেছে মার পাশে।

'রান্না হয়ে গেছে, মা ?'

সুধা পিছনেই ছিল, দিদিমাকে সংক্ষিপ্ত একটা উত্তর দিতে শুনল, 'হুঁ।'

'কী রেঁধেছ, শুনি। ঝোল আর ডাল, এই মোটে ? একটা কাজ ক'রলে কেমন হয় মা, নীলুদার জন্যে যদি একটা ডিম এনে সেদ্ধ করে দিই ?'

'তোমার খুশি।'

থমথমে গম্ভীর মুখ মার। অতসী বেশি কিছু বলতে ভরসা পেল না। কি জানি, সকালের মত নোংরা চেঁচামেচি ফের শুরু হয়ে যায় যদি।

নীরব অস্বস্তিতে কিছুক্ষণ কাটল। দিদিমা সেই অবসরে সুধাকে ভাত বেড়ে দিলেন। ডাল থেকে লঙ্কা ফেলে দিলেন থালার ধারে, মাছের কাঁটা বেছে দিলেন। আর আড়চোখে তাকাতে থাকলেন মেয়ের দিকে। অনেক পরে, যেন স্বগত, যেন সুধাকেই বললেন, 'আদিত্য মজুমদার এসেছিল।'

অতসী বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠল, সোজা হয়ে বসল পিঁড়িতে। বিবর্ণ গলায় বললে, 'কখন?'

'তোরা বেরিয়ে গেলি, তার একটু পরেই। বলে গেল কাল গভর্নিং বডির মিটিং আছে, তোকে বিশেষ করে কাল দেখা করতে বলে গেছে, কাল সকালেই।'

'কাল সকালে আমার সময় নেই।'

'কেন কী রাজকার্য আছে তোমার শুনি,' দিদিমার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ চড়ছিল, সুধা কী ভেবে কেউ বলে না দিতেই উঠে গিয়ে রান্নাঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এল। 'দেখ অতসী, নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিস না। যা বলি তোর ভালর জন্যেই বলি।'

'আমি যাব না।' অতসী নিচু কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল।

বলল, কিন্তু ভোর হতে না হতে উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। কলঘরে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে এল, কাপড় ছাড়ল। সুধাকে ঠেলতে লাগল তার পরে। 'এই সুধা, ওঠ। কত বেলা পর্যন্ত ঘুমুবি।'

সুধা চোখ মেলল একবার, বুঁজে ফেলল পরমুহূর্তেই। একটুখানি অভিমান এখনও গলার কাছে ডেলা হয়ে আছে। ফুলমাসি কাল সারা বিকেল, সন্ধ্যা ওর সঙ্গে একটা কথাও বলেনি।

অতসী আবার বলল, 'ওঠ শিগগির। আমরা বেরব একটু।'

এবার আদেশের সুর, সুধা না উঠে পারল না।

দিদিমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাবি ?'

'আদিত্য মজুমদারের বাড়ি।'

দিদিমা একটু সেই-ত-মল-খসালি হাসি হাসলেন।

'সুধাকে নিচ্ছিস কেন ?'

'আদিত্য মজুমদারের সঙ্গে একলা দেখা করার সাহস আমার নেই মা।'

দিদিমা চাপা গলায় বললেন 'ন্যাকা', অতসী শুনেও শুনল না।

যাবার আগে বলল, 'নীলুদাকে চা-ডিম দিও। কিছু জিজ্ঞেস করলে ব'ল, কাজে বেরিয়েছি, ফিরতে দেরি হবে।'

৫

আদিত্য বললেন, 'এস, অতসী, কী মনে করে?'

'আপনি ডেকেছিলেন !'

'আমি ডেকেছিলাম?' ঝকঝকে দাঁতে খানিকটা অমায়িক হাসি বিকীর্ণ করে আদিত্য বললেন, 'তোমাকে ত আমি ডেকে পাঠাই না অতসী, দরকার হলে নিজেই যাই।'

বাড়িতেও সর্বশুক্ল আদিত্য মজুমদার। কাল ধুতি ছিল আজ লুঙ্গি পরেছেন, কিন্তু সে লুঙ্গিটাও সাদা খদ্দরের।

বসবার ঘরখানাও আদিত্য দেশি মতে সাজিয়েছেন, ফরাস, তাকিয়া, কাঠের ডেস্কো। আর কিছু নেই। ফরাসে সকালের দৈনিকগুলো ছড়ান।

অতসী সেই ফরাসেরই এক ধার ঘেঁষে বসল, ইঙ্গিতে সুধাকেও বলল বসতে।

যে-কাগজটা সামনে খোলা ছিল, তার একটা কলমের দিকে আঙুল দেখিয়ে আদিত্য বললেন, 'দেখেছ কী লিখেছে আমাকে নিয়ে। কর্পোরেশন ইলেকসনের কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেল।'

'ডেকেছিলেন কেন?' অতসী ফের জিজ্ঞাসা করল।

আদিত্য পান খান না, তবে মশলার রেকাব সমুখে রাখেন। দুটো এলাচদানা মুখে পুরে বললেন, 'র'স, র'স। তুমি যে একেবারে ঘোড়ার জিনে পা দিয়ে এসেছ অতসী। বাড়িতে কেউ বসে নেই ত তোমার জন্যে?'

এমনিতে চোখ দুটো প্রশস্ত আদিত্যের, কিন্তু সে দুটিকে ছোট করে এমন তির্যক ভঙ্গিতে তাকালেন, যেন অতসীর চোখের তারা আসলে খোলা জানালা, ওখানে উঁকি দিলে ওর বুকের ভিতরটা অবধি পড়া যাবে।

'আমার আবার ইস্কুল আছে।' অতসী কাপড়ের পাড়ের রঙটাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে জবাব দিলে।

'আছেই ত। যাবেই ত। আরে, এও ত একরকম ইস্কুলের কাজ, তুমি ত ইস্কুলের কাজেই এসেছ।'

'ইস্কুলের কাজ!' এমন অবাক হল অতসী যে, শব্দ দুটো মুখ থেকে ফসকে বেরিয়ে গেল।

'না?' আদিত্য মৃদু মৃদু হাসলেন; তিনি রূপসচেতন, যে-কটি দাঁত বের করলে তাঁকে ভাল দেখায়, ঠিক সে-ক'টিই বার করলেন।—'নয়? আমি ইস্কুলের সেক্রেটারী, আমার সঙ্গে ইস্কুলের কিসের উন্নতি হয় পরামর্শ করতে এসেছ।'

'কিসে উন্নতি হয়?'

'এই ধর'—ঘরে দুটো চড়ুই এসে বসেছিল, তুড়ি দিয়ে তাদের উড়িয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে, আদিত্য বললেন, 'এই ধর, তোমাকে এ্যাসিস্ট্যান্ট হেড্ মিস্ট্রেস করে দিলে।'

'ঠাট্টা।'

'ঠাট্টা নয়।' চড়ুই দুটো নিজে থেকেই উড়ে গেল, সেদিকে চোখ রেখে আদিত্য বললেন, 'আজ গভর্নিং বডির মিটিংয়ে তোমার দরখাস্তটা পেশ করব, ভাবছি।'

'আপনার দয়া।' অতসী ঈষৎ ব্যঙ্গ-বাঁকা সুরে বলল।

নীর ফেলে ক্ষীর রাখার মত আদিত্য ব্যঙ্গটুকু ঝেড়ে ফেলে দিলেন, রাখলেন কথাটুকু।

'দয়া শুধু এক তরফের হয় না অতসী, দয়া তোমাকেও করতে হবে।'

'কী করতে হবে বলুন।' অতসী প্রশ্ন করল, চাপা গলা, তবু কেঁপে গেল।

চড়ুই দুটো ফের যাতে আসতে না পারে, হয়ত সেজন্যেই আদিত্য উঠে গিয়ে জানালা বন্ধ করে এলেন; হয়ত রাস্তার লোকের দৃষ্টি বাঁচাতেও। বললেন, 'ভয় পেও না, সাংঘাতিক কিছু নয়। এবারেও কর্পোরেশন ইলেকসনে দাঁড়াব, তোমাকে এই একটু—একটু মেয়েদের ভোটগুলো অর্গানাইজ করে দিতে হবে।'

'আমাকে দিয়ে আপনার ব্যক্তিগত কাজ করিয়ে নেবেন!' অতসী আহত-তিক্ত কণ্ঠে ব'লে উঠল।

'ব্যক্তিগত কাজ কেন হতে যাবে অতসী, এ হল সবার কাজ। সবাই মিলে পেড়াপীড়ি করছে তাই। নইলে ইলেকসনে 'কি দাঁড়াই নিজের গরজে? যেদিন জনসেবার পথে এসেছি, সেদিন থেকে ছোটখাট বিলাস উপকরণের সঙ্গে আমার আমিটাকে ত্যাগ করেছি।'

অতসীর চোখে তখনও অবিশ্বাস লেগে আছে, লক্ষ্য করে আদিত্য বললেন, 'আমিটাকে ত্যাগ করতে হয় সবার আগে, অতসী। নিজেকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দাও, ফুরিয়ে দাও, এমন শান্তি আর পাবে না।'

বক্তৃতা শোনার ধৈর্য অতসীর ছিল না। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি পারব না।'

আদিত্য আবার দুটি এলাচদানা তুলে নিয়েছিলেন, এমন অবাক হলেন যে, সে-দুটি মুখে দিতেও ভুলে গেলেন। ভ্রূ কুঞ্চিত হল, মুখের মোলায়েম রেখা ক'টি কঠিন। —'পারবে না কেন?'

'আপনি গত ছ' বছর এই ওয়ার্ডটিকে হাতের মুঠোয় রেখেছেন, এমন কিছু করেননি, যাতে ফের নির্বাচিত হবার দাবি করতে পারেন। এই ওয়ার্ডের খাটাল, রাস্তাঘাট—'

'থাম।' ডেস্কোটার উপর প্রচণ্ড একটা ঘুষি মেরে আদিত্য প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'থাম।' প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন, উথলে-ওঠা দুধে যেন নিমেষে সর পড়ল। ফরাস ছেড়ে তিনিও উঠলেন, অতসীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'এসব কথা ত তোমার নয়। নিশ্চয় কেউ শিখিয়েছে। কে, অতসী? প্রভাত মল্লিক? সেও শুনেছি এবার দাঁড়াবে বলে তোড়জোড় করছে, কাগজে কাগজে আমার নামে যে সব প্রচ্ছন্ন অপপ্রচার বেরুচ্ছে, শুনেছি তার মূলেও সেই। তুমি কিন্তু হিসেবে ভুল করেছ। প্রভাত মল্লিকও গভর্ণিং বডির মেম্বার বটে, ফাউণ্ডারদের প্রতিনিধি, কিন্তু সে কি একলা তোমাকে এ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মিস্ট্রেসের খালি চেয়ারটায় বসিয়ে দিতে পারবে? সে তোমাকে কী বলেছে জানি না—'

'প্রভাত মল্লিক আমাকে কিছু বলেনি। যা কিছু বলেছি আমার বিবেকবুদ্ধি থেকে।'

আদিত্য ততক্ষণে ফের ধাতস্থ হয়েছেন, তপ্ত চিত্তের উপর সরস সরটা আরও পুরু হয়েছে। মৃদু হেসে বললেন, 'বিবেকটা আসলে একটা বাড়তি গ্ল্যাণ্ড অতসী, প্রয়োজন হলে অপারেশন করতে হয়, যাই হক, একটা কথা জেনে রেখ, তোমার দরখাস্তটা আজ পেশ হবে না। আরও সাতদিন সময় দিলাম। এর মধ্যে ভেবেচিন্তে আমাকে জবাব দিও।'

অতসী চৌকাঠ পর্যন্ত এগিয়েছিল, আদিত্যও সঙ্গে সঙ্গে এলেন, অতসীর পিঠে আলগোছে একটা হাত রেখে বললেন, 'তুমি কিন্তু ভারি রোগা হয়ে গেছ। কাল তোমার মা বলছিলেন, তোমার শরীর নাকি সুবিধের যাচ্ছে না।' একটু থেমে অতসীর মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করতে চেষ্টা করলেন,—'সেবার গিরিডি গিয়ে বেশ সেরে এসেছিলে কিন্তু। যাবে নাকি আবার? আমার বাড়িটা ত পড়েই আছে। ইচ্ছে কর ত ইলেকসন চুকিয়ে আমিও তোমার সঙ্গে যেতে পারি।'

নীলাদ্রি চা খায়নি, ডিম ছোঁয়নি, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বসে ছিল।

অতসী বিছানায় একেবারে ওর গা ঘেঁসে বসে পড়ল। 'ইস, ভারি রাগ যে। ওমা, অষুধটা ছোঁওনি যে। একেবারে ছেলেমানুষ।'

মেজার গ্লাসে এক দাগ ওষুধ ঢেলে অতসী নীলাদ্রির ঠোঁটের সমুখে ধরল।

নীলাদ্রি মুখ সরিয়ে নিল।—'সকালে উঠেই কোথায় গিয়েছিলে আগে বল।'

'কাজে।'

'সকাল বেলাই কাজ?

'কাজের কি সময়-অসময় আছে। কোনদিন চাকরি ত করলে না নীলুদা, কী বুঝবে।'

'চাই না বুঝতে। আজ ভোরে পার্কে যাবার কথা ছিল না?'

অতসী খিলখিল হেসে উঠল।—'তুমি নীলুদা একেবারে ছেলেমানুষের মত করছ। অসুখটা হয়ে তোমার বয়স কমেছে। আমাদের কি এখনও হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়ান মানায়?'

খুক খুক করে কাশি শোনা গেল বাইরে থেকে। দিদিমা অতসীকে ডাকছেন।

'আদিত্য মজুমদার কী বলল রে? কেন ডেকেছিল?'

'সে অনেক কথা মা। এখন সময় নেই, স্কুল থেকে ফিরে এসে বলব।'

'আমার সঙ্গে কথা বলার সময় থাকবে কেন। এই হতচ্ছাড়ার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার সময় তো খুব আছে।' দিদিমা অনেকটা সভ্য হ'য়ে এসেছেন, কথাগুলো চেঁচিয়ে বললেন না।

অতসী বলল, 'তুমি দেখছি একটা কেলেঙ্কারি না করে ছাড়বে না। শোন তবে। আদিত্য মজুমদার ডেকেছিল ইলেকসনটা ওকে তরিয়ে দিতে পারি কিনা জানতে।'

'তুই কি বললি?'

সত্য মিথ্যা মিশিয়ে অতসী বলল, 'সাত দিন সময় নিয়ে এসেছি।'

নূপুর আজ ডাকেনি, সুধা নিজে থেকেই ও-বাড়ি গেল।

দিদিমা এ ঘরে ঘুমিয়েছেন, নীলুমামা ওঘরে। আজ ইস্কুলে যাবার তাড়নায় ফুলমাসি টাস্ক দিতেও ভুলে গেছে। সুধা উসখুস করল কিছুক্ষণ, ছাতে উঠল, নামল, পুতুল নিয়ে বসল, ভাল লাগল না। তখন সতৃষ্ণভাবে তাকাল নূপুরদের জানালার দিকে।

অন্যদিন দেখা যায়, আধশোয়া নূপুর নিজের চুল নিয়েই বিনুনী বাঁধছে আর খুলছে। বলল, 'এস ভাই, বস।'

প্রথম দিনের সঙ্কোচ অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে সুধা, আজ নূপুরের বিছানার অনেকখানি জুড়ে বসল।

নূপুর ফিসফিস করে বলল, দরজাটা বন্ধ করে এস ভাই, আজ তোমাকে

একটা মজার জিনিস দেখাব।' বিছানার নিচে থেকে একটা খাম টেনে বার করল নূপুর, বলল, 'চোখ বোজ।' একটু পরে বলল, 'এবার খোল।'

খুলেই ফের চোখ বন্ধ করতে হল সুধাকে।

নূপুর মুচকি হেসে খামটা বন্ধ করল, বলল, 'আরও আছে, চাও তো সব দেখাতে পারি।'

হাতের তাস চিৎ করে দেখানর মত সব ছবিগুলো বিছানায় ছড়িয়ে দিল নূপুর। সুধা ভয়ে ভয়ে দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেলল, কান লাল হয়ে উঠেছে। বলে উঠল, 'সরিয়ে নাও, সরিয়ে নাও তুমি।'

ম্যাজিকওয়ালা যেমন হাততালি পাবার পর সাজসরঞ্জাম কুড়িয়ে নেয়, নূপুরও তেমনি ছবিগুলো একে একে খামে পুরল। মিটিমিটি হেসে বলল, 'কী বুঝলে?'

কিছু বোঝেনি সুধা শুধু ভেতর থেকে কে বলে দিয়েছে, ভাল না, এগুলো ভাল না, এর চেয়ে বীভৎস কিছু নেই।

নূপুর সুধার গাল টিপে দিয়ে বলল, 'নেকী, কিছু বোঝনি?'

'না'

'তবে লজ্জা পেলে কেন?'

খামটা আবার চালান হয়ে গেল বিছানার নিচে। সুধা ধরাধরা গলায় বললে, 'এসব ছবি কোথায় পেলে তুমি? তোমার মা জানতে পেলে বকবেন না?'

'মা কি আর জানে না।' চোখ দুটো টান টান করে নূপুর বলল, 'ছবিগুলো তো মারই।'

'তোমার মা এসব ছবি দেখেন!'

'দেখেন বৈকি। দেখে আবার সুটকেশে লুকিয়ে রাখেন। হুঁহুঁ বাবা, আমি থাকি পাতায় পাতায়, ঠিক হাতিয়ে নিয়ে এসেছি।'

'তোমার মা টের পাননি?'

'পায়নি আবার। সেদিন আমি চোখ বুজে শুয়েছিলুম, মা এ ঘরে এল

পা টিপে টিপে। এদিক ওদিক চাইছিল, আমি তো বাবা টের পাচ্ছি সব, কিছু বলছি না। ভাল করে দেখাটেকা হয়ে যাক, তারপর এক সময় ফেরৎ দিয়ে এলেই হবে। মার হয়েছে মুশকিল, সোজাসুজি তো চাইতে পারবে না ?'

'কেন ?'

'বুঝলে না, তাতে মারও লজ্জা যে। এসব ছবি দেখার সখ মারও আছে একথা কি মেয়েকে ভুলেও জানতে দিতে আছে।'

'ও'। সুধা যেন এতক্ষনে বুঝলে।—'এসব দেখতে তোমার ভাল লাগে ভাই ?'

'ভাল কি আর লাগে, দেখে আর কতটুকু ভাল লাগে বল। তবু দেখি। বই পড়ার চেয়ে ঢের ভাল। এর পাশে বইগুলো তো নেহাৎ পানসে ?'

'নূপুরদি, তুমি সব জান, না ?'

'তুই সব বলিস কাকে। তবে হ্যাঁ তোদের মত গেঁয়ো মেয়ের চেয়ে ঢের বেশি জানি। যেমন ধর, জানি নিশীথ এখানে আসে কেন।'

'ইঞ্জেকসন দিতে।'

'ছাই। ওটা তো ওর ছল। এসে কী করে শুনবি ? ইঞ্জেকসন দিয়েই হাতটা ধরবে আমার। মিছিমিছি কী যেন গুণবে। বলবে, তাই ত, নাড়ী বড় চঞ্চল দেখছি। দেখি তোমার হার্ট ঠিক চলছে কিনা। একদিন—বললে বিশ্বাস করবে না ভাই—আমার বুকের ওপর কান পেতে শুয়েছিল, হার্টের ধুকধুকি শুনবে বলে।'

'তুমি শুনতে দিলে নূপুরদি ?'

'দিলুম।' দিলে-কী-হয় ভঙ্গিতে চেয়ে ঠোঁট উল্টে নূপুর বললে, যেন এটা কিছুই না। অনায়াসে যেমন সুধাকে বিলিয়ে দিয়েছে পুতুল, তেমনি নিশীথকে ওর হৃৎস্পন্দন শুনতে দিয়েছে।

একটু পরেই চৌকাঠের উপর দেখা গেল একজোড়া জুতো, একটু কেশে নিশীথ ডাকল, 'নূপুর।'

নূপুর বললে, 'ঐ এসেছে।'

অন্যদিন নিশীথ এলেই সুধা চলে যায়, আজ গেল না, গিয়ে দাঁড়াল আলমারির কাছে, আড় চোখে নিশীথকে লক্ষ্য করতে থাকল।

নিশীথ এসেই ধপ করে বসল বিছানাতে, নূপুরের হাতখানি টেনে নিয়ে বলল, 'আজ কেমন আছ?'

নূপুর বলল, 'ভাল', চাদরটা গলা অবধি টেনে নিল।

নিশীথ এতক্ষণে দেখতে পেয়েছে সুধাকে। বলল, 'মেয়েটি কে নূপুর?'

'আমার বন্ধু।'

'সে তো বুঝতেই পেরেছি। কোথা থেকে এসেছে, তাই বল।'

মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করত রামায়ণের কে একজন, কৃত্তিবাস থেকে দিদিমা ওকে পড়ে শুনিয়েছেন, এ লোকটা তেমনি সুধাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে হাল্‌কা-নীল চশমার আড়াল থেকে। সুধা সরে গেল আরও দূরে, যেন দেয়ালের সঙ্গে মিশে যেতে চাইল।

খানিকক্ষণ দেখে নিয়ে নিশীথ বলল, 'তোমার চেয়ে তো ছোটই হবে মনে হচ্ছে। খুকি শোন তো।'

এক-পা এক-পা করে সুধা এগিয়ে এল, একটু তফাৎ রেখে দাঁড়াতে চেয়েছিল, কিন্তু নিশীথ ওর একটা হাত ধরে ফেলল খপ করে। কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'তোমার নাম কী?'

দু'ঘন্টা আগে হলেও সুধা এত আড়ষ্ট হত না। কিন্তু নূপুরের দেখান ছবি এখনও ভাসছে চোখে, নিশীথের সম্বন্ধেও অনেক কথা একটু আগে শুনেছে, সুধার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। কে জানে কী মতলব লোকটার।

নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার একটা নিষ্ফল চেষ্টা করল সুধা।

নূপুর অপলক চেয়ে থেকে ওদের দেখছিল। বলল, 'ওকে ছেড়ে দাও নিশীথদা। পাড়াগেঁয়ে ভীতু মেয়ে, দেখছ না, এরই মধ্যে কেমন ঘেমে নেয়ে সারা হয়েছে?'

নিশীথ বলল, 'বটে।' পকেট থেকে বার করল সুগন্ধি একটা রুমাল, সুধার

কপালের ঘাম মুছিয়ে দিল, কিন্তু ছেড়ে দিল। বলল, 'আর একদিন ভাল করে আলাপ হবে তোমার সঙ্গে, কেমন ?'

ছাড়া পেয়েই সুধা ছুটতে শুরু করল। এতদিনে বুঝতে পেরেছে কেন ফুলমাসি বলেছিল, ওরা ভাল না ; কেন এ-বাড়ি যেতে মানা করেছিল।

এক বেলাতেই সুধার বয়স অনেকখানি বেড়ে গেছে।

বাড়ি ফিরে সুধা ঘরে গেল না। বাথরুমের দিকে এগল। চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দেবে, ভিজে গামছায় গা মুছে নেবে। সারা শরীর ঘেমেছে, জ্বালা জুড়োয় না কেন। এখনও গা ঘিন্ ঘিন্ করছে, সুধা ঠিক জানে না কেন। ছবি দেখেছিল, তাই ? নাকি নিশীথ কাছে টেনে নিয়েছিল বলে। ক্লেদাক্ত, তবু বিচিত্র এই অনুভূতি, হয়ত এর অনেক পরত নিচে একটু সুখের সুরভি গুঁড়ো গুঁড়ো ছড়ান আছে।

কলঘরে ঢুকতে গিয়ে একেবারে নীলাদ্রির সামনাসামনি পড়ে গেল। মাথা নিচু করে নীলুমামা বেরুচ্ছিলেন, দেয়াল ধরে ধরে। ওকে দেখে ক্ষীণ হেসে বললেন, 'কী রে।'

সুধা বলল, 'মুখ ধোব', তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকল, কিন্তু ঢুকেই চোখ স্থির হয়ে গেল। জল গড়িয়ে যাবার জন্যে যেখানটায় ঝাঁঝরি পাতা, সেখানে গাঢ় লাল কয়েকটা ফোঁটা।

সুধা পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে ঝাঁঝরিটা ঘষতে লাগল। পানের কষ নয়, তা হলে তো রঙ আরও ফিকে হত। তবে কি—

রক্ত !

আতঙ্কে বিস্ময়ে সুধা চেঁচিয়ে উঠল, 'নীলুমামা, রক্ত।'

নীলুমামা দেয়াল ধরে ধরে অল্পই এগিয়েছিলেন, আবার ফিরে এলেন আস্তে আস্তে। কলঘরের দরজা ধরে দাঁড়ালেন। ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে বললেন, 'চুপ। চেঁচাসনে। আমি দেখেছি। ধুয়ে তো দিয়েছিলুম, তবু যায়নি ?'

নীল হয়ে গেছে নীলুমামার মুখ, ভূতে পাওয়া মানুষের মত হাতের মুঠি কঠিন হয়ে উঠেছে। বিড়বিড় করে আবার বললেন, 'ধুয়ে দিলুম, তবু গেল না?'

'কিসের রক্ত, নীলুমামা?'

অনেকক্ষণ ধরে নীলাদ্রি সুধার চোখে চোখে চেয়ে রইল। তারপর ধীর কণ্ঠে বলল, 'আমার।'

সুধা কিছুই বুঝল না, হাতে ঘটিটা কখন তুলে নিয়েছিল, সেটাকে উপুড় করে দিল ঝাঁঝরিটার উপর। নীলাদ্রি হাত বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। 'বড় দুর্বল লাগছে, আমাকে একটু শুইয়ে দিয়ে আসবি?'

বিছানায় শুয়ে বলল, 'জানালাটা খুলে দে। আলো আসুক। একটু হাওয়া করবি সুধা?'

হাত-মুখ ধোয়া হল না, সুধা নীলাদ্রির শিয়রে বসল হাতপাখা নিয়ে। এতটুকু সম্প্রীতি ছিল না দুজনের মধ্যে, আজ এক ফোঁটা রক্তের তিলকে সন্ধি হয়ে গেছে। খানিক পরে নীলাদ্রি আরামে চোখ বুজে বলল, 'আঃ।'

দিদিমা উঠেছিলেন। কী ভেবে একবার উঁকি দিলেন এ-ঘরে। সুধাকে দেখে বললেন, 'তুই এখানে কী করছিস?'

জবাব দিল নীলাদ্রী। চোখ না মেলেই বলল, 'হাওয়া করছে, একটু।'

নীলাদ্রির স্বরে কিম্বা নিমীলনয়ন পাণ্ডুর মুখে হয়ত এমন কিছু ছিল দিদিমা শিউরে উঠলেন। কাছে এসে বললেন, 'তোমার অসুখটা কি আবার বেড়েছে নীলাদ্রি?'

নীলাদ্রী বলল, 'ও কিছু না। অতসী ইস্কুল থেকে ফেরেনি? এলে একবার আমার ঘরে পাঠিয়ে দেবেন মাসিমা।'

দিদিমা নিজেই শুধু গেলেন না সুধাকেও তুলে নিয়ে গেলেন চোখের ইশারায়।

একটু পরেই ফুলমাসি এল।

দিদিমা মেয়ের পথ আগলে দাঁড়ালেন।

'নীলুকে আজই বিদায় কর আতসী।'

রোদে টকটকে মুখ অতসীর, বই ছাতা রাখবারও সময় পায়নি। বলল, 'আবার কী হল?'

'ও আমার কাছে লুকিয়ে গেছে, কিন্তু আমি টের পেয়েছি। ওর সব্বনেশে রোগ হয়েছে অতসী। এ-অসুখ নিয়ে ওকে তো আমি এ বাড়ি থাকতে দিতে পারি না।'

অতসী শান্তস্বরে বলল, 'ও কোথায় যাবে তবে?'

'যেখানে খুশি। গাছতলায়, হাসপাতালে, যেখানে হয় মরুক। আমার কী।'

'ও তোমার বোনপো হয় না?'

'বোনপো না আরও কিছু। লতায়পাতায় জড়িয়ে কী সম্পর্ক ঠিক নেই। তোর বিয়ের আগে এ-বাড়িতে ঘুরঘুর করত, কেন জানিনে আমি? তোর বিয়ের পর নিরুদ্দেশই বা হয়ে গিয়েছিল কেন। যাক, সে যা হবার হয়ে গেছে, এখন তো ও বিদায় হোক।' সুধাকে কাছে নিয়ে, ওর মাথায় হাত রেখে দিদিমা বললেন, 'কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর করি, জেনে শুনে এতবড় সর্বনাশ আমি হতে দেব না, অতসী।'

অতসী তবু চুপ করে আছে দেখে দিদিমা আবার বললেন, 'তোরও কাণ্ডজ্ঞানের বলিহারি মেয়ে। জলজ্যান্ত স্বামী আছে, তবু ওর কী দেখে ভুলেছিস কে জানে।'

'সে স্বামী তো আমাকে পরিত্যাগ করেছে মা।'

'মিছে কথা বলিসনি অতসী, জিভ খসে পড়বে। সে তোকে পরিত্যাগ করেছে, না তুই ছেড়ে এসেছিস তাকে। হাজার হক, স্বামী। পতি ছাড়া মেয়েমানুষের আর কী আছে লো।'

চাপা গলায় যতটা পারে তিক্ততা ঢেলে দিয়ে অতসী বলল, 'আদিত্যবাবুকে যখন ঘটা করে ডেকে বসাও মা, তখন এসব কথা মনে থাকে না?'

'থাকে', স্থির কণ্ঠে দিদিমা জবাব দিলেন, 'তবু বলছি। তোর ভালর জন্যে। মেয়ে পেটে ধরার কী দুর্ভোগ তুই কি বুঝবি অতসী।'

অতসী বলল, 'আমার বুঝে কাজ নেই।'

পায়ের সাড়া পেয়ে নীলাদ্রি চোখ খুলল। ম্লান হেসে বলল, 'বস অতসী। তৈরি হয়ে নাও। আমাকে যেতে হবে।'

ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অতসী বলল, 'কোথায়?'

'ডাক্তারের কাছে। ওষুধ খেয়েও কিছু হল না, দেখি এবার এক্স-রে ফটো তুলে আসি।' বলতে বলতে একটা কাশির বেগ সামলে নিল নীলাদ্রি, খাটের পাশে রাখা পিকদানিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'yet here's the—blood, লেডী ম্যাকবেথ পরের রক্ত দেখেই ভয় পেয়েছিলেন, নিজের রক্ত দেখলে তিনি কী করতেন অতসী?' উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই নীলাদ্রি নাটকীয় ধরনে হাতটা প্রসারিত করে বলল, "Out damned spot. Out I say.'

অতসী ছায়ামূর্তির মত বসে রইল।

৬

এক্স-রে রিপোর্ট এল দিন দুই পরে।

রিপোর্টে অপ্রত্যাশিত কিছু ছিল না। তবু অতসীর মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। রাজসিক পথ্য আর ওষুধের ফর্দ দেখে নীলাদ্রি বলল, 'কী করে চলবে অতসী। আমার তো মোটে—'

অতসী বলল, 'সম্বল আমার সামান্ত আছে নীলুদা। আমার সম্বল তুমি। তোমাকে আমি সারিয়ে তুলবই, যে ভাবে পারি।'

কৃতজ্ঞতায় নীলাদ্রির চোখ সিক্ত হয়ে এল। অস্ফুট স্বরে বলল, 'এই দ্বিতীয়বার।'

'দ্বিতীয়বার কী, নীলুদা?'

'আমার জন্তে আর সকলের ত্যাগ স্বীকার। তুমি আমার ছেলেবেলাকার সব কথা জান না অতসী। বাবার সামান্ত রোজগার। বাড়ির বড় ছেলে আমি, সবটুকু সঞ্চয় দিয়ে, আমাকে লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন। পরের ভাইগুলো ঠিকমত জামাকাপড় পেত না। জুতো না, অসুখ হলে ওষুধ পর্যন্ত না। ইস্কুলে দু'চার বছর গিয়েছিল, তারপর বাবাই তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন। বললেন, ওদের লেখাপড়া হবে না, মাথা নেই। আমি কিন্তু সেই বয়সেই বুঝেছিলাম মাথা ওদের আছে, যা নেই, সে-হল, বাবার সামর্থ্য। এক সঙ্গে এতগুলো ছেলের লেখাপড়ার খরচ টানতে পারছেন না। আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, তুই মন দিয়ে পড়, পাশ করে আমাদের দুঃখ ঘোচাবি। পাশ তো করলুম, শুধু ইস্কুলের নয়, কলেজের পরীক্ষাগুলোও। প্রতিবার ফীজ যোগাবার সময় কী কষ্ট হত বাবার নিজের চোখে ত' দেখেছি। সব কিছু বাঁধা দিয়েও পুরো টাকার যোগাড় করে উঠতে পারেন নি, সবার কাছে হাত পেতেছেন। কিন্তু কী করলুম পাশ করে। পথে পথে ঘুরলুম,

কলকাতায় মেসে ছারপোকার কামড় আর সস্তার দোকানে চা খেলুম। নিজের দুঃখই ঘোচাতে পারিনি, সংসারের কথা ছেড়ে দাও।'

অতসী বললে, 'চাকরি পাওনি?'

'এ-অধ্যায়টুকু তুমি তো জান অতসী।' বলতে বলতে নীলাদ্রির কপালের শিরা স্ফীত হয়ে উঠল, 'সে-সময় আমার কোনরকম ব্যবস্থা হলে তোমাকে কি ওভাবে হাতছাড়া হতে দিই।' অতসী নীলাদ্রির একটা হাত টেনে নিয়ে বললে, 'ওকথা থাক।'

নীলাদ্রি শুনল না, বলে গেল, 'লজ্জার কথা কী বলব, কলকাতায় যখন থাকি, তখনও নিয়মিত বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি। বাবা তখন বুড়ো হয়েছেন, সংসার বেড়েছে, আর পারেন না, তবু টাকা পাঠিয়েছেন। ছোট বোনের বিয়ে দিলেন এক দোজবরের সঙ্গে, কেননা তারা বরপণ প্রায় কিছুই নেয়নি। সেই বোন—'

'বিধবা হল?'

'না', নীলাদ্রি ধীরে ধীরে বলল, 'গলায় দড়ি দিল। তারপর শোন। বাবাও মারা গেলেন পর বছর, তাকেও আত্মহত্যা বলতে পার, যদিও মৃত্যু রেজেস্ট্রিতে অন্য একটা রোগের নাম লেখা আছে। যে-বয়সে তাঁর চাকরি থেকে অবসর নেবার কথা, তখন তিনি সন্ধ্যার পর আরেকটা কাজ জুটিয়ে নিলেন।'

'আর তোমার সেই ভায়েরা?'

'সকলের খবর রাখি না। ওরা তো মানুষ হল না অতসী। কিম্বা ওদের মানুষ হতে দেওয়া হল না। একজন পালিয়ে গেল শখের এক যাত্রার দলের সঙ্গে। আর একজন, সেও পালাল, যার বাক্স থেকে শেষ যেটুকু সম্বল ছিল, তাই নিয়ে। পরে, শুনেছি সে একটি স্ত্রীলোকের বাড়ি তবলচি হয়েছিল। পরে তাকে খুন করে জেলে যায়।'

'সে কি এখনও জেলে?' অতসী রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করল।

'সম্ভব।' নীলাদ্রি বলল, 'তাই ত' ভাবি অতসী, আমাকে বাঁচাতে ওরা

দিদিমা তবু থামলেন না, পাখা নিয়ে বসলেন নীলাদ্রির পাশে।—'সে ছেলে এখনও আছে। আদিত্য ওকে একটা অনাথ আশ্রমে রেখেছে।'

আস্তে আস্তে খাট ধরে উঠে দাঁড়াল নীলাদ্রি। গুটিয়ে ফেলল বিছানা। সুধাকে বলল, 'তুমি আমাকে একটা রিক্‌শ ডেকে দেবে?'

'সে কি! এখনই কোথায় যাবে। আর দু'দিন যাক, আর একটু সেরে ওঠ। তারপর না-হয় কোন হাসপাতাল-টাসপাতালে খোঁজ করে—'

নীলাদ্রি ক্লান্ত কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'আর না মাসিমা। আপাতত একটা মেসে যাচ্ছি। তারপর হাসপাতালে সীট জোটে ভাল, নয় ত গাছতলায়—'

দিদিমা কানে আঙুল দিলেন, কিন্তু নীলাদ্রি ইতিমধ্যে ওর জিনিসপত্র বাক্সে তুলছিল, বাধা দিলেন না।

অতসী ইস্কুল থেকে ফিরে এসে চেঁচিয়ে উঠল, 'মা, নালুদা কই।'

দিদিমা উনুনে হাওয়া দিতে দিতে অবিচল গলায় বললেন, 'চলে গেছে।'

'চলে গেছে। ওর এই রোগ, উঠে বসা পর্যন্ত বারণ, তুমি ওকে যেতে দিলে?'

'কী করব।' দিদিমা তেমনি হাওয়া দিতে দিতে বললেন, 'জোর করে ধরে রাখতে তো পারিনে। মানা করেছিলুম। সুধাকে জিজ্ঞেস কর, সুধা সাক্ষী।'

'কাউকে জিজ্ঞাসা করবার আমার কিছু দরকার নেই। তুমি সত্যি করে বলত মা, তুমি ওকে তাড়িয়ে দাওনি?'

উনুনে কয়লা লাল হয়ে এসেছে। তবু উপুড় হয়ে ফুঁ দিতে দিতে দিদিমা বললেন, 'তাড়াব কেন, নীলু নিজেই গেছে।' অতসী তবু বিশ্বাস করছে না দেখে বললেন, 'গিরিডি গিয়ে আদিত্যের সঙ্গে তুই যে ছবি তুলেছিলি না? নীলু আজ সেটা দেখেছে।'

মুহূর্তের জন্য অতসী কোন কথা বলতে পারল না। তারপর কী বুঝি মনে পড়ে গেল, বলল, 'কী করে দেখবে? সে-ছবি তো আমার বাক্সের তলায় ছিল।'

'তুই আজ হয়ত ভুলে বাক্সের ডালা খোলা রেখে গিয়েছিলি!'

'বাজে কথা বল না, মা। গোপনে অন্য কারুর বাক্সে হাত দেবে নীলুদা?'

বিরস গলায় দিদিমা বললেন, 'কে কত যুধিষ্ঠির জানিনে বাপু। লোকটাকে চলে যেতে দেখেছি এই পর্যন্ত।'

সেদিন রাত্রে অতসী কাঁদল। ভূগর্ভপথে ঝর্ঝরধারে একটানা জল বয়ে যাচ্ছে, নারকেল পাতায় সরসর হাওয়া, অতসীর কান্না শোনা গেল না।

শুধু সুধা ঘুম ভেঙে উঠে দেখল, ভিজে বালিস, অতসীর চোখ দু'টি লাল। অবোধ কণ্ঠে বলল, 'তুমি কাঁদছিলে ফুলমাসি।'

অপ্রস্তুত অতসী সোজা কলঘরে চলে গেল। চোখে মুখে জল ঢেলে ফিরে এসে শাড়ি বদল করল।

'কোথায় যাচ্ছিস।'

'যমের বাড়ি।'

দিদিমা বললেন, 'কি কথার ছিরি।'

অতসী বলল, 'ঠিক যমের বাড়ি নয়, আদিত্য মজুমদারের ওখানে। আজ সাত দিন পূর্ণ হল, মনে নেই?'

আদিত্য মজুমদার বাড়ি ছিলেন না।

কিন্তু অতসীকে ওঁর খাস চাকর চিনত। বৈঠকখানার দরজা খুলে দিল।

সেই শুভ্র ফরাস, দেয়ালে বাঁধান মহাজন-বাণী।

সকালের কাগজগুলো নিয়ে অতসী কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল। একটা কাগজের একটি খবরের নিচে লাল পেনসিলের দাগ। অতসী কৌতূহলে টেনে নিল। আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কিত খবর, বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে কার জয়ের আশা কতটুকু তার সংক্ষিপ্ত আলোচনাও আছে। আলোচনার একটা অংশ শুধু আদিত্য মজুমদারের প্রশস্তি। তাঁর চরিত্রতেজ, ত্যাগ, নির্লোভ দেশ-সেবার সুবিস্তৃত ফিরিস্তি।

পড়তে পড়তে কখনও হাসি পেল অতসীর, কখনও ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে এল।

এমন সময় আদিত্য মজুমদার ঘরে এলেন হুড়মুড় করে। সঙ্গে আরও দু'টি ছেলে, বিশ-বাইশ বছরের। প্রথমে লক্ষ্যই করলেন না অতসীকে। ঘরের কোণে একটা আলমারির মধ্যে রাখা কতগুলো পোস্টার একজনের হাতে দিয়ে বললেন, 'এগুলো আজই দেয়ালে মেরে দেবে।'

'প্রভাত মল্লিকের লোকেরা যে ছিঁড়ে দেয়, স্যার।'

'ছিঁড়ে দেয়, আবার লাগাবে। কিম্বা তোমরা ওদের পোস্টার ছিঁড়ে দেবে। আর এই নাও।'

আদিত্য ট্যাঁকে হাত দিলেন, অতসী আড়চোখে চেয়েছিল, কিন্তু ঠিক কত টাকা আদিত্য দিলেন অনুমান করতে পারল না।

ছেলে দু'টি দরজা পর্যন্ত এগিয়েছিল, আবার ফিরল।

'একটা কথা বলতে এলুম, স্যার।'

'বল।'

'প্রভাত মল্লিকের বাসায় ভলান্টিয়ারেরা রোজ দু' বেলা—'

হাতখানি বরাভয় মুদ্রায় তুলে আদিত্য বললেন, 'এখানেও হবে। আসছে সপ্তাহ থেকে এখানেই দু' বেলা জলখাবার খাবে সবাই।'

'ওখানে স্যার লুচি মাংস—'

'এখানেও হবে। ইলেক্‌শনের তো এখনও মাসখানেক দেরি। ব্যস্ত কেন। প্রাণ দিয়ে এখন শুধু খেটে যাও সব। লাভের কথা ভেব না। আমাদের দেখ না একদিন দেশের টানে পথে বেরিয়ে এসেছিলুম, পূর্বাপর ভাবিনি।'

ছেলে দু'টি সরে পড়ল।

এতক্ষণে আদিত্য যেন দেখতে পেলেন অতসীকে।

'কী খবর, বল। ইলেকশনে শেষ পর্যন্ত প্রভাত মল্লিককেই সাহায্য করবে বলতে এলে বুঝি।'

স্থির দৃষ্টিতে আদিত্য মজুমদারের দিকে চেয়ে অতসী বলল, 'আত্মসমর্পণ করতে এসেছি।'

'বটে ?' কৃত্রিম উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন আদিত্য, 'ওরে দুয়ার খুলে দে রে, বাজা শঙ্খ বাজা।'

অতসী হাসল না। 'ঠাট্টা নয়। আমাকে দিয়ে আপনার কী কাজ হতে পারে, বলুন আদিত্যবাবু।'

'বলি, বলি, সবুর।'

বাইরের দরজার পর্দাটা টেনে দিলেন আদিত্য, ভিতরের দিকের কবাট ভেজিয়ে দিলেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে অতসী যখন বেরিয়ে এল বাইরে তখন ঝাঁঝাঁ রোদ। আদিত্যও এলেন পিছে পিছে।

'আমার গাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসুক তোমায় ?'

নমস্কার করে অতসী বলল, 'দরকার হবে না আদিত্যবাবু। কাজ শুরু করি আগে, এর পর সাধ মিটিয়ে মোটরে চড়ে নেব।'

'কাজ কিন্তু এখুনি আরম্ভ করতে হবে অতসী। সময় কই আর।' আদিত্যের গলায় নিরাসক্তি আর আগ্রহের মেঘ রৌদ্র খেলে গেল।

৭

সেদিন সন্ধ্যার গাড়িতে শশাঙ্ক এল।

ধুলোমাখা জুতো, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, আধময়লা জামাকাপড়।

প্রণাম করল মাকে, অতসীকে পা ছুঁতে দিল না।

দিদিমা বললেন, 'এবারে এত দেরি হল তোর।'

'অনেক জায়গায় ঘুরেছি যে।'

পর পর অনেকগুলো শহরের নাম করে গেল শশাঙ্ক। শেষে বলল, 'মেজদির ওখানেও গিয়েছিলাম।'

'মল্লিকার ওখানে? কেমন আছে ওরা।'

শশাঙ্ক সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, 'ভাল।'

সুধা একটু দূরে ভীরু ভীরু চোখে তাকিয়ে ছিল, শশাঙ্ক ওকে কাছে টেনে নিল।

'এই তিন মাসে অনেক বড় হয়েছিস তো। তোর মা তোর কথা বারবার জিজ্ঞাসা করছিল।'

অতসী বলল, 'তুমি হাতমুখ ধুয়ে নাও ছোড়দা। আমি একটু বেরুচ্ছি।'

দিদিমা বললেন, 'ঘুরলি তো অনেক। কাজের সুবিধে হল কিছু।'

'আমাদের এ-কাজের আবার সুবিধে। যে ক'টা অর্ডার আনতে পারি, সে-ক'টাই লাভ। এনেছি কিছু কিছু। আর কিছুদিন টিকে থাকতে পারলে—'

দিদিমা অপ্রসন্ন গলায় বললেন, 'আরও কিছুদিন? যা হয়, তাড়াতাড়ি একটা পাকা কিছু কর বাবা। নইলে—'

'নইলে কী মা।'

দিদিমা সুধাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে কী শুনছিস, যা বাইরে

যা।' গলা নামিয়ে বললেন, 'নইলে অতসীর জ্বালায় আর পারি না। মেয়ে আমার রোজগার করছে, তারই দেমাক কত।'

'বলে বুঝি।'

'বলে আবার না। উঠতে বসতে শোনায়। কী ঘেন্নায় যে মুখে ভাত তুলি সে আমিই জানি।'

সুধা যে দূরে যায়নি, বাইরেই কান পেতে আছে দিদিমা তা জানেন না। ফিস্ ফিস্ করে বলে যেতে লাগলেন, 'শুধু দেমাক হলেই এত কথা বলতাম না বাবা। ওর মাথারও আজকাল ঠিক নেই। কত কী যে দেখতে হচ্ছে—'

'সেই আদিত্য মজুমদারের সঙ্গে?'

'একজন হলে কথা ছিল কি। কোথা থেকে আবার জুটিয়ে এনেছিল নীলাদ্রি ছোঁড়াটাকে। এখানেই রেখেছিল। তা আমি চোখের ওপর অনাচার তো সইতে পারিনে, সেটাকে বিদায় করেছি।'

শশাঙ্ক গম্ভীর মুখে বসে রইল। অনেকক্ষণ পরে বলল, 'কিছু ভেবনা মা। সব ঠিক হয়ে যাবে। পাল কোম্পানী বলেছে আর মাস দুই পরেই আমার একটা মাইনে বেঁধে দেবে। উপরি কমিশন তো আছেই।'

চোখ বুজে দিদিমা বুঝি সুখস্বপ্ন দেখলেন খানিকক্ষণ, হয়ত তখন অতসীকে কী করে জব্দ করা যাবে মনে মনে ঠিক করলেন।

'তখন মল্লিকার আর একটা বাচ্চাকে এখানে এনে রাখা যাবে, কী বলিস।'

হাই তুলে শশাঙ্ক বললে, 'আনা তো উচিতই মা। যা অবস্থা দেখে এলাম ওদের। পাঁচ-সাতটা ছেলেমেয়ে একবাটি মুড়ি কাড়াকাড়ি করে খায়, ভাগা-ভাগি করে ফ্রক জাঙ্গিয়া পরে। রোগা টিঙ টিঙ করছে সব। তার একটা নিয়ে এলে মেজদি তো বেঁচে যায়।'

দিদিমা কিছুক্ষণ ভেবে চিন্তে বললেন, 'তবু ওরা ওখানেই পড়ে আছে? নীরদকে তুই তোদের অফিসে একটা কাজে ঢুকিয়ে দিতে পারিস না?'

'বলেছিলুম, জামাইবাবু রাজী না, মা। সে গ্রাম কিছুতে ছাড়বে না। আমাকে বললে তোমরা যারা শহরে পালিয়ে গেছ তারা ভ্রষ্টাচার, পতিত।

আসল ভারতবর্ষ আছে তার লক্ষ লক্ষ গ্রামে, গাছের ছায়ায়, ভিজে মাটিতে। আরও কত কী কবিত্ব, তুমি বুঝবে না মা।'

'কবিত্ব তো বুঝলুম, ওদের চলছে কিসে। নীরদ কিছু করছে?'

'টের পেলুম না, ঠিক! মনে তো হল বিশেষ কিছু না।'

'মল্লিকাকে জিজ্ঞেস করিসনি?'

'করেছিলুম। মেজদি একটু হেসে কথাটা এড়িয়ে গেল। মেজদি আমার সামনে বেশি তো আসেনি, মা। ভাল কিছু খেতে দিতে পারছে না, আদর যত্ন হত না, আড়ালে আড়ালেই থাকত। তা-ছাড়া,' শশাঙ্ক গলা পরিষ্কার করে বলল, 'মেজদির আবার বোধ হয় ছেলেপুলে হবে।'

সব ভুলে ছেলের সম্মুখেই দিদিমা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'গলায় দড়ি। খেতে দিতে পারে না, তবু বছরের পর বছর শূয়োরের পাল, লজ্জাও নেই। তবে সুধাকে এখানে এনে রেখে কী লাভ হ'ল।'

'লাভ এই হল, একজনের ভার কমে গেল। তাই আরেকটাকে—'বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল শশাঙ্ক। মার সামনে এ-সব কথা এত খোলাখুলি আলোচনা করা যায় না।

না যাক, সুধারও আর প্রয়োজন নেই। যেটুকু দরকার ছিল শুনে নিয়েছে। চোখ টলটল করে উঠল, সব বুঝেছে। কলকাতা পাঠিয়ে দেবার সময় মা যে ইনিয়ে বিনিয়ে বলেছিল, তোকে কোলছাড়া করতে আমার বুক ছিঁড়ে যাচ্ছে তবু তোকে মাসির কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে শুধু তোর ভালর জন্যে।

কী জন্যে, জানতে আজ আর সুধার বাকী নেই। আর একটা ট্যাঁ ট্যাঁ বাচ্চা আসবে, চুক চুক দুধ খাবে, কাঁথা ভাসিয়ে দেবে সেইজন্যে এই ষড়যন্ত্র। আর একটু বড় হোক না কোথায় থাকবে এই ষাট-ষাট আদর। মার কাছে তখন শুধু ঠাস ঠাস চড়। সুধার অবাক লাগল এই ভেবে, বাচ্চাদের এমনিতেই মা এত অপছন্দ করে, দিনরাত দূর দূর ছাই-ছাই ছাড়া কথা নেই, তবু বছর বছর এক একটা আনতেও ছাড়ে না কেন।

এই সমস্যাটাই সুধা পরদিন দুপুরে পেশ করল নূপুরের কাছে। চোখ বড় করে নূপুর বলল, 'বাচ্চাদের কি কেউ আনে, বাচ্চারা আসে।'

সুধা বারবার জিজ্ঞাসা করল কী করে, নূপুরদি, কী করে, নূপুর কিছুতে ভাঙল না। শুধু বলল, 'আমার মাও আমাকে কখনও বলেনি। কখনও বলত কুড়িয়ে পেয়েছি, কখনও বলত ভেসে এসেছিস। আমি বাবা সব জানি।'

'নিশীথদা বলেছেন?'

'দূর ঢের আগে থেকেই জানি। বই আমি কিছু কম পড়েছি ভেবেছিস। শুক না নিশীথ ডাক্তার ওকে আমি এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচতে পারি।'

চট করে সুধার চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে উঠল। তার মাও কোনদিন কিছু বলেনি তাকে। অনেকদিন আগে, তখনও বিন্দু, মিতু এরা হয়নি, সবে পীতু এসেছে। চামচিকের মত বাচ্চা একটা, রোগা, চিমসে, হাত পা নেড়ে কাঁদে, খেলা করে। ঘুময় যখন, ঠোঁট দু'টিতে ছোট্ট একটু কুঁড়ির মত হাসি মেখে থাকে।

বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ত সুধা, মাকে জিজ্ঞাসা করত, 'খুকি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসে কেন মা।'

মা বলতেন, 'চুপ, ও এখন ভগবানের সঙ্গে খেলা করছে। তুইও করতিস।'

'ওকে একটু ধরি?'

তাড়াতাড়ি মা ঠেলে দিয়েছেন সুধাকে। 'খবর্দার, ওর এখনও হাত-পা শক্ত হয়নি, মাথার তালু তুলতুল করছে, ওকে তুমি নাও, পড়ে যাক, জন্মের মত খোঁড়া হয়ে থাক। তোর বড় হিংসে, সুধা?' সুধা আর কোনদিন পীতুকে ছুঁতে চায়নি।

পর-বছর এল বিন্দু। তখন মা নিজেই পীতুকে তুলে দিলেন সুধার কোলে। হাতে ঝিনুক-বাটি দিয়ে বললেন, 'বসে বসে খাওয়া দেখি। এত বড় মেয়ে হয়েছিস, কোন কাজ যদি শিখে থাকিস।'

যে পীতুকে মা পুরো একটা বছর সাবধানে আগলে রেখেছেন, ছুঁতেও দেননি, আস্তে আস্তে তাকে সুধার হাতে একেবারে ছেড়ে দিলেন। কাঁথা বদলান পর্যন্ত। ঘেন্না করত সুধার, বমি আসত, বলত না কিছু।

পীতুর দুধ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, মা বাটিতে করে বার্লি জ্বাল দিয়ে রাখতেন। পীতু খেতে চাইত না, শরীর শক্ত করে দাঁত চেপে থাকত। ওই বয়সেই কম দুষ্টুমি শেখেনি।

সুধা বলতে, 'পীতু বার্লি খেতে চায় না মা।'

'খাবে খাবে। তুই এখনও ভাল করে ঝিনুক ধরতেই শিখিসনি। ওর ঘাড়টা অত শক্ত করে চেপে ধরেছিস কেন, মটকে দিবি নাকি। হতচ্ছাড়া মেয়ে, এখনও তোমার হিংসে গেল না।'

চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছে সুধার। মাকে কী করে বোঝাবে ওর মনে এতটুকু হিংসে নেই। পীতু যদি বার্লি খেতে না চায়, সে কি তার দোষ। তারপর থেকে পীতুকে একটু একটু ভাত খাওয়ানো শেখান হতে থাকল।

বিন্দুকে দেখেও সুধার অবাক লেগেছিল। সেই ছোট্ট হাত-পা, খেলা করে, ঘুমিয়ে হাসে।

'ও-ও ভগবানের কাছ থেকে এসেছে মা?'

মা চট্ করে জবাব দেননি। একটু ভেবে বলেছিলেন, 'না ওকে আমি হরিমতী বোষ্টুমীর ঝুলি থেকে কিনে নিয়েছি।'

খটকা লেগেছে, সুধা কিছু বলেনি। দু'জনে তো ছিলই, তবু মা আরেক-জনকে কিনে নিতে গেলেন কেন।

আরও একটু বড় হয়ে সুধা জেনেছিল, মিথ্যে কথা, হরিমতী বোষ্টুমীর ঝুলিতে বাচ্চা নেই।

কোথায় আছে তবে। এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই সুধার চোখের সামনে আর একটা ছবি ভেসে উঠল। তখন অর্থবোধ হয়নি, আজও যে খুব স্পষ্ট তা নয়, তবু কোথায় যেন দুটোর মধ্যে একটু সম্পর্ক আছে।

বাবার সঙ্গে মার বনিবনা ছিল না মোটে, দিনরাত খিটিমিটি লেগেই থাকত। বাবা সবচেয়ে বেশি বকুনি খেত যেদিন বাজার খরচের পয়সা না থাকত।

সারা সকাল কোথা থেকে ঘুরে টকটকে মুখচোখ নিয়ে ফিরে বাবা যদি বলেছেন, 'কই গো, কী খাবার আছে নিয়ে এস'—মা গম্ভীর মুখে বলেছেন, 'উনুনের ছাই আছে, তাই বেড়ে দিচ্ছি।'

বাবা আর দাঁড়াতেন না, ফের বাড়ি থেকে সরে পড়তেন। তারপর হয়ত দিন দুই কথাবার্তা বন্ধ।

সন্ধ্যার অন্ধকারে বাসায় ফিরে বাবা বলেছেন, 'সুধা, তোর মা কই রে।'

'মা গেছে পাশের বাড়ি।'

বাবা বলেছেন, 'এই বেলা তবে আমার খাতাটা দে। পালাটার শেষ অঙ্ক লিখে ফেলি।'

'কিসের পালা, বাবা।'

পালার নাম আত্মবলি বা সতীর মহিমা। গোটা জেলা ঘুরে ঘুরে বাবা কত গল্প যে সংগ্রহ করেছিলেন হিসাব নেই। অসংখ্য গানও বেঁধেছিলেন।

'শুনবি একটু?'

মাদুর বিছিয়ে টিমটিমে আলোয় দু'জন বারান্দায় বসেছে। বাবা গাঢ় গলায় পড়ে গেছেন। যেখানে মেয়েদের পার্ট সেখানে গলাটা অস্বাভাবিক সরু করেছেন, সুধা ফিক করে হেসে ফেলেছে।

পড়া থামিয়ে বাবা জিজ্ঞাসা করেছেন, 'ভাল লাগছে না তোর।'

অত বড় মানুষটা, সুধাকে যার পাশে মনে হয় পিঁপড়েটি, তিনি সুধার মুখে একটু প্রশংসা শোনবার জন্যে লজ্জা-ভয় মেশান চোখে চেয়ে আছেন, সুধার কেমন অস্বস্তি বোধ হ'ত। বলত, 'ভাল লাগছে বাবা।'

'তবে এইটুকু শোন।'

বাবা ফের শুরু করতেন। সুধা কিছু বুঝত না। বাড়ির সামনের ঝোপটায় জোনাকির জ্বলা-নেবা, ঝিঁঝিঁর ডাকের সঙ্গে বাবার তন্ময় আবৃত্তি এক হয়ে মিশে যেত, সুধার চোখ ঢুলে পড়ত ঘুমে।

'এই পালাটা এবার কালীপুজোয় চৌধুরীবাড়ি হবে। চৌধুরীরা আমাকে নগদ পঞ্চাশটা টাকা দেবে জানিস। টাকাটা পেলে তোর মা আর কিছু বলবে না, কি বলিস। এই সুধা, ঘুমুলি।'

জড়িত গলায় সুধা বলেছে, 'না বাবা।'

ঠিক তখনই খিড়কি দরজা খোলার শব্দ এসেছে। বাবা তাড়াতাড়ি খাতা-পত্র গুটিয়ে বলেছেন, 'তোর মা এল। তুই এবার যা সুধা। আমি পালাই।'

ধীরে ধীরে রাত বেড়েছে। বাবা কখন পা টিপে টিপে ফিরে বারান্দার মাদুরেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন কেউ খেয়াল করেনি।

মাঝরাতে বিন্দুর কাঁথা বদলাতে গিয়ে প্রথম হয়ত চোখে পড়েছে মা'র। পা টিপে টিপে বাইরে গেছেন। সুধার চোখ দুটোই বন্ধ শুধু, কান দুটি তো খোলা।

'এখানে শুলে অসুখ করবে, ভেতরে চল।'

জড়িত স্বরে বাবা কী জবাব দিয়েছেন শোনা যায়নি।

'পায়ে পড়ি, চল।'

'না। এই বেশ আছি।'

'তবে আমিও এখানে শুই।'

'তোমার অসুখ করবে, তুমি ভিতরে যাও।'

'না।'

'বিন্দু কাঁদবে।'

'কাঁদুক।'

তারপরে আর কিছু সুধা জানে না। জাল দেওয়া দুধের মত অস্থির উত্তেজিত মনে আবার কখন ঘুমের সর পড়েছে।

সেবার মার কোলে এল নীলু।

মা এবারে লুকতে চেয়েছিলেন, পারেননি, সুধার চোখে ধরা পড়ে গেছেন।

'তুমি বমি করলে মা!'

চোখ দুটি বাষ্পাভ, তবু মা চেঁচিয়ে উঠেছেন, 'পালা তুই এখান থেকে।'

সুধা তবু সরেনি। কাঁপতে কাঁপতে মা উঠে এসে ওর চুলের মুঠি ধরেছেন। 'গেলি, গেলি তুই?'

কোথা থেকে এসে বাবা সামনে দাঁড়িয়েছেন।

'ওকে মারছ কেন তুমি?'

এবার মা আর নিজেকে সামলাতে পারেননি, বিকৃত গলায় চীৎকার করে বলেছেন, 'দূর হও, দূর হও, তুমি। ছি ছি, আবার আমার এই সর্বনাশ করলে?'

অপরাধীর মত বাবা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থেকেছেন, দেখে সুধার অবাক লেগেছে।

মা মাঝে মাঝে বিছানা নিয়েছেন, বাবা তখন খাতাপত্র কুলুঙ্গিতে তুলে রান্নাঘরে ঢুকেছেন। বাচ্চাদের নাওয়ান, খাওয়ান সব ভার তুলে নিয়েছেন। বিছানায় শুয়েও মার তেজ পড়েনি। সমানে গালাগালি করেছেন বাবাকে। আশ্চর্য, বাবা একটুও রাগ করেন নি।

তার আবার ভাই হবে, সুধা অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে এটুকু বুঝেছে। শুধু বোঝেনি বাবার এই মাথা নিচু লজ্জা কেন।

৮

ফোন তুলেই আদিত্য বললেন, 'হ্যালো।'

'আমি অতসী।'

'কী খবর?'

'বিশেষ কিছু না। আজ বিকেলে আপনার গাড়িটা আমার চাই।'

'একেবারে গাড়ি!'

'পাব না?'

'অবশ্যই পাবে। কিন্তু কেন?'

অতসী এক মুহূর্ত কী ভেবে বলল, 'ইলেকসন ক্যাম্পেন। আজ বিকেল
কই শুরু করব ভাবছি।'

'এ ত' সুবুদ্ধি। কিন্তু প্ল্যান যে ভাল করে করাই হল না।'

'কাজ ত' শুরু করে দিই, প্ল্যান পরে।'

'বেশ। বিকেলে গাড়ি যাবে।'

ইস্কুল থেকে ফিরে অতসী জামাকাপড় ছাড়ল না, সুধাকে বললে, 'বেড়াতে
বে?'

'কোথায় ফুলমাসি?'

'অনেক দূর।'

'ট্রামে করে?'

'দূর। সেখানে ট্রাম যায় না। গাড়িতে। নিচে কত বড় গাড়ি এসে
ড়িয়েছে, দেখবি।'

সুধা দেখল, সত্যিই বড়। সদর দরজায় চৌকাঠ জুড়ে তো আছেই আরও
নকটা ছাড়িয়ে গেছে। সামনের আসনে সাহেবি পোশাক-পরা একটা লোক,
কেই ফুলমাসি হিন্দীতে কী একটা হুকুম করল, লোকটা টুপি ছুঁয়ে বলল, জী।

সুধা বিস্ময় না মেনে পারল না।

গাড়ির চাকা গড়াতে শুরু করল।

ওদের গলি পেরিয়ে, ট্রাম রাস্তা ছাড়িয়ে, অনেক পুলের ওপারে, গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় ঠেলে, পাশ কাটিয়ে, নির্জনতর শহরতলীর মসৃণ পথে পড়ল। প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর অতসী বলল, 'রোকো।'

'এখানেই নামব, ফুলমাসি?'

অতসী বলল, 'এখানেই। বেশি জোরে কথা বলিস নি, এটা হাসপাতাল।'

ফুলমাসির আঁচলের ভাঁজে একগোছা ফুল ছিল, সুধা এতক্ষণ দেখেনি। উৎসুক চোখে তাকাতেই অতসী বলল, 'একজনকে দেব।'

রুগ্ন হাত বাড়িয়ে দিল নীলাদ্রি, ফুলগুলি গালে রাখল, কপালে, বুক ভরে আঘ্রাণ নিল। পাপড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এগুলো কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই পারতে অতসী, নিজে এলে কেন?'

অতসী জবাব দিল না।

নীলাদ্রি বলল, 'বড় ছোঁয়াচে রোগ। দেখছ না, আমার নিঃশ্বাসে পাপড়ি-গুলোও এরই মধ্যে কেমন শুকিয়ে উঠেছে?'

'তুমি কেন আমাকে না বলে চলে এলে নীলুদা?'

নীলাদ্রি ম্লান হাসল। —'এসে তো ভালই করেছি অতসী। দুজনে মিলে মরবার ফন্দি আঁটছিলুম, এ বরং ভাল হল। একজনের বাঁচবার রাস্তা তো খোলা রইল।'

'আমার বাঁচবার রাস্তা?'

বিছানার ওপর রাখা অতসীর একটা হাত কুড়িয়ে নিয়ে নীলাদ্রি বলল, 'তোমারও। লজ্জা পেও না অতসী, আমি মাসিমার কাছে শুনেছি। আদিত্য মজুমদারকে বিয়ে কর।' আর একটু সময় নিয়ে নীলাদ্রি দ্বিধাটুকু জয় করল— 'আর, সম্ভব হয়ত তোমার ছেলেটিকে নিজের কাছে এনে রেখ।'

পশ্চিমের জানালা দিয়ে দিনের শেষ রোদ্দুর পড়েছিল অতসীর মুখে, হঠাৎ

এক টুকুরো মেঘ এসে ছায়া ফেলল। মুখ ঢাকা দিতে নিজের হাতখানা ছাড়াতে চেষ্টা করল একবার, পারল না, কয়েক ফোঁটা জলে চোখের পাতা ভিজে উঠল। মুখ না ফিরিয়েই বলে উঠল, 'তুই বারান্দায় গিয়ে একটু দাঁড়া সুধা, আমি এখুনি আসছি।'

দু' মিনিট পর অতসী যখন ঘর থেকে বেরল, ওর স্তম্ভিত গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল সুধা। কোন কথা না বলে ফুলমাসির পিছন পিছন চলতে থাকল।

মোটরের দরজা খুলে দিয়ে আদিত্য বললেন, 'এস অতসী।'

অতসী দু-পা পিছিয়ে গেল। অন্ধকারে একটা সাপ বুঝি পড়েছে পায়ের নিচে।

'আপনি—এখানে?'

আদিত্য হাসলেন। —'আমার ইলেকসন ক্যাম্পেন হচ্ছে, আমি আসব না। এস ভেতরে এস, তিনজনেরই জায়গা হয়ে যাবে।'

সুধা রইল মাঝখানে। আবার সেই পিচঢালা কাল পথ, দু'পাশে খোলা নর্দমা, কল-কারখানা, চিমনি, বাগান-বাড়ির সারি। সুধার চোখ সেদিকে, কান আদিত্য মজুমদারের কথায়।

'আমারই ভুল হয়েছে, অতসী। ইলেকসনে নামব, তোমাকে বোধ হয় শুধু এইটুকুই বলেছিলুম। কোন্ ওয়ার্ড বলা হয়নি। কিন্তু শহরের বাইরে এত দূরে যে কর্পোরেশনের ওয়ার্ড থাকে না, সেটা তো তোমারও বোঝা উচিত ছিল।'

অতসী জবাব দিল না। আদিত্যও তারপর থেকে চুপ করে গেলেন। কী করে খোঁজ পেয়েছিলেন, অতসী এই হাসপাতালে এসেছে, ভাঙলেন না, অতসীও জানতে চাইল না।

মসৃণ পথে গাড়ি অনায়াসে নিঃশব্দগতিতে ছুটতে থাকল।

পুল পেরিয়ে ফের ওরা যখন শহরে পৌছল, তখন রাস্তার দুপাশে আলো জ্বলে গেছে, দোকানে দোকানে ভিড়, ফুটপাথে একটানা একঘেয়ে জনস্রোত। সেই সঙ্গে টিপ টিপ বৃষ্টি।

গাড়ি অতসীকে বাড়িতে নামিয়ে দিল না, আদিত্যর বাসার দিকেও গেল না। সদর রাস্তা ছেড়ে স্যাঁতসেঁতে গলি ধরল, অনেক এঁকে বেঁকে ঘুরে ফিরে যে-বাড়ির সামনে দাঁড়াল, তার চেহারা দেখে অতসীর বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল।

কালী মার্কা সাইনবোর্ডে দেশী একটা মদের দোকানের নাম লেখা, তাঁর দোতলার রেলিংয়ে আর একটা টিনের চাকতি আঁটা—'গোবিন্দ অপেরা পার্টি'। পান-সিগারেটের দোকানে থরে থরে সাজান সোডার বোতল, সিরাপের খালি শিশিতে লাল-নীল জল।

গাড়ির দরজা খুলে আদিত্য নেমে পড়লেন, 'এখানে আমার একটু কাজ আছে অতসী, তোমরা ব'স, আমি ফিরে এলুম বলে।'

বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে, গাড়ির জানালার কাচ ঝাপসা, গ্যাসের আলো নিবু নিবু।

'এ কোথায় নিয়ে এলেন আদিত্যবাবু?'

আদিত্য বললেন, 'আমার ওয়ার্ড। এদিকটা তুমি বোধ হয় চেন না। তুমি সারা বিকেল ধরে ক্যাম্পেন করেছ, এবার আমাকে একটু করতে দাও?'

ঘুঙুরের বোলের সঙ্গে তবলার তাল, আধ-অন্ধকার গলিতে বৃষ্টির রিমঝিম। অতসী বিবর্ণ মুখে বলে উঠল, 'এ তো ভদ্রপাড়া নয়, আদিত্যবাবু?'

'নয়ই তো', আদিত্য নির্বিকার গলায় বললেন, 'এ হল জীবনের সেলাই-করা দিক।'

দু হাতে মুখ ঢেকে অতসী বলল, 'আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলুন আদিত্যবাবু, বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসুন। আমি বসে থাকতে পারব না।'

'পারবে না?'

হাত বাড়িয়ে আদিত্যের হাত দুটি ধরে ফেলল অতসী, কনুই অবধি জলের ধারায় ভিজে গেল।—'আমাকে আর যা খুশি শাস্তি দিতে চান দিন, শুধু এখানে ফেলে রেখে যাবেন না।'

ও-পাশের রক থেকে কে একজন শিস্ দিয়ে উঠল, স্খলিত গলায় অশ্লীল

একটা গানের কলি গেয়ে উঠল আর একজন, মোড়ের দোকানের সম্মুখে একটা পাহারাওয়ালা খৈনী টিপছিল, সে কর্কশ বুলিতে কাকে যেন ধমক দিয়ে উঠল।

আদিত্য বললেন, 'ওরা তামাসা দেখছে অতসী। এখানে বসে থাকতে সাহসে না কুলোয়, তুমিও এস না!'

'আমি!' প্রথমে অতসীর মনে হল ভুল শুনেছে। এই নোংরা গলির বৃষ্টি-ঝাপসা সন্ধ্যায় কোন কিছুই বুঝি অসম্ভব না। একবার অতসী ঝুঁকে পড়ে দেখল সুধা ঘুমিয়ে পড়েছে।

'আসবে নাকি?'

কী যাদু ছিল আদিত্যের কণ্ঠে, অতসী সম্মোহিতের মত নেমে পড়ল।

গুটিকয় মেয়ে সরু প্যাসেজে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ছিল, ওদের দেখে হাতের বিড়ি ফেলে জড়সড় হয়ে দাঁড়াল, মুখ চাওয়া চাওয়ি করল নিজেদের মধ্যে। আদিত্য একজনকে নিচু গলায় কী জিজ্ঞাসা করলেন, সে আঙুল দিয়ে সিঁড়ি দেখিয়ে দিল।

ওদের পেরিয়ে ভিতরে উঠানে পা দিতেই পিছন থেকে খিল খিল হাসি শোনা গেল। আড়ষ্ট হয়ে গেল অতসীর দেহ, দাঁতে ঠোঁটে চেপে আদিত্যর পিছন পিছন এগুতে থাকল।

মাঝবয়সী মোটাসোটা একটি স্ত্রীলোক দোতলার রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল, এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই?'

তারপর, আদিত্য কিছু বলবার আগেই মুখ টিপে বলল, 'বুঝেছি।'

কী বুঝেছে ভাঙল না, পুষ্ট কোমরে রাখল একখানা হাত, আরেকটা থলথলে হাত বাড়িয়ে অতসীর থুতনী ধরে বলল, 'দেশ থেকে কলকাতায় ও তোমাকে এনেছে কদ্দিন?'

এক ঝটকায় হাতখানা সরিয়ে দিল অতসী, কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়াল।

সেই হাতটাই গালে রেখে স্ত্রীলোকটি অবাক হবার ভঙ্গি করল।

আদিত্যকে বলল, 'এখনও বিষদাঁত ভাঙে নি যে গো, পোষ মানে নি। তা

এসব জিনিস এখানে গছিয়ে রেখে যে সরে পড়বে বাপু, সেটি হচ্ছে না। ওঅরে বড্ড হুজ্জোত। পোষ-না-মানা ছুকরি লুকিয়ে রাখলে পুলিশে হাঙ্গামা করে। অহল্যা বাড়িউলি ওসবের মধ্যে নেই। নিজের বাড়িতে নিয়ে রাখার সাহস না থাকে ত' অন্তত্তর চেষ্টা দেখ।'

এমন যে সপ্রতিভ আদিত্য, তিনিও যেন মুহূর্তেক স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, মুখে চট করে কথা যোগাল না। গলা পরিষ্কার করে অনেক কষ্টে বললেন, 'আপনি—তুমি ভুল বুঝেছ। আমি—'

গালে রাখা হাতখানা স্ত্রীলোকটি নামিয়ে নিল, অবাক হয়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, ফের বলল, 'বুঝেচি। তোমরা থিয়েটারের নোক। আমার এখানে এয়েচ মেয়ের খোঁজে। তা ওসব হবে-টবে না বলে দিলুম। থেটারে গেলে ছুঁড়িগুলো আর ফেরে না, কারুর না কারুর নজরে পড়ে, শেষ অবধি একটা বাবু জুটিয়ে সটকে পড়ে।'

অতসী কাঠ হয়ে শুনছিল। অস্ফুট-স্বরে বলল, 'এখান থেকে চলুন আদিত্যবাবু।'

স্ত্রীলোকটি বলল, 'কেন বাছা, ঘেন্না হচ্ছে? তা বাপু, অত যদি ঘেন্না, তবে আসাই বা কেন, আর এই সময়ে, যখন খদ্দের লক্ষ্মীর আসবার সময়।'

আদিত্য সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেললেন, 'আমি এবার ইলেকসনে দাঁড়াচ্ছি, তোমরা যদি ভোটগুলো আমাকে—'

স্ত্রীলোকটি ইলেকসন বুঝল না, ভোট বুঝল।

'হরি, হরি, তাই বল, তুমি ভোট নিতে এয়েচ। তা এমন অসময়ে কেন বাপু, সকালের দিকে এলেই তো পারতে। গঙ্গাচ্চান করে ফিরি আটটায়, তারপর সারাদিনই আমার ফুরসৎ। তা ভোট নেবে ভাল, কিন্তু এ-মেয়েটাকে এনেচ কেন।'

আদিত্য বললেন, 'ইনি আমার হয়ে প্রচার করছেন, একজন কর্মী। আমার কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ, আদিত্য মজুদার। সারা জীবন দেশের কাজ করেছি—'

স্ত্রীলোকটি ফিক করে হেসে বলল, 'তুমিই সেই ?'

আদিত্যের সাহস বেড়ে গেল, বললেন, 'শুনেছ তা হলে ?'

'শুনিচি, দেখেচি। দেয়ালে দেয়ালে তোমার নাম-ছাপান কাগজ পড়েচে যে গো। আদিত্য মজুমদারকে ভোট দিন, ইনি দেশব্রতী, সন্ন্যাসী—তুমি সত্যিই সন্নিসি নাকি গো ? বে'থা করনি ?'

আদিত্য প্রশ্নটা কানে না তুলে বললেন, 'আমি ইলেকসনে জিতলে তোমাদের যথাসাধ্য উপকার করব।'

হেসে উঠল স্ত্রীলোকটি, মোটা মোটা কয়েক গাছি বালা বাজল যেন।

'শোন কতা। আমাদের কী উবগার করবে তুমি? বারাণসীধামে বাড়ি তৈরি করে দেবে ? ফুঃ, বয়েসকালে দশ বছর আমার কাছে বাঁধা ছেল সোনারগাঁয়ের গোবিন্দ চৌধুরী, তাকে বলে বলেও একটা বাড়ি বাগাতে পারলুম না—লোকটা তো শেষ পর্যন্ত লিভার পচেই ম'ল—তো বাড়ি দেবে তুমি। ফুঃ।'

'বাড়ি দেব বলিনি তো ?' আদিত্য ভয়ে ভয়ে বললেন।

'তবে আমার কোন্ ছেরাদ্দের উবগার করবে। বেশ, আর কিছু না পার, অন্তত পুলিশের উৎপাত কমিয়ে দাও দিকিনি। আজ এসে বলে, তোমার বাড়ির মেয়ে রাস্তা থেকে লোকের হাত ধরে টেনে এনেচে, থানায় চল; কাল এসে বলে, তোমার ঘরে চোলাই মদ আছে বের কর, ওদের টাকা খাওয়াতে খাওয়াতে আমার সর্বস্ব গেল। পারবে তুমি পুলিশের জুলুম থামাতে ?'

'চেষ্টা করব', আদিত্য বললেন।

একমুখ হেসে স্ত্রীলোকটি বলল, 'ভয় পেওনি, ভোট তোমাকেই দেব, আমি কেন, আমার বাসার সব্বাই। শুধু গাড়ি করে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু—সেবারও আমাদের মোটরে করে নিয়ে গেশল—আর ভরপেট লুচি-মাংস খাওয়াতে হবে।'

আদিত্যে অতিশয় কৃতার্থ কণ্ঠে বললেন, 'গাড়ি পাঠাব। খাওয়াব।'

স্ত্রীলোকটি বলল, 'এ-পাড়ার আরও দশ-বিশটে ভোট তোমাকে পাইয়ে দেব।

কিন্তু তারা বাড়িউলির বাড়ির একটি ভোটও পাবে না কিন্তু, বলে রাখলুম। তোমার সঙ্গে লড়ছে যে প্রভাত মল্লিক, তার নায়েবের আবার ও-বাড়িতে খুব যাওয়া-আসা।'

আদিত্য ফেরবার উপক্রম করছিলেন, পিছন পিছন নেমে এসে স্ত্রীলোকটি চাপা গলায় বলল, 'দু'পয়সা যদি খরচা করতে পার তো তোমাকে আরেকটা বুদ্ধি বাতলে দি। গেরস্ত ঘরের বৌ-ঝিদেরও অনেকের ভোট থাকে, কিন্তু তাদের অনেকেই যেতে চায় না। আমার বাড়ির মেয়েরা সেয়ানা আছে, একটু তামিল দিলে গেরস্ত মেয়েমানুষের হয়েও ভোট দিয়ে আসতে পারে। তোমার তাঁবুতে তুমি শুধু বিশ জোড়া রঙ বেরঙের শাড়ির বন্দোবস্ত রেখ। আমার মেয়েরা শাড়ি আর নাম পাল্টে-পাল্টে ভোট দিয়ে আসবে, কেউ টেরটি পাবে না। তবে এ-কাজে কিন্তু খরচা আছে তোমাকে আগেই বলে দিলুম।'

আদিত্য ঠিকানা দিলেন স্ত্রীলোকটিকে। বললেন, 'কাল-পরশু সকালে আমার সঙ্গে দেখা কর।'

গাড়ি গলি থেকে বড় রাস্তায় পড়তে আদিত্য বললেন, 'দেখলে তো, এদের ব্যাপার। টাকার লোভে এরা না পারে হেন কাজ নেই।'

অতসী উত্তর দিল না।

একটু অপেক্ষা করে আদিত্য বললেন, 'কী ভাবছ?'

মুখ থেকে হাত সরিয়ে চোখ তুলে তাকাল অতসী। বিষণ্ণ, অবসন্ন গলায় বলল, 'এদের সঙ্গে আমার কতটুকু তফাৎ তাই ভাবছি।'

আদিত্য নিজের বাড়ি নেমে গেলেন। শোফারকে বললেন, অতসী আর সুধাকে পৌঁছে দিতে।

বৃষ্টি থেমেছে, কিন্তু পথ-ঘাট কাদা। সুধার একটু পরেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ওদের গলির দিকে গাড়ি ঘুরতেই আরেকটা গাড়ির মুখোমুখি পড়ে গেল। সুধা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল, পিছনের সীটে নূপুরের মা। পাশের ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারল না। তিন-চার সেকেণ্ড সময়, ভাল করে

দেখারও সুযোগ হল না। সুধা আড়চোখে চেয়ে দেখল ফুলমাসিও দেখেছে কি না।

দেখেনি। সেই থেকে যে দুহাতে মুখ ঢেকে বসে আছে অতসী, খুলল একেবারে বাড়ির দরজার সুমুখে এসে।

দিদিমা বললেন, 'এত রাত অবধি কোথায় ছিলি অতসী?'

অতসী বলল, 'কাজ ছিল।'

দিদিমা বললেন, 'সেই থেকে কচি মেয়েটাকেও সঙ্গে নিয়ে নিয়ে ঘুরছিস। তোর কি আক্কেল হবে না।' একটু থেমে বললেন, 'শশাঙ্কও রাগ করছিল।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল অতসী। 'ছোড়দা রাগ করবার কে?'

দিদিমা হাত জোড় করে বললেন, 'আমার ঘাট হয়েছে মা, দোষ নিও না। এত রাতে চেঁচামেচি করে একটা হাঙ্গামা কর না। শশাঙ্কর রাগ করবার জোর নেই আমি জানি। তোমার নিজের ভাত-কাপড় তুমি নিজেই রোজগার করচ।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অতসী তিক্তস্বরে বলল, 'শুধু আমার কেন মা, তোমাদের সকলের।'

৯

কিন্তু শশাঙ্ক এত সহজে ছাড়ল না।

পরদিন সকালে গম্ভীর গলায় বলল, 'তোর সঙ্গে একটা কথা আছে অতসী।'

চায়ের বাটি নামিয়ে রেখে অতসী বলল, 'বল।'

শশাঙ্ক একটু ইতস্তত করল, তার পরে বলে ফেলল, 'ইয়ে, মানে, মা বলছিলেন, তুই যখন তখন যেখানে সেখানে ঘুরিস—স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিস—'

'করিই ত'।'

'এটা ভাল না।'

অতসী ঠিক করেছিল রাগ করবে না। বলল, 'তোমার চেয়ে বয়সে আমি তো মোটে বছর দুয়েকের ছোট ছোড়দা। ভাল-মন্দ বোঝার ক্ষমতা হয়নি?'

শশাঙ্ক বলল, 'রাগ করিসনি, মাথা ঠাণ্ডা করে শোন। white, free and twenty-one, এ সব হল নাটুকে কথা। বেপরোয়া চলাফেরা করায় মেয়েদের একটু অসুবিধে আছেই।'

চায়ের বাটির তলানিটা চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে অতসী বলল, 'চাকরি করতে হলে পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করতেই হয় ছোড়দা।'

শশাঙ্ক বলল, 'তবে তুই চাকরি ছেড়ে দে অতসী। এর চেয়ে শ্বশুরবাড়ি ফিরে গেলেও ভাল করবি।'

শুকনো হাত-গড়া রুটি নখ দিয়ে ছিঁড়তে ছিঁড়তে অতসী বলল, 'আজ তুমি একথা বলছ ছোড়দা, কিন্তু যেদিন ও-বাড়ির জ্বালা সইতে না পেরে ফিরে এসেছিলুম, সেদিন তো বলনি? সেদিন তোমার জেলে যাওয়ার নেশা ছিল, চাকরি

জোটেনি, নিশ্চিন্ত হয়ে ভেবেছিলে ভালই হল, এবার ওর ঘাড়ে সংসারের দায়িত্ব চাপিয়ে মনের সাধ মিটিয়ে দেশোদ্ধার করতে পারব। আজ বুঝি দু'টো পয়সা আসছে তাই ফের আমার পায়ে শিকলি পরাতে চাইছ?'

ছেঁড়া রুটির এক টুকরো মুখে পুরে অতসী ফের বলল, 'তা হয় না ছোড়দা উনিশ শ' বিয়াল্লিশ আর একান্ন কি এক। একবার রক্তের স্বাদ যে পেয়েছে, তার মুখে কি আর নিরামিষ রোচে।'

দিদিমা আড়ালে ছিলেন, দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'বেহায়া, বজ্জাত। নিরামিষ মুখে রুচবে কেন, রুচবে হাসপাতালে গিয়ে একটা মরতে-বসা রুগীর সঙ্গে ঢলাঢলি। এই সব করবে বলেই তো পালিয়ে এসেছ শ্বশুরবাড়ি থেকে, ধর্মে মন নেই, বাচ্চাটাকে পর্যন্ত ফেলে রেখেছ অনাথ আশ্রমে।'

অতসীর মুখ সাদা হয়ে গেল। তীব্র আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'মা!'

সেই আহত নিষ্ঠুর পাণ্ডুর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে দিদিমাও কোন কথা বলতে পারলেন না।

টলতে টলতে ঘরে ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়ল অতসী। অকূল আকুল কান্নায় চিত্ত উদ্বেল হয়ে উঠেছে, পর মুহূর্তে শুষ্ক একটা জ্বালাময় মরু ফুৎকারে *সব শুকিয়ে যাচ্ছে। কেউ নেই তার সংসারে, কেউ নেই। স্বামী না, সখা না, সন্তান না। সন্তানও না! ভাবতেই অতসীর সর্ব দেহমনে একটা শিহরণ* বয়ে গেল, ছিল তো সব। শিথিল মুঠো থেকে সব ঝরে পড়েছে একে একে। শুষ্ক উষ্ণ একটা ঘৃণা কয়েক কোঁটা তপ্ত জল হ'য়ে অতসীর চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল, অক্ষম একটা আক্রোশ হাতের আঙুলে কঠিন হয়ে উঠল। এই শহরটা তার সব কেড়ে নিয়েছে একে একে। তাকে ঘর দেয়নি, শান্তি দেয়নি, সম্মান দেয়নি। সামান্য একটু মনুষ্যত্ব এখনও বুঝি পড়ে আছে তলানির মত, সেটুকুও কেড়ে নেবে বলে হাত বাড়িয়েছে।

দিদির কথা মনে পড়ল। সে তো পালিয়ে গিয়ে ঘর পেয়েছে, স্বামী, সন্তান, শান্তি। কিন্তু সুখ? কে জানে অর্ধাসনে, অ-বসনে দিনের পর দিন কাটান আর বছরের পর বছর ছেঁড়া কাঁথায় সন্তান প্রসব করাই মেয়েদের কাছে সুখ-

শাস্তির প্রতিশব্দ কিনা। দিদি, যে দূর পাড়া-গাঁয়ে নির্বাক নির্বিকার হয়ে হোঁসেল আর আঁতুড়ের মধ্যে শান্টিং করছে, হয়ত বলতে পারবে।

উঠে গিয়ে সুটকেশ খুলল অতসী। অনেক নিচে একটা খামের মধ্যে এক-খানি ফটো, খুলতে বেরিয়ে পড়ল কচি একটা মুখ। এ মুখ যার, তাকে পৃথিবীতে অতসীই এনেছিল, কিন্তু খিড়কির পথে। তাই কাছে রাখার অধিকার পায়নি। খিড়কির পথেই চুপি চুপি গিয়ে গচ্ছিত রেখে এসেছে একটা অনাথ আশ্রমে। কেন, কেন। যে-সমাজ তাকে কিছু দেয়নি, তার মুখ চেয়ে কেন অতসী পর করে দিয়েছে তার রক্তমাখা নাড়ী-ছেঁড়া ধনকে। সব ক্ষোভ ক্ষয়ে গিয়ে সব কান্না জমে গিয়ে অতসীর মনে দৃঢ় একটা প্রতিজ্ঞার রূপ নিল, সে ফিরিয়ে আনবে তার সাত রাজার ধন এক মাণিক, বুকে রাখবে, কোলে শুইয়ে ঘুম পাড়াবে, সমাজের রোষ যদি বজ্র হয়ে নেমে আসে, তবুও।

'ফুলমাসি, ইস্কুলে যাবে না?'

অতসী শুনতে পেল সুধা চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করছে, 'ইস্কুলে যাবে না?'

ফটোটা বাক্সে রেখে ফিরে তাকাল অতসী। বলল, 'যাই।'

সদর রাস্তার দোকানে গোটাকতক জিনিস কিনে দিয়ে ফুলমাসি ওকে গলির মুখ পর্যন্ত এসে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। সামান্য পথ, তবু সুধার পা কাঁপতে লাগল। পাশ কাটিয়ে একটা রিক্সা ছুটে গেল, ঠিক মোড়টাতেই কাত হয়ে পড়ে আছে একটা ঠেলাগাড়ি, ঠুন ঠুন ঘন্টি বাজিয়ে একটা লোক আইসক্রীমের হাতবাক্সটা ঠেলতে ঠেলতে চলেছে। সুধা তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল।

'কী খুকি, কী নেবে?'

চমকে ফিরে তাকাল সুধা। কমবয়সী একজন ভদ্রলোক, মুখটা চেনা-চেনা। বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে উঠতেই মনে পড়ল। এ যে নিশীথ। কতবার তো দেখেছে নূপুরের ঘরে। আঁটো পিরেন আর ঢিলে কুর্তা-পরা এই লোকটা ইঞ্জেকশনের যন্ত্রপাতি নিয়ে যেই ঢুকেছে নূপুরের ঘরে, অমনই সুধা পালিয়ে

এসেছে। ছবিতে দেখা মহাদেবের গলার সাপের মত লোকটার গলায় জড়ান বুক পরীক্ষা করার সেই নলটা, সুধার দেখেই চেনা উচিত ছিল।

'আইসক্রীম কিনবে বলে দাঁড়িয়ে আছ বুঝি?'

সুধা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'না।'

'তবে?'

ক্ষীণ আড়ষ্ট কণ্ঠে সুধা কোনমতে বলতে পারল, 'বাড়ি যাব।'

'বেশ তো চল না!'

'আপনিও ওদিকে যাবেন বুঝি? নূপুরকে ইঞ্জেকশন দিতে?' শেষ কথাটা সুধা বলতে চায়নি, মুখ থেকে হঠাৎ ফসকে গেল।

পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করল নিশীথ, ধোঁয়া ছেড়ে মৃদু হাসল। —'যদি বলি, না, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, তোমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লুম?'

সুধার মুখে তবু কথা যোগাল না, একটু একটু করে বাড়ির দিকে এগতে লাগল।

নিশীথও এল পিছু পিছু।—'তার চেয়ে এক কাজ কর না সুধা (তোমার নাম ত সুধা, না?), এখুনি বাড়ি গিয়ে কী হবে, চল তোমাকে একটা আইসক্রীম কিনে দি।'

সুধা ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানাল।

'দিদিমা দেরি হলে বকবে।'

'দু' মিনিট দেরি হলে কিছু বলবে না।'

'আইসক্রীমওয়ালা তো অনেক দূর চলে গেছে।'

নিশীথ এবার হেসে উঠল জোরে।—'তুমি একেবারে ছেলেমানুষ। আইস-ক্রীমওয়ালা শহরে একটাই নাকি? দোকানও আছে কত। চল, তোমাকে একটা দোকান থেকে খাইয়ে আনি।'

সুধা আশে পাশে চেয়ে দেখল লোকজন আছে নাকি। আশ্চর্য এতক্ষণ এত লোক চলছিল, হঠাৎ যেন গলিটা বিজন নিঃশব্দ হয়ে গেছে। ছুটতে শুরু করলে তিন চার মিনিটেই বাড়ি পৌছান যায়, কিন্তু পথ জুড়ে নিশীথ। ভয়

হল বেশি আপত্তি করলে লোকটা হয়ত হাত ধরে তুলে ধরবে তাকে, বলা যায় না, ছুট দেবে এমন কোথাও যেখানকার কিছু জানা নেই সুধার, দোকানপসার বাড়িঘর, রাস্তাঘাট কিছু না।

তারপর দোকানে বসে আইসক্রীম খেতে খেতে সুধার সাহস বাড়ল, ভয় ভাঙল। নিরিবিলি, পর্দা দিয়ে আড়াল করা ছোট একটা কামরা বেছে নিয়েছে নিশীথ, নিজে কিন্তু আইসক্রীম খাচ্ছে না, সিগারেটের পর সিগারেট ধরাচ্ছে।

চামচ দিয়ে সুধা আইসক্রীম ঠিকমত ভাঙতে পারছিল না, নিশীথ শিখিয়ে দিল কী করে খেতে হয়।

'তুমি কলকাতা বেশি দিন আসনি, নয়?'

সুধা চোখ দুটি দিয়ে বলল, না।

'বাড়িতে কে কে আছেন তোমার?'

সুধা নামে বলল।

'এত ভাই-বোন তোমার! বাবা কী করেন?'

এ-প্রশ্নটার জবাব দেওয়া সুধার পক্ষে সহজ হল না। বাবা ঠিক কী করে তারও জানা নেই। সহজাত বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে লোকে যাকে চাকরি করা বলে, বাবা সেরকম কিছুই করেন না। আবার এও ঠিক, কিছু করেনও অনেক ভেবে-চিন্তে বলল, 'লেখেন।'

'লেখেন?' নিশীথ উৎসুক হয়ে তাকাল, 'তোমার বাবা তাহলে একজন লেখক? ছাপা হয়?'

এ-প্রশ্নেরও সঠিক উত্তর সুধা জানে না। তবে ছাপা হয়ত হয় না, হয়ে জানত ঠিক।

নিশীথ বলল, 'আরে গাঁয়ে বসে কি লেখক হওয়া যায়। কলকাতা আসতে হয়, পাঁচটা পাবলিশারের সঙ্গে আলাপ করতে হয়, তবে তো লেখক।'

'বাবা কলকাতা আসতে চান না।' সুধা মৃদু গলায় বলল।

'একেবারে Son of the Soil? দাও ফিরে সে অরণ্য গোছের ব্যাপার কী বল?' নিশীথ জোর গলায় হেসে উঠে হাতের সিগারেটটা নিবিয়ে দিল।

সুধা কথাটা বুঝল না, তবু ভঙ্গিটা ভাল লাগল না। এ-লোকটা কেন হেসে উঠল এত জোরে, কেন তার বাবাকে ঠাট্টা করল।

'কী লেখেন তোমার বাবা।'

সুধা সসঙ্কোচে বলল, 'পালা, গান—'

ভ্রূ কুঁচকে নিশীথ বলল, 'পালা, মানে যাত্রার পালা? ও সব এ যুগেও লেখা হয় নাকি! তোমার বাবা দেখছি একজন পাকা রিভাইভ্যালিস্ট। তোমার মা কিচ্ছু বলেন না?'

সুধা মিথ্যে কথা বলল, 'না।'

ফের সিগারেট ধরিয়ে ফের ধোঁয়া ছেড়ে নিশীথ বলল, 'Strange. She must have a lot of patience to put up with such nonsense. তোমার বাবা তন্ত্র-মন্ত্র, কারণ-সাধন, এ সবও করেন নাকি?'

সুধা আইসক্রীমের গ্লাসে চামচটা নাড়তে লাগল, জবাব দিল না।

নিশীথ বলল, 'আরে, কলকাতা চলে আসতে হয়। এ হল প্রাণের জায়গা, বাঁচার জায়গা। গ্রামে শুধু মশা, ডোবা, বাঁশবন, ম্যালেরিয়া, ধুক ধুক ভয়। ভূত-পেত্নীর বাস।'

হঠাৎ মাথা তুলে সুধা বলে উঠল, 'কলকাতা ভাল না। কলকাতা খারাপ, এখানকার লোকজন সব্বাই।'

নিশীথ মিটি মিটি হাসছে।—'তবে কলকাতা এলে কেন?'

সুধা দ্রুতস্বরে বলে গেল, 'আমি আসতে চাইনি, ফুলমাসি নিয়ে এসেছে, আমাকে মানুষ করবে বলে।'

তেমনি হাসতে হাসতে নিশীথ বলল, 'তবেই দেখ, গ্রামে থাকলে তুমি মানুষ হতে পারতে না। যাক, তুমি ছেলেমানুষ, তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। তা ছাড়া আমি কলকাতার বাড়িওয়ালাদের দালালও নই, কলকারখানার আড়কাঠিও নই। এবারে বল, আইসক্রীম কেমন খেলে?'

সুধার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। চামচটা নামিয়ে রেখে বলল, 'এবার বাড়ি যাই।'

নিশীথ বলল, 'যাবে, যাবে, ব্যস্ত কী!'

সুধার মাথায় হঠাৎ একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। বলল, 'নূপুরকে ইঞ্জেকসন দিতে হবে না? সে হয়ত আপনার জন্ত বসে আছে।'

বিরক্ত একটা শপথ উচ্চারণ করল নিশীথ, হাতঘড়িতে সময় দেখল।—'ওই একটা রোজকার ঝামেলা আছে বটে। ডিসগাস্টিং।'

সুধা অবাক হল, অনেকক্ষণ কোন কথা যোগাল না মুখে। খানিক পরে ফিস ফিস করে বলল, 'নূপুরকে আপনার ভাল লাগে না?'

'ভাল লাগে? আরে দুর দুর। I hate that little bitch. ফ্যাকা পাকা খোঁড়া একটা মেয়ে, কী আছে ওকে ভাল লাগার। নেহাৎ ডাঃ চৌধুরীর রুগী, ডাঃ চৌধুরী আমার সিনিয়ার, ছোটখাট কেস অনেক দেন, তাঁর খাতিরে রোজ যাই, ইঞ্জেকসন দিয়ে আসি। নইলে ওই জন্মরোগা ফ্লার্টটার কাছে যেতে আমার বয়ে যেত। I like the healthy type, সুধার চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে নিশীথ জুড়ে দিল, 'like you.'

সুধার পা দুটি অবশ হয়ে গেল। হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ফ্রকটাকে টেনেটুনে দিয়ে বসল। বলল, 'চলুন এবার যাই।'

মাঝখানে টেবিল রেখেও যতটা আসা যায়, নিশীথ ততটাই এগিয়ে এল। জুতো দিয়ে সুধার পায়ে চাপ দিয়ে ফের বলল, 'I like your type—healthy, young, full. শুধু তুমি somewhat glum and too moody for your age.'

সুধার খালি পা, জুতোর চাপে যন্ত্রণায় চোখে জল এসে গিয়েছিল, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি যাই।'

'আমিও যাচ্ছি, চল।'

সুধার পিছে পিছে নিশীথও এল বাইরে। ওকে এক মিনিট দাঁড়াতে বলে এক বাক্স চকোলেট কিনল। সুধার হাতে দিয়ে বলল, 'চল।'

'এ কী!' সুধা অস্ফুট বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল।

নিশীথ বলল, 'তোমাকে দিলুম।'

সুধার হাত থেকে বাক্সটা খসে পড়ছিল, নিশীথ তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে দিল।
—'ছি এখানে ছেলেমানুষী করে না, চারধারে লোকজন। ধর।'

আড়ষ্ট মুঠিতে বাক্সটা ধরাই রইল, নিশীথের পাশাপাশি হেঁটে সুধা গলিতে ওদের বাড়ির দরজায় পৌছল। সেখানে এক নিমেষ দাঁড়াল নিশীথ, তারপর শিস দিতে দিতে নূপুরদের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

চৌকাঠের উপর কাঠ হয়ে সুধা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বড় দেরি হয়ে গেছে। জামাটা যেমন গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে ঘামে, আজ সারা বিকালের উত্তেজনা, ভয়, ঘৃণা তেমনি মনে মাখামাখি হয়ে আছে।

দিদিমা কী বলবেন সুধাকে। ফিরতে দেরি হলে ফুলমাসিকে যেমন বকেন, তেমনি কি বকবেন সুধাকেও। নারকেল গাছের মাথায় ডানা ঝটপট শোনা গেল, দুটো শকুন বাসা খুঁজছে, দুঃস্বপ্নের মত সন্ধ্যা নামছে গলিতে। আতঙ্কে সুধার বুকের ভিতর দুরু দুরু করতে লাগল। কী বলবে দিদিমাকে, হাতের চকোলেট বাক্সটারই কৈফিয়ৎ বা কী দেবে। দিদিমা যখন বলবেন, বেরো বেরো কালামুখি, যার সঙ্গে এতক্ষণ ছিলি তার কাছে যা, তখন কি সুধা ফুলমাসির মতই কোমর বেঁধে রুখে দাঁড়াবে, দিদিমাকেও দশ কথা শুনিয়ে দেবে?

সরু রাস্তায় একটা মোটর যেমন আরেকটার পিছনে ধীরে ধীরে যায়, এই শহরটার অমোঘ নিয়মে সুধাও তেমনি অতসীর পিছনে চলেছে। দু'চোখ জলে ভরে উঠল, নোংরা ঘামভেজা জামাটার চেয়েও ক্লেদাক্ত মনে হতে লাগল বাতাস, সুধা বারবার মনে মনে বলল, বড় বিশ্রী, বড় বিশ্রী এই কলকাতা, এখানে ইতর কতগুলো লোকের নিরন্তর ঘোরাঘুরি, যারা ফুলমাসির কাছে আসে আদিত্য মজুমদারের রূপ ধরে, তারাই আবার নিশীথ ডাক্তার হয়ে সুধাকে ভোলাতে আসে।

১০

সেই যে সেদিন সকালে অতসী ঠিক করেছিল তার খোকাকে ফিরিয়ে আনবে, তারপর সপ্তাহ কেটে গেল, প্রতিজ্ঞা কাজে পরিণত করার কোন ব্যবস্থা করা হয়ে উঠল না। এ ক'দিনে অন্তত চারবার দেখা হয়েছে আদিত্য মজুমদারের সঙ্গে, ইলেকশনের সলা-পরামর্শ সারা হবার পরও অতসী তক্তাপোষ ঘেঁষে চুপ করে বসে থেকেছে। মাথার উপর পাখা বন্‌বন্ ঘুরেছে মিনিটের পর মিনিট, দেয়ালঘড়ির পিতলের জিবটা লক লক করেছে।

'বাড়ি যাবে না ?'

'যাই।'

'আমার গাড়ি তবে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়েও অতসী এক মুহূর্ত ইতস্তত করেছে, তবু বলি-বলি করেও বলতে পারে নি। আদিত্যর চোখে চোখ রেখে সব গোলমাল হয়ে গেছে। কী করে বলবে, কোথায় শুরু করবে কথাটা। দেয়ালঘড়িটার লকলকে জিবটায় এ-প্রশ্নের কোন উত্তর নেই।

গাড়িতে ওকে তুলে দিয়ে আদিত্য জিজ্ঞাসা করেছেন, 'কাল আবার আসছ ?'

'আসব।'

তারপর মনে মনে অনেকক্ষণ ধরে শুধু মহলা দিয়েছে অতসী, কাল বলতেই হবে। কথাটাকে কতভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা যায় ভেবে দেখেছে।

তবু, পরদিনও, বলা হয়নি।

আদিত্য বড় ব্যস্ত এখন, প্রতি মিনিটেই লোকজন আসছে, দালাল কিংবা কর্মীর দল। হয়ত কখনও আদিত্য নিজেই এক ফাঁকে ভোটারদের পাড়ায় ধন্না দিতে যাচ্ছেন, অতসী তার নিভৃত, একান্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছাটি জানাবে, সে ফুরসৎ

কোথায়। তক্তাপোষে বসে মুখস্থ হয়ে গেল, পাখাটা অন্‌ করে দেবার পর কতক্ষণ পুরোদমে চলতে শুরু করে, অফ্‌ করে দেবার ক'মিনিট পরে থামে একেবারে।

শেষে আদিত্যই বুঝি একদিন টের পেলেন, অতসীর কিছু কথা আছে।

'কিছু বলবে আমাকে?'

তখনও অতসীর সঙ্কোচ, অত মহলার পর পার্টের প্রথম কথাটাই মনে পড়ল না।

'বলে ফেল। এই সময়টাতে লোকের ভিড় নেই, যা বলবে এখুনি বল।'

বলল অতসী শেষ পর্যন্ত। ভেবে-চিন্তে নয়, গুছিয়ে নয়, হঠাৎ।

'আমার ছেলেকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন আদিত্যবাবু।'

আদিত্যর মুখ হঠাৎ আলো-নেবা ঘরের মত অন্ধকার হয়ে গেল। ধূসরতর হল চোখের মণি।

'কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না অতসী।'

আদিত্য একথা বলবেন অতসী যেন জানত। যতবার মহলা দিয়েছে মনে মনে, ততবার আদিত্যর ভূমিকার শুরুতে এই কথা ক'টিই শোনা গেছে। এই গম্ভীর মুখ, সুদূর-ধূসর দৃষ্টি, সবই বহুবার অতসী কল্পনায় প্রত্যক্ষ করেছে।

'কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

সব সঙ্কোচ অগণিত রক্তকণিকা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে মুখে, রেশমের ফাঁস হয়ে কণ্ঠ রুদ্ধ করেছে, তবু অতসী ঝোঁকের উপর বলল, 'আমার খোকাকে আমি কাছে ফিরে পেতে চাই। সব খুইয়ে এভাবে বাঁচবার কোন অর্থ হয় না আদিত্যবাবু। ওকে অনাথ আশ্রম থেকে ফিরিয়ে এনে দিন।'

যেটুকু কোমলতা ছিল আদিত্যর মুখের রেখা ক'টিতে, সব মুছে গিয়ে কাঠিন্য ফুটে উঠল। গম্ভীর, প্রায়-কর্কশ স্বরে বললেন, 'তুমি যা বলছ তার গুরুত্ব কতখানি ভেবে দেখেছ?'

'দেখেছি।'

'সমাজের কাছে অনেক জবাবদিহি করতে হবে। অনেক কলঙ্ক স্বীকার করে নিতে হবে। সে সাহস আছে?'

অতসী বিন্দুমাত্র না ভেবে বলল, 'আছে।'

আদিত্য ঘরময় পায়চারী করলেন কিছুক্ষণ, অকারণেই পাখাটার গতি বাড়িয়ে দিলেন। অনেক পরেই ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমার সাহস আছে অতসী, আমার নেই। সমাজকে তুমি তুচ্ছ করতে পার, কিন্তু আমরা সমাজের সেবা করি, এত সহজেই তাকে উড়িয়ে দিতে পারি না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অতসী দেয়ালঘড়িটার টক টক শুনল, ছোট্ট রুমাল বার করে মুছল কপালের ঘাম। শেষে মরিয়ার মত জোর গলায় বলে উঠল, 'আপনার সাহসের দরকার নেই আদিত্যবাবু, ওকে নিয়ে আমি না-হয় অন্ত কোথাও চলে যাব।'

আদিত্যর মুখের কঠিন রেখাগুলো আবার সহজ হয়ে এল, হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলেন।—'বাইরে চলে যাবে? একেবারে ধনকে নিয়ে বনকে যাব, আর করব কী; চুপটি করে বসে ধনের মুখটি নিরখি? তা হয় না, অতসী। ও-সব শুধু ছেলে-ভুলানো ছড়া।'

ভূমিকার পরবর্তী কথা ক'টি তৈরি করে নিতে আদিত্য একটু যতি দিলেন, সেই অবসরে অতসী ও'র হাত দুটি চেপে ধরল, দ্রুত-ব্যাকুল গলায় বলে উঠল, 'আপনার পায়ে পড়ি, আদিত্যবাবু, আপত্তি করবেন না। ওকে শুধু আমার কাছে এনে দিন, আর কিছু চাইব না কোনদিন। স্বাভাবিক ভাবে শুধু বাঁচতে দিন আমাকে।'

হাসি মিলিয়ে গিয়ে আদিত্যর মুখে আবার বিরক্তির একটা ছায়া নেমে এল।

'কী ছেলেমানুষী করছ অতসী, যা হবার নয়, সেই আবদার করছ। সমাজ কি তুমি ভেবেছ শুধু কলকাতায়, সমাজ সব জায়গায়। কোথায় পালিয়ে নিস্তার পাবে তুমি। খালি নিজের কথাই ভাবছ। আমার দিকটা ভাবলে না একবারও। সামনে ইলেকশন, আমার শত্রুরা সব ওৎ পেতে আছে, চর লাগিয়েছে চারধারে।

ঘুণাক্ষরেও ওরা যদি এসব কথা টের পেয়ে যায় আমার অবস্থা কী হবে বলত। যা কিছু অর্জন করেছি এতদিন তিলে তিলে, যশ, মান, প্রতিপত্তি সব যাবে।' ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন আদিত্য, অতসীর কাঁধে একখানা হাত রাখলেন।—'তার চেয়ে ধৈর্য ধর দু'দিন। এসব হাঙ্গামা কেটে যাক। তারপর আমি তোমাকে—' বলতে বলতে আদিত্যর কণ্ঠ আশ্বাস-গাঢ় হল, 'তারপর আমি তোমাকে বিয়ে করব। তুমি শুধু প্রাণ-মন দিয়ে আমার জন্যে খেটে যাও অতসী।'

পূর্ণবেগ পাখাটা মাথার ওপর ক্রমাগত ঘুরতে থাকল, দেয়ালঘড়ি ছোট-বড় দুটি হাত দিয়ে সাঁতার কেটে কেটে সময়ের অনন্ত স্রোত ধরে এগিয়ে যেতে থাকল, অতসী বসে রইল আচ্ছন্নের মত।

আদিত্যই শেষ পর্যন্ত আস্তে আস্তে বললেন, 'অনেক বেলা হল, তুমি এবার বাড়ি যাও, অতসী।'

বাস থেকে নেমেও অনেকখানি পথ। কিন্তু অতসী চিনে-চিনে এল ঠিক। ধনী আত্মীয়ের বাড়িতে দূরসম্পর্কিত আশ্রিতের মত এ-অঞ্চলটা পড়ে আছে কলকাতার গা ঘেঁষে; গ্রাম্য চরিত্র খুইয়েছে, অথচ পুরোপুরি শহরে হ'তে পারেনি। সরু রাস্তার দুধারে খোলা ড্রেন, সারি সারি টিনের চালায় দোকান; মাঝে মাঝে দু-একটা রাইস মিলের চিমনি, অর্ধসমাপ্ত পাকা বাড়ি, কোথাও-বা আস্তরখসা পুরনো ইমারত শ্যাওলায় লজ্জা ঢেকেছে।

কিছুক্ষণ হেঁটে অনাথ আশ্রমের সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। হাতের মুঠোয় চিরকুটটার সঙ্গে নামটা অতসী মিলিয়ে দেখল। কিন্তু এখনও ভিতরে যেতে সাহসে কুলোল না। এখানে কেন এসেছে, কাকে খুঁজছে অতসী। যাকে চায়, তাকে ত' চিনেও বার করতে পারবে না। দীর্ঘ রুধিরাপ্লুত বেদনাদীর্ণ রাত্রির ভোরে সদ্যোজাত একটি শিশু একদিন কেঁদে উঠেছিল কোলের কাছে, সে কতদিন আগে। সুড়ঙ্গ পথের মত ক্ষীণ হতে হতে সে-স্মৃতি কবে মিলিয়ে গেছে, সে রুধির দেহ থেকে মুছে গেছে কিন্তু মন থেকে মোছেনি

তো। সন্ত-ভূমিষ্ঠের সেই প্রথম অসহায় কান্না এখনও নদীর স্রোতে ভেসে-আসা ফুলের মত স্মৃতির ঘাটে এসে লাগে; রক্তাভ অপটু কয়েকটি করাঙ্গুলি থেকে থেকে চেতনার দেয়ালে আঘাত করে।

অতসী সেদিন আচ্ছন্ন, পক্ষাহত অবসাদমুখে বিছানায় চোখ বুজেছিল। শ্রান্ত হাত বাড়িয়ে খুঁজেছিল সেই কান্নার উৎসটি। পায়নি। জাতমাত্র কারা যেন ছিনিয়ে নিয়ে গেছে সেই শিশুকে, তার কান্না দূর থেকে দূরতর হয়ে গেছে। নাড়ীছেঁড়া ধন, কিন্তু অতসী তাকে চোখেও দেখতে পায়নি।

জ্ঞান ফিরে এলে আকুল হয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করেছে আদিত্যর অনুচরদের, কোথায়, কোথায় তাকে রেখেছ, বল, বল। সেই ছায়ামূর্তির দল নিঃশব্দে সরে গেছে। উত্তর মেলেনি।

কলকাতায় ফিরে এসেছে খালি হাতে। স্টেশনে গাড়ি নিয়ে ছিলেন আদিত্য নিজে। মা-ও এসেছিলেন।

আদিত্য পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে এনে দেখিয়েছিলেন। ইস্কুলের চাকরিতে সে কনফার্ম হয়েছে, সেক্রেটারী হিসাবে আদিত্য সই করেছেন নিজে।

তখনও দেহ দুর্বল; নীরক্ত-নীল চোখ দুটি কাগজটায় একবার বুলিয়ে নিয়েই ফিরিয়ে দিয়েছে, অতসী যা জানতে চায়, এ-কাগজে তার উত্তর নেই।

—'সে কোথায়?' রুদ্ধপ্রায়, উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছে।

আদিত্য বলেছেন, 'তুমি এখন শ্রান্ত, বাড়ি চল।'

অতসীর পাণ্ডুর মুখে তিক্ত একটা হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। —'যাব। বাড়ি যাব বলেই ত' এসেছি। একটা কথা জানতে চাই শুধু। সে কি বেঁচে আছে?'

আদিত্য বলেছেন, 'আছে।'

বাড়ি ফেরার পথে লজ্জা বিসর্জন দিয়ে অতসী মাকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'মা তুমি বল, ওরা তাকে মেরে ফেলেনি?'

মা বলেছেন, না। সে আছে একটা অনাথ আশ্রমে। কোন্ আশ্রম, মা তার নাম জানেন না, আদিত্যবাবুই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

তারপর ফের কাজে গা ঢেলে দিয়েছে অতসী—ক্ষতের ওপর একটু একটু করে বিস্মৃতির প্রলেপ পড়েছে। দিদির কাছ থেকে সুধাকে এনে রেখেছে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্ম ভরে উঠেই যে কোল একদিন খালি হয়ে গেছে, সে কোল তাতে জুড়োয়নি।

মাঝে মাঝে বুকটা টনটন করেছে তবু, যাকে চোখেও দেখেনি, সেই আত্মজের জন্যে সুধাভাণ্ড অতসীর দেহেই পরিপূর্ণ হয়ে আছে। কী যন্ত্রণা যে হয়েছে মাঝে মাঝে, বুকের কাপড়ের পরতের পর পরত ভিজিয়ে স্নেহকলসী উপচে পড়েছে।

সেই অনাথ আশ্রমের নাম অতসী সংগ্রহ করেছে এতদিন পরে, চুরি করে, আদিত্যর নোট বইয়ের পাতা থেকে। সব কাজ ফেলে রেখে উঠেছে শহরতলীর বাসে। হারান শিশু আর তার মধ্যে এখন শুধু একটিমাত্র ফটকের ব্যবধান। এক-পা মোটে বাকী, তবু কেন চোখের পাতা কাঁপে, কণ্ঠতালু শুকিয়ে যায়, বুকের ভিতরটা হিম হয়ে আসে।

অফিস ঘরে বসে মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক কী লিখছিলেন। মাথা তুলে বললেন, 'কী চাই?'

অতসী চট করে কিছু বলতে পারল না, ধপ করে সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

ভদ্রলোক আবার বললেন, 'কারুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? বলুন কী নাম তার। কিংবা কাউকে এখানে রাখতে চান, তা-ও বলুন। আমরা প্রপার ইনকোয়ারি করে—'

অতসী বসে বসে কপালের ঘাম মুছল। কোন্ নাম বলবে, কী পরিচয় দেবে তার নিজের। অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত বলল, 'আমি সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমিই সেক্রেটারী, শিবেন্দু গাঙ্গুলী।'

নিজেকে তৈরি করে নিয়ে অতসী বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার কতগুলো কথা আছে। খুব জরুরি এবং গোপন।'

শিবেন্দু বললেন, 'বেশ ত। বলুন। এখানে কেউ আসবে না।'

* * * * *

সব শুনে শিবেন্দু মাথা নাড়লেন। 'না অতসী দেবী, তা হয় না।'

মুখখানা শিবেন্দুর, কণ্ঠস্বরও তাঁরই, তবু অতসীর মনে হল যেন আদিত্যর কথার প্রতিধ্বনি শুনছে। সে তো কিছু গোপন করেনি, লজ্জা বিসর্জন দিয়ে অকপটে সব কথা স্বীকার করেছে। তবু কেন এদের মন টলে না, অতসীর দেহের রক্তমাংস দিয়ে তৈরী যে শিশু, তাকে অতসীর হাতে ফিরিয়ে দেবে না, এ কী জটিল ষড়যন্ত্র!

বিবর্ণ মুখে অতসী জিজ্ঞাসা করল, 'হয় না কেন?'

শিবেন্দু বললেন, 'প্রথমত, এটা আশ্রমের নিয়মবিরুদ্ধ। যাঁর কাছ থেকে আমরা শিশুটিকে পেয়েছি একমাত্র তাঁকেই আমরা ফিরিয়ে দিতে পারি। এক্ষেত্রে সে অনুমতি নেই।'

'কিন্তু ছেলে তো আমার', এত ক্ষীণ কণ্ঠে বলল অতসী যে, নিজেই ভাল শুনতে পেল না।

'সে কথা আপনি বলছেন। We have only your word for it. প্রমাণ নেই।'

'মায়েরও প্রমাণ দিতে হবে?'

শিবেন্দু হাসলেন—'হবে বৈকি। কাজীর বিচারের যুগেও হত। গল্প পড়েন নি? কিন্তু সে প্রমাণ একালে তো গ্রাহ্য হবে না। আর, আপনি তো সে প্রমাণ দিতেও রাজী হবেন না।'

অতসীর কান লাল হয়ে উঠল। বলল, 'বিচিত্র আপনাদের নিয়ম, দয়া-মায়া, হৃদয় বলে কিছু নেই।'

কাগজ-চাপা একটা পাথর নাড়তে নাড়তে শিবেন্দু বললেন, 'নেই, পৃথিবীর বেশির ভাগ নিয়মেরই নেই।'

অতসী আবার কী বলতে যাচ্ছিল, শিবেন্দু বাধা দিয়ে বললেন, 'আপনি বৃথা তর্ক করছেন অতসী দেবী। আপনার কোন প্রমাণ নেই, পরিচয় নেই, শিশুটির নাম জানা নেই, এমনকি, তাকে হয়ত চিনতেও পারবেন না।'

'চিনতে পারব না?'

শিবেন্দু বললেন, 'না।' সঙ্গে সঙ্গে ঘন্টা টিপলেন—পরিচারিকা জাতীয়া একটি স্ত্রীলোক ঘরে এল। তাকে কী বললেন শিবেন্দু, সে মাথা নেড়ে অন্তর্হিত হল।

একটু পরে কলরব করে কয়েকটি শিশু ঘরে ঢুকল, সব দুই থেকে তিন চার বছর বয়সের। একজনকে অতসী হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল, সে ধরা দিল না, চেয়ারের পিঠের দিকে গিয়ে লুকোল।

শিবেন্দু বললেন, 'ব্যস্ত হবেন না। এটি আপনার নয়।'

আরেকটি বাচ্চা ইতিমধ্যে এসে অতসীর আঁচল ধরে টানছিল, অতসী বিব্রত হয়ে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে বসল। আরেকটি ঝিয়ের কোলে ছিল, সে হঠাৎ মা বলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল অতসীর কোলে, কিন্তু অতসী হুঁশিয়ার হয়ে গেছে, হাত বাড়িয়ে দিল না, ভ্রূ কুঞ্চিত করে লক্ষ্য করতে লাগল এর নাক চোখ, মুখে তার নিজের চেহারার আদল আসে কিনা।

একটি শিশু দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধ চোখে চেয়েছিল, অতসীর একবার মনে হল, বুঝিবা এই হবে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখেছে তো, এর চাউনির সঙ্গে তার হুবহু মিল।

একটু একটু ঘামতে শুরু করল অতসী, ঘরটার চারদিকে ভীতদৃষ্টি ঘুরিয়ে আনল। সারা ঘরে ছড়িয়ে আছে শিশুরা, ছোট ছোট হাত-পা নেড়ে খেলা করছে; আশ্চর্য, প্রত্যেকের মধ্যেই যেন অতসীর নিজের মুখচ্ছবি। অন্ধকার ঘরে কী যেন খুঁজছে, দেয়াল থেকে দেয়ালে আঘাত খেয়ে ফিরছে। অতসীর নাক, মুখ, চোখ, এমনকি, চিবুকের গড়নটি পর্যন্ত কোথা থেকে চুরি করল এরা,

আর সবাই একসঙ্গে চুরি করল কী করে। মাথা ঘুরে উঠল, হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে অতসী বলে উঠল, 'আমার হার হয়েছে শিবেন্দুবাবু, পারলুম না। আমাকে এখান থেকে যেতে দিন।'

টলতে টলতে উঠল অতসী, বাইরে যখন এসে দাঁড়াল, তখন বেলা গড়িয়ে এসেছে। শহরতলীর পথে ছায়া বিষণ্ণতা। কোনক্রমে বাসে যখন উঠে বসল, তখনও মাথা ঘুরছে, তখনও চোখের ঘোর কাটেনি। একটি হারান শিশুকে সবার মধ্যে ফিরে পেয়েছে, অতসী ভেবে কূল পেল না, এতে তার লাভ হল, না লোকসান!

১১

বাড়ি ফিরে অতসী দেখল, টেবিলের উপর একটা চিঠি চাপা দেওয়া, বোধ হয় আজকের ডাকে এসেছে। কম্পিত হাতে তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়তে গিয়ে দেখল এর আগেই কে যেন ছিঁড়েছে।

সংক্ষিপ্ত চিঠি। '—অতীব শোকের সহিত জানাইতেছি, আমার দাদা গত বৃহস্পতিবার চিরআরাধ্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। কর্তব্যবোধে আপনাকে শুধু সংবাদটুকু জানাইলাম।'

নিচের স্বাক্ষরটুকু অতসী প্রথমে চিনতে পারল না, অনেকক্ষণ পরে যেন অস্পষ্ট মনে পড়ল, লোকটা বোধ হয়, কোনকালে তার দেবর ছিল।

চিঠিটা হাত থেকে খসে পড়ল, অতসী চেঁচিয়ে ডাকল—'মা।'

মা দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই উত্তেজিত গলায় বলল, 'এ-চিঠি তুমি পড়েছ?'

'পড়েছি।'

ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল অতসী, খোঁপা ভেঙে চুলের রাশ ছড়িয়ে পড়েছে সারা পিঠে, বলল, 'কী করব, তুমি বলে দাও।'

বিশেষ কিছু করবার নেই। অতসী তো এয়োতির চিহ্নটুকু রাখেনি। মা বললেন, 'সামান্য একটু কর্তব্য আছে। সে ব্যবস্থা আমি করেছি। পুরুত মশাইকে কাল সকালে আসতে বলে দিয়েছি।'

অতসী অবসন্ন কণ্ঠে বলল, 'প্রয়োজন নেই।'

মা বললেন, 'লোক দেখান একটা কিছু তো করতেই হয়। নইলে ওদের কাছে তোর পাওনা গণ্ডা চইবি কী করে?'

অতসী তীব্র স্বরে বলে উঠল, 'ক্ষেপেছ, মা। জীবনে যাকে গ্রহণ করতে

পারিনি, মৃত্যুর পর তাকে স্বীকার করব? ওদের কাছে আমার কিছু পাওনা নেই।'

'কিচ্ছু নিবিনা?'

অতসী দৃঢ়গলায় বলল, 'এক পয়সাও না।'

ক্ষোভ নেই, শোক নেই, তবু উত্তেজনায় ঠকঠক করছে হাঁটু দুটো। জানালা খুলে দিতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘর ভরে গেল। দুটো শিকের উপর মাথা রেখে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অতসী। কায়মনোবাক্যে যা কামনা করেছিল, সেই মুক্তি এসেছে এতদিনে। বন্ধনে জ্বালা ছিল, কিন্তু মুক্তিও এমন বিস্বাদ কে জানত। দেহে-মনে কোন সাড়া নেই। একজন তো মরে ওকে নিষ্কৃতি দিয়ে গেছে, কিন্তু ওর নিজেরও মৃত্যু ঘটেছে তার অনেক আগে, অতসী আজ প্রথম সেটা টের পেল।

পরদিন সকালে সবই যথারীতি হল। চা জলখাবার খেয়ে শশাঙ্ক কাজে বেরল, ফুলমাসিও খেল, কিন্তু ইস্কুলে গেল না। ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সুধা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ, রান্নাঘরে দিদিমার পাশে বসল কিছুক্ষণ। কিন্তু দিদিমাও আজ কেমন গম্ভীর, আলাপ জমল না।

ছাতে এল, নারকেল গাছটা তেমনি নিথর, নিচে গলিটা সাপকুণ্ডলী। চিলেকুঠিটায় সেদিন চকোলেটের বাক্স লুকিয়ে রেখেছিল পুরনো তোরঙ্গের মধ্যে, একটা তুলে মুখে পুরল, কী ভেবে আরও দুটো নিল হাতে। উঁকি দিয়ে দেখল নূপুর কী করছে।

তেমনি জানালার কাছে চুপ করে শুয়ে আছে নূপুর, বুক অবধি চাদরে ঢাকা, মাথার নিচে তিন চারটে বালিশ। চোখে চোখ পড়ল একবার, কিন্তু অন্তদিনের মত নূপুর ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকল না।

কী করবে, সুধা অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে ভাবল। কেন নূপুর আজ এত চুপ, কে জানে। ও কি টের পেয়ে গেছে সেদিন নিশীথের সঙ্গে আইসক্রীম খাওয়ার কথাটা, সুধাকে নিশীথের চকোলেট কিনে দেওয়া? সম্ভব না। ওরা

দু'জন ছাড়া আর কেউ জানে না, আর নিশীথ নিজে থেকে নিশ্চয় নূপুরকে বলে নি।

সাহস করে সুধা ডাকল, 'এই।'

নূপুর যেন শুনতে পায়নি এমন ভান করল। আরও দু'বার ডাকল সুধা। নূপুর সাড়া দিল তখন।

সুধা বলল, 'আসব?'

নূপুর নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, 'এস।'

পা টিপে টিপে ওবাড়ির দোতলায় উঠল, ভেজান দরজা ঠেলল সন্তর্পণে। নূপুর জানালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এপাশ ফিরে শুয়েছে বটে, কিন্তু কনুই দিয়ে চোখ দুটি ঢাকা। সুধার পায়ের সাড়া পেয়েও হাতটা সরাল না।

সুধা ধুপ করে বসে পড়ল ওর বিছানাতেই, মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল 'কী হয়েছে ভাই নূপুর। আমাকে বলবে না?'

নূপুর উপুড় হয়ে বালিশে মুখ ডুবিয়ে দিল।

আর সন্দেহ রইল না সুধার। নূপুর সব কী করে টের পেয়ে গেছে। থাক, ক্ষতি নেই। সুধাও নিজেকে তৈরি করে নিয়েছে। তার নিজের মনে তো সংশয় নেই। নূপুর না-জানি কত কী মনে করে বসে আছে। সুধা ওকে বুঝিয়ে বলবে, সব ভুল। নিশীথ সেদিন ওর কাছ থেকে যেটুকু আদায় করেছিল, জোর করে। সুধা বলবে, তোমার নিশীথ তোমারই থাক ভাই, আমার ওর ওপর বিন্দুমাত্র লোভ নেই।

বুঝিয়ে বলার পরও কি মুখ ঢেকে শুয়ে থাকবে নূপুর, সুধা বাড়ি বয়ে দেখা করতে এসেছে, ওর সঙ্গে একটা কথাও বলবে না।

বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে, কানের কাছে মুখ নিয়ে সুধা ডাকতে লাগল, 'নূপুর, ও নূপুর, এদিকে চাও ভাই।'

আস্তে আস্তে নূপুর পাশ ফিরল। শিশিরাহত পদ্মের মত ঈষৎ রক্তচোখ, নূপুর কাঁদছিল নাকি! এতদিন নূপুরের পাশে এলে সুধার নিজেকে মনে হ'ত দুর্বল, স্পষ্ট অনুভব করত এই মেয়েটি পঙ্গু দেহের আধারে একটা কঠিন, হিংস্র

প্রাণ লালন করছে। আজ সুধা প্রথম টের পেল, নূপুরও কাঁদে, বালিশে মুখ লুকিয়ে উটপাখি-সান্ত্বনা খোঁজে। করুণার প্রবল জলোচ্ছ্বাসে সুধার বুক ভরে গেল। নূপুরের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'কেঁদ না, আমাকে খুলে বল।'

চোখের পল্লব ছাপিয়ে দু'ফোঁটা জল তবু বালিশে গড়িয়ে পড়ল। চাদরটা দিয়ে সেটুকু মুছে নিতে নিতে নূপুর বলল, 'খুলে বলার মত কথা হলে কাঁদতাম না সুধা। একথা কাউকে বলার না।'

'আমাকেও না?'

নূপুর বড় বড় দুটি চোখ মেলে সুধার মুখে রাখল। এই সরল গ্রাম্য কিশোরীর সুকুমার মুখে সে কী আশ্বাস খুঁজল সে-ই জানে। অনেকক্ষণ পরে বলল, 'বলব, তোমাকে সব কথা বলব। কিন্তু আমাকে তৈরি হতে একটু সময় দাও ভাই।'

জানালা দিয়ে কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থেকে নূপুর বলল, 'কিন্তু কোথায় আরম্ভ করব বুঝতে পারছি না। এ যে ভারি লজ্জার কথা। মেয়ে হয়ে মায়ের—'

সঙ্গে সঙ্গে সুধার বুক থেকে একটা পাথর নেমে গেল। যাক, তবে নিশীথ আর তার কথা নয়। সাহস বেড়ে গেল, নূপুরের কানের কাছে মুখ নিয়ে সুধা বলল, 'বলতে যদি লজ্জা হয় তবে নাই বা বললে ভাই।'

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল নূপুর, আরও দুটো বালিশ পিঠের নিচে রেখে স্থির গলায় বলল, 'কিন্তু বলতে আমাকে হবেই। কাউকে ভাগ না দিলে এ জ্বালার হাত থেকে রেহাই নেই। কিন্তু ডাঃ চৌধুরী—ডাঃ চৌধুরীকে আমি যে দেবতার মত শ্রদ্ধা করতাম ভাই।'

সামান্য কটি রেখার আঁচড়ে একটা ছবি যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সুধার কাছেও নূপুরের বক্তব্য তেমন হল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই বর্ষার সন্ধ্যাটির কথা, নূপুরের মাকে যেদিন গলির মুখে আধ-অন্ধকার একটা গাড়ির মধ্যে দেখেছিল। পাশের ভদ্রলোকটি তবে ছিলেন ডাঃ চৌধুরী।

উত্তেজিত কণ্ঠে নূপুর বলে উঠল, 'আজ আমি সব জেনেছি, আমার এই অসুখ সারে না কেন। ওদের ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছি।'

'কী ষড়যন্ত্র নূপুর?'

চাদরটা পা পর্যন্ত ঠেলে দিল নূপুর, বলল, 'এই দেখ।'

সরু বাঁশের কঞ্চির মত পঙ্গু দু'খানা পা। সুধার বহুবার দেখা। অবোধ দৃষ্টিতে নূপুরের মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'কী?' নূপুর সবটুকু তিক্ততা গলায় ঢেলে দিয়ে বলল, 'বুঝতে পারলে না? ওরা আমাকে চিরপঙ্গু করে রাখবে বলে ষড়যন্ত্র করেছে।'

সুধা তবু বুঝল না দেখে নূপুর বলে গেল, 'আমার অসুখটা ডাঃ চৌধুরী অনেকদিন আগেই সারিয়ে দিতে পারত। ইচ্ছে করে শুইয়ে রেখেছে আমাকে, যাতে এ-বাড়ি যাওয়া আসার ছুতোটা ঘুচে না যায়। নইলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের এত উন্নতি হয়েছে আজকাল, বলতে কি মরা মানুষ একরকম জীবন পেয়ে যাচ্ছে, আর বিলেতফেরৎ সাতটা ডিগ্রীওয়ালা ডাক্তার, আজ পর্যন্ত আমার শুকনো দু'খানা পায়ে একটু মাংস জুড়ে দিতে পারল না?'

সুধা স্তম্ভিত হয়ে শুনছিল। রোদ এসে পড়েছে বিছানায়, রোষে, ক্ষোভে, বেদনায়, ঘৃণায় নূপুরের মুখটা হিংস্র, আরক্ত।

ধীরে ধীরে আবার নির্জীব হয়ে পড়ল নূপুর, চাদরটা ফের টেনে নিল গলা অবধি, জড়ো-করা বালিশগুলোর উপর মাথা এলিয়ে দিল। চোখের পাতা বন্ধ করে কী ভাবল, তারপর শান্ত গলায় বলল, 'ডাক্তারের কথা না হয় বুঝতে পারি, আর কিছু না হক, শুধু ভিজিটের লোভেই ওরা অনেক সময় রোগ জীইয়ে রাখে। কিন্তু মা হয়ে মেয়ের এমন সর্বনাশ করল কী করে!'

সুধা বলল, 'এতো ভাই শুধু তোমার অনুমান।'

নূপুর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। শুধু অনুমান নয়। অনুমানের ওপর নির্ভর করে আমি কোন কথা বলিনে। তোমাকে বলিনি আমি, আমার পা দুটো গেছে বলে চোখ, কান, নাক, সবগুলোকে ছুঁচের মুখ করে রেখেছি। সব টের পাই।

'ঠিক জান তোমার ভুল হয়নি ?'

'ভুল আমার হয় না সুধা। হলে বেঁচে যেতাম। তা ছাড়া প্রমাণ তো আমার হাতেই আছে। মার কাছে লেখা ডাক্তারের একটা চিঠি আমার হাতেই পড়েছে। দেখবে ?'

সুধা সসঙ্কোচে বলল, 'থাক।'

নূপুর বলল, 'সে-চিঠির ভাষার দু'রকম অর্থ হয় না। কিন্তু তা নিয়ে আমার কোন নালিশ নেই। ওদের যা খুশি ওরা করুক। কিন্তু আমাকে কেন এভাবে শেষ করে দিল, কেন আমাকে ভরে উঠতে, পূর্ণ হতে দিল না। ওরা কী ঠিক করেছে জান, দু'জন মিলে এখান থেকে পালিয়ে যাবে—বোম্বাই, পাঞ্জাব কিম্বা হায়দরাবাদে। আমাকে একটা স্যানিটোরিয়ামে রেখে যাবে। আমাকে খোঁড়া করে রেখেও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি, এবার জেলে পুরবে। কিন্তু আমি তা হতে দেব না।'

দাঁতে ঠোঁট চেপে নূপুর বলল, 'আমি তা হতে দেব না। ওদের এই চক্রান্তটা অন্তত ব্যর্থ করব, নিশীথের সঙ্গে পালিয়ে যাব আমি। নিশীথ তো আমাকে ভালবাসে।'

নিশীথের দেওয়া চকোলেট সুধার বাঁহাতের মুঠোয় ঘামছিল, সুধা কিছু বলতে পারল না।

নূপুর বলল, 'আমার নিজের নামে অনেক টাকা আছে, বাবা রেখে গেছেন। সব টাকা চিকিৎসায় ঢালব আমি, সেরে উঠব। তারপর নিশীথকে বিয়ে করব, ওদের দেখিয়ে দেব আমিও সুস্থ, সার্থক হতে পারি।'

বিছানায় আধশোয়া নূপুর চোখ বুজে আকাশকুসুম চয়ন করে গেল, সুধা বসে রইল শিয়রের কাছে, এই অসহায় অক্ষম মেয়েটির সুখস্বপ্ন ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা মাত্র করল না।

১২

চোরের মত পা টিপে টিপে সুধা ফিরে এসেছিল, ঘরেও চুপি চুপি ঢুকতে যাবে, কিন্তু দেখতে পেল কে একজন বাইরের লোক বসে, ছোটমামা তার সঙ্গেই বসে গল্প করছেন।

লোকটির বয়স যথেষ্ট হয়েছে সন্দেহ নেই, মাথার পিছন দিকটা একরকম সাদা, ভঙ্গিটা খুব পরিচিত মনে হল, তবু সুধা চিনতে পারল না। দিদিমা রান্নাঘরে চা জলখাবার নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে এসেছে দিদিমা?'

দিদিমা গালে হাত দিয়ে অবাক ভঙ্গি করে বললেন, 'কাণ্ড দেখ মেয়ের। বাপ এসে অবধি মেয়ের খোঁজ করছে আর মেয়ে তাকে চিনতেই পারল না।'

বাবা! সুধার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা বিস্ময়ের বিদ্যুৎ-চমক বয়ে গেল। বাবা কলকাতা এসেছেন!

দিদিমা বললেন, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে পেলে ঘরের কথা আর হুঁশ থাকে না, না? যা, তোর বাবাকে প্রণাম করে আয়।'

ওঘরের চৌকাঠ অবধি দৌড়ে গেল সুধা, তার পরে আর এগুতে পারল না, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। শুনতে পেল বাবা ছোটমামাকে বলছেন, 'অতিশয় যাচ্ছেতাই জায়গা হে, এখানে মানুষ থাকে কী করে। সব জোচ্চোর।'

শশাঙ্ক প্রতিবাদ করে কী বলতে যাচ্ছিল, নীরদ আবার বললেন, 'সারা রাত না ঘুমিয়ে ট্রেন থেকে নেমেছি সেই ভোরে, এখন মাথা ঘুরছে, একটু স্নান করতে পেলে খুশী হই। অনেক দিন পর এলুম, রাস্তাটাস্তা সব অচেনা লাগল। একটা রিক্সাওয়ালাকে তোমাদের বাসার ঠিকানা দিয়ে বললুম, নিয়ে চল্। বেটা প্রথমেই তিন টাকা হাঁকলে। আমি বলি ওরে বাপরে, তবে আমি হেঁটে যাব।

শেষ পর্যন্ত দেড় টাকায় রফা হল, কিন্তু লোকটা কত অলিগলি যে ঘোরালে ঠিক নেই। এই গোলকধাঁধায় তোমরা চলাফেরা কর কী করে!'

হঠাৎ শশাঙ্ক দেখতে পেল, সুধা চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে। বলল, 'ওখানে দাঁড়িয়ে কেন রে, ভিতরে আয়।'

নীরদও চকিতে ঘাড় ফেরালেন। সুধা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করল। মাত্র এই ক'মাসের অদর্শনেই দু'জনের মধ্যে একটা আড়াল রচিত হয়েছে।

আড়ষ্টভাবে সুধা ঘরে ঢুকল, পা ছুঁয়ে প্রণাম করে সরে আসতে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে বাবা ওকে ধরে ফেললেন। বন্দী হল সুধা, কিন্তু মাথাটি নিচুই রইল।

নীরদ ওর চুলে গভীর মমতায় দীর্ঘ আঙুলগুলো চালাতে চালাতে বলল, 'এত বড় হয়েছিস তুই এ ক' মাসে? মামার বাড়ি দুধভাত, কিল চড় নাই,—না? চুল এমন করে ছেঁটে দিলে কে?'

বাবার কাছ থেকে সঙ্কোচে মুখ লুকতে সুধা বাবার বুকেই মাথা গুঁজে দিল। আধ আধ গলায় বলল, 'ফুলমাসি।'

'ফুলমাসি?' নীরদ কৌতুকে হেসে উঠলেন, 'শালী নিজে মেমসাহেব, বোনঝিকেও মেমসাহেব তৈরি করছে বুঝি?'

'আঃ জামাইবাবু', শশাঙ্ক প্রায় ধমকের ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'কী সব শেখাচ্ছেন মেয়েকে!'

নীরদ অপ্রতিভও হলেন না, হাসতে লাগলেন সমানে। 'গেঁয়ো চাষাভুষো মানুষ, আমার কথা ধর কেন। শালীকে শালী বলা বারণ বুঝি তোমাদের শহরে নিয়মে? কী বলতে হয় এখানে, ডার্লিং, না মাই ডিয়ার?'

শশাঙ্ক জবাব দিল না। সুধা লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে যেতে চাইল।

নীরদ সুধার ফ্রকের কলার হাতা, সব টেনে টুনে দেখেন আর দেখেন, চোখের পলক পড়ে না। বোকা-বোকা সাত-চড়ে-রা-নেই যে মেয়েটিকে ছ'মাস আগে পাঠিয়েছিলেন, এই কি সেই। বিশ্বাস হয় না। সে এমন ফর্সা হল কী করে। আস্তে আস্তে বললেন, 'তোকে তো এর পরে আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে মানাবেই না রে।'

নীরদ বললেন হালকা সুরে, তবু যেন গলায় একটু বিষন্নতার ছোপ লাগল, সুধা স্পষ্ট অনুভব করল।

শশাঙ্ক বললে, 'জামাইবাবু কলকাতা এলেন তা হলে!'

'এলাম কি সাধে। আসতে হল। জরুরি কাজে এসেছি, কাজটা শেষ হলেই পালাব। একটা গোলক ধাঁধাঁ বানিয়ে তার নাম দিয়েছ শহর, এখানে কেউ শখ করে আসে, না থাকে। আমি তো ভায়া এখানে এলেই কেমন পচা-পচা গন্ধ পাই। দিব্যি ঝকঝকে রাস্তা, ঢাকনা তোল, অমনি দেখবে গলিত আবর্জনার স্রোত। যত ভদ্রলোক সবার ফর্শা পাঞ্জাবির নিচে ময়লা গেঞ্জি, যত শহুরে মেয়েমানুষ, তাদের মুখে তিন পরত পাউডারের নিচে আসল রঙ।'

শশাঙ্ক চুপ করে রইল। এই লোকটার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। যে কলকাতা বাংলার মনীষার ধাত্রী, সাহিত্যে শিল্পে, দর্শনে রাজনীতিতে নব নব আন্দোলনের গঙ্গোত্রী, তাকে এ দেখেনি, দেখতে চায়ও না। সংক্ষেপে বলল, 'আপনি কলকাতার শুধু একটা দিকই দেখেছেন।'

'দিগ্বিদিকের হিসেব জানিনে ভায়া, কলকাতা সম্বন্ধে প্রথম আর শেষ রায় গুপ্ত কবিই দিয়ে গেছেন,—'রেতে মশা, দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি।'

নীরদ হাসতে লাগলেন, সে হাসিতে কেউ যোগ দিল না। সুধা ইতিমধ্যে একটু সরে গিয়ে লক্ষ্য করছে বাবাকে, সংশয়াচ্ছন্ন দৃষ্টি, এসব কথা তো কতবার শুনেছে এর আগে, বাবার মুখেই, কিন্তু কখনও তো এমন বিশদৃশ কর্কশ মনে হয়নি। আধময়লা, ঘামেভেজা জামা পরা এই লোকটাকে এমন বেমানান মনে হয় কেন তার ফিটফাট পিছুনটেড়ী শশাঙ্ক মামার পাশে; ওঁর চেয়ারে উবু হয়ে বসবার ভঙ্গি থেকে হঠাৎ জোর গলায় হেসে ওঠা, চেঁচিয়ে কথা বলা সব কেমন অমার্জিত, গ্রাম্য। কলকাতায় এসে যাদের রোজ দেখছে সুধা—শশাঙ্ক, নিশীথ, আদিত্য মজুমদার—কারুর সঙ্গে মিল নেই তার বাবার, কথায় না, পরিচ্ছদে না, হাসিতে না।

কাছি ছিঁড়ে ভেসে ভেসে কতদূর ভাঁটিতে এসেছে, ময়নাফুলির ভীতু, বোকা, জবুথবু মেয়েটা যেন আজ প্রথম টের পেল।

কথা ফুরিয়ে গেছে, শশাঙ্ক কিছুক্ষণ বসে থেকে হাই তুলল, শেষে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি একটু বেরুব। কাজ আছে। আপনি আজ বিকেলটা বিশ্রাম করছেন তো জামাইবাবু?'

নীরদ বললেন, 'না হে, আমাকেও বেরুতে হবে। কলেজ স্ট্রীটে যেতে কোন্ দিক দিয়ে সুবিধে বলে যাও দিকি।'

শশাঙ্ক বলল, 'এই গলি দিয়ে বেরুলেই বড় রাস্তা, সেটা দিয়ে কিছুটা গেলেই ট্রাম রাস্তা পেয়ে যাবেন। তারপর ছ' নম্বর বাসে, কিম্বা ট্রামে—'

'ট্রাম বাসের হিসাব চাইছি না হে, পায়ে হাঁটা পথের কথা জিজ্ঞাসা করছি।'

'হেঁটে যাবেন কেন এতদূর? তার চেয়ে বাসে যান, চারটে তো মোটে পয়সা।'

নীরদ বললেন, 'না হে ভায়া না। আমরা গ্রাম্য মানুষ, ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া হই না। অল্প বয়সে চার ক্রোশ মেঠো পথ আর জঙ্গল পাড়ি দিয়ে যাত্রা শুনতে গেছি, ভোর হ'তে না হ'তে আবার হাঁটা পথেই ফিরে এসেছি।' চট করে উঠে দাঁড়িয়ে নীরদ বললেন, 'চললুম।'

ময়লা জামাটার দিকে চেয়ে শশাঙ্ক বলল, এই পোশাকেই? জামাটাও বদলালেন না?'

নির্বিকার গলায় নীরদ বললেন, 'কিছু দরকার নেই। আমি তো তোমাদের মত ফুরফুরে বাবু নই। আমার ঘরে যদি এ পোশাকে চলে বাইরেও চলবে।'

শশাঙ্ক ঠোঁট উল্টে বেরিয়ে গেল, অর্থাৎ আপনার যা ইচ্ছে করুন। সেই অবসরে পুঁটলী খুললেন নীরদ, ফিতে দিয়ে বাঁধা একটা খাতা বার করলেন। সুধা অপলক চোখে তাকিয়ে ছিল। নীরদ বললেন, 'কলকাতা কেন এসেছি, জানিস?'

সুধার জানবার কথা নয়। অতএব নীরদ নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিলেন।—উদ্দেশ্য দুটি। মেজকর্তার ইচ্ছে এবার খুব ধুম করে বাসন্তী পুজো হবে। যাত্রা হবে দু' রাত। আমাকে ড্রেস কিনে নিয়ে যেতে বলেছেন। রাহা

খরচ মোটামুটি ভালই পাওয়া গেল, আমি ভাবলাম মন্দ কী। যাই এ সুযোগ খুকিকে দেখে আসিগে। তোর মাও আসতে চেয়েছিল, আমিই দিলাম না। শরীর ভাল না তো—ওর আবার—তোর আবার ভাইবোন হবে খুকি।'

সুধা সঙ্কুচিত হয়ে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল, নীরদ লক্ষ্যও করলেন না, বলে গেলেন, 'তা ছাড়া কলকাতা আসার আরও একটা উদ্দেশ্য আছে।' বগলদাবা করা খাতাটা দেখিয়ে বললেন, 'এটা ছাপার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে তো অনেক ছাপাখানা আছে, বই ছেপে দেয় এমন দোকানদারও আছে না?'

সুধা কিছুই জানত না, সে হাঁ-না কোনটাই বলল না, কিন্তু নীরদ ধরে নিলেন সুধা বলেছে, আছে। খুশী হয়ে বললেন, 'মেজকর্তাও তাই বলেছেন। আমাদের ওদিকে এ পালাটার খুব নাম হয়েছে রে। অনেকেই নামাতে চায়, কিন্তু নকল তো বেশি করিনি, ক'জনকে দিই। মেজকর্তা বলেন, এটা কলকাতা গিয়ে ছাপিয়ে নিয়ে এস, এ-জিনিস ওরা লুফে নেবে। তোমার নাম হবে, টাকা হবে।'

হাসিতে নীরদের মুখখানা বিস্তৃত হয়ে উঠল, গলা নামিয়ে বললেন, 'টাকা হলে তোকে কিন্তু এখানে রাখব না সুধা।' একবার ঘরটার চারিদিকে, একবার সুধার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে বললেন, 'এখানে তোর শিক্ষা ভাল হচ্ছে না।'

ক্যাম্বিসের জুতোর ফিতে বেঁধে নীরদ বেরবার জন্যে তৈরি হয়ে নিলেন, বিরলচুল মাথায় চিরুণী চালালেন।

'বাবা!' সুধা এতক্ষণে কথা বলল।

ফিরে তাকিয়ে নীরদ বলল, 'কী রে।'

'তুমি এই জামাটা বদলেই যাও বাবা। এখানে—' সুধা ইতস্তত করে বলল, 'এখানে এভাবে কেউ বেরোয় না।'

নীরদ এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালেন। আস্তে আস্তে বললেন, 'কেউ বেরয় না, নারে? বেশ, তবে বদলেই যাই। তুই যখন বলছিস।'

নিচু হয়ে ফের পুঁটুলীটা খুলতে লাগলেন নীরদ।

ঘণ্টা দুই পরে নীরদ ফিরে এলেন।

অতসী বলল, 'এত দেরি হল আপনার, আমরা ভেবে ভেবে মরি।'

জামাটা হুকে টাঙিয়ে রেখে নীরদ কপালের ঘাম মুছলেন। দেহের অনাবৃত উপরার্ধে ভিজে গামছা ঘষতে ঘষতে বললেন, 'আমার জন্তে তুমি এত ভেব না হে। তোমার দিদি শুনলেই মনোকষ্ট পাবেন।'

অতসী রাগ করে বলল, 'মেয়ে সামনে রয়েছে—কোন বুদ্ধি যদি আপনার থাকে। আপনি সেই গেঁয়ো জংলীই রয়ে গেলেন জামাইবাবু।'

নীরদ অপ্রস্তুত হলেন না। হাসতে হাসতে বললেন, 'কী করব, গ্রামে থাকি যে।'

'গ্রামই আপনার সর্বনাশ করেছে। কোনদিন শহরে এলেন না, আলো দেখলেন না।'

আস্তে আস্তে নীরদের হাসি মিলিয়ে গেল।—'আজ সারা বিকেল তোমার ভাইয়ের সঙ্গে এ নিয়ে ঝগড়া করেছি, তুমিও ফের শুরু করলে? বেশ তবে তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, শহরে তুমি কেন পড়ে আছ অতসী, শহর তোমাকে কী দিয়েছে?'

অতসী চট করে কোন জবাব দিতে পারল না। পরে বলল, 'গ্রাম আপনাকে কী দিয়েছে? আপনি কেন গ্রামে পড়ে আছেন?'

'গ্রামকে ভালবাসি বলে।' দৃঢ় স্পষ্ট স্বরে নীরদ বললেন।

'শহরকে আমরা ভালবাসি।'

নিষ্ঠুর একটা হাসির ফুঁ দিয়ে নীরদ অতসীর কথাটা উড়িয়ে দিতে চাইলেন।—'মিছে কথা বলছ অতসী, শহরকে তোমরা ভালবাস না, এই লক্ষ লক্ষ লোক এখানকার মাটি যারা কামড়ে পড়ে আছে তাদের কেউই বাসে না। দলে দলে যত লোক আসে অতসী, তাদের মধ্যে ক'জন শহরকে ভালবেসে আসে? শতকরা একজন কি দু'জন।—বেশির ভাগই আসে জীবিকার খোঁজে, কুকুর যেমন খাবারের লোভে আস্তাকুঁড়ে মুখ দেয় তেমনি।'

অতসীর মুখে তৎক্ষণাৎ জবাব যোগাল না, কিন্তু তখনই ঘরে ঢুকল শশাঙ্ক, নীরদের শেষ কথা ক'টা তার কানে গিয়েছিল।

—'জামাইবাবু দেখছি শহরের বিরুদ্ধে তখন থেকে সমানে জেহাদ চালিয়ে যাচ্ছেন। একটা সহজ কথা জিজ্ঞাসা করি। কলকাতা না হয় আস্তাকুঁড়, খাবারের লোভেই এখানে লোকে আসে। কিন্তু আসে কেন? তা হলেই দেখেছেন, এই আস্তাকুঁড়েও যেটুকু খাবারের টুকরো আছে, আপনার গ্রামে তাও নেই। কবেই সব ফাঁকা হত, খাঁ খাঁ করত আপনার পল্লবঘন আম্রকানন। আপনার কথা ধরি না, আপনি ফ্যানাটিক। কিন্তু যে ক'টা লোক এখনও গ্রামে পড়ে আছে, তারাও ভালবেসে পড়ে নেই। তারাও পালাবার ফিকিরে আছে, পড়ে আছে, নেহাৎ নিরুপায় হয়ে। দুধ নেই জেনেও উপবাসী শিশুকে কখনও রুগ্ন মায়ের শুষ্ক বুক চাটতে দেখেছেন? এও তেমনি।'

নীরদ বাধা দিয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন, শশাঙ্কর বক্তৃতা তখনও শেষ হয়নি। বলল, 'খবর নিয়ে দেখবেন আজও যারা গ্রামে আছে তাদের বেশির ভাগই পরিত্যক্ত মাসি-পিসি দিদিমার দল।'

নীরদ আহত দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, তুমি গ্রামের কিছুই জান না। খালি ভদ্রলোকদের কথাই ভাবছ। গ্রামের আসল মানুষ আলাদা।'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'সেই আসল মানুষদেরও কলকাতার কলের দরজায় ভিড় জমাতে দেখেছি জামাইবাবু।'

শশাঙ্কর ঘরেই নীরদের শোবার বন্দোবস্ত হয়েছিল। বিছানা বেশি নেই, অতসী শেষ পর্যন্ত নীরদের বালিশের পাশেই সুধার বালিশটা রেখে গেল।

খেয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সুধা ঘুমিয়ে পড়ল, শশাঙ্কর নাক ডাকাও শোনা গেল একটু পর। ঘুম এল না শুধু নীরদের। অস্বস্তিতে কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করলেন। জানালা দিয়ে ও-বাড়ির একটা আলো চোখে এসে পড়েছে, এত রাত হল তবু ওরা বাতি নেবায় না কেন। উঠে গিয়ে জানালাটা একবার বন্ধ করে দিলেন, তাতে অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল। এই তো ছোট ছোট

খুপরী, একে আদর করে এরা নাম দিয়েছে কামরা। কিন্তু তাতেই যদি বাসযোগ্য হত, তবে পদ্মপলাশলোচন নাম রাখলেই কানা ছেলেও দেখতে পেত। সদর রাস্তা থেকে মোটরের ভেঁপু বাজছে, মাঝ রাত্রেও কিসের এত ঘোরাঘুরি শহরের লোকের কে জানে।

আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে নীরদ উঠলেন, পা টিপে টিপে উঠে এলেন ছাতে। সঙ্গে সঙ্গে শরীর জুড়োল, শান্তি এল মনে। দিনে এমন পরপর লেগেছিল এই ইটপাথর-পীচে বাঁধান শহরটাকে, মনে হয়েছিল ভূগোলে ভূমণ্ডলের যে অপর গোলার্ধের কথা লেখা আছে, সেইখানেই চলে এসেছেন বুঝি। কিন্তু রাতে এই নিস্তব্ধ ছাতটিতে দাঁড়িয়ে কিছু কিছু চিনতে পারছেন। ওই তো, খাপে ঢাকা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে কালপুরুষ, ওই সপ্তর্ষির চরণে প্রণতা অরুন্ধতী। কৃত্তিকা, মৃগশিরা—সব দেখতে পেলেন ক্রমে ক্রমে। অমাবস্যার এক রাত্রে ময়নামতীর খাল বেয়ে বহরপুর যেতে সব তারা চিনেছিলেন একে একে। সেই কৈশোরের রাতটি বিস্মৃতির জলে কবে ডুবে গেছে, আজ এতদিন পরে তার জরিচুমকির কাজকরা ওড়নাখানা ভেসে উঠেছে, নীরদ মুগ্ধ হয়ে দেখেছেন।

ছাতের পাতার উপর মাথা রেখে নীরদ শুয়ে পড়লেন, একটা মাদুর থাকলে ভাল হত। না থাকুক, ক্ষতি নেই। এই ঝিরঝিরে হাওয়াটুকু যদি থাকে, নীরদ গোটা রাতটা এখানেই কাটিয়ে দিতে পারেন।

শরীর ক্লান্ত। আজ বিকেলে কম পরিশ্রম তো হয়নি। কতদিন আগে কলকাতা এসেছিলেন, পথ ভাল মনে নেই, কলেজ স্ট্রীটে পৌঁছতে বেশ দেরি হয়েছিল। পালার খাতাটা সঙ্গে নিয়ে দোকানগুলোর দরজার সামনে ঘুরেছেন, ভিতরে বড় ভিড়, ঢুকতে সাহস হয়নি। বড় বড় কাঁচের পর্দার আড়ালে হালকা-ভারী নানা রকম বই, মুগ্ধ হয়ে নাম পড়েছেন। বুকের মধ্যে অনিশ্চিত একটু আশা চিনচিন করে উঠেছে, এরকম একখানা বই কি তাঁরও হবে? ভরসা হয় না।

তবু একটা দোকানে সাহস করে ঢুকে পড়লেন। কাউণ্টারের ওপাশে যে

লোকটা দাঁড়িয়েছিল তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাইলেন। লোকটা বললে, 'বলুন'।

নীরদ সসঙ্কোচে খাতাখানার ফিতে খুললেন। লোকটা না দেখেই ফেরৎ দিল।

'না মশাই, আমরা বই শুধু বেচি, ছাপি না।'

দ্বিতীয় দোকানেও অভিজ্ঞতা অন্য রকম হল না।

'আমরা শুধু পাঠ্য কেতাব ছাপি, ইস্কুলে পাঠশালায় যা পড়ান হয়। আপনি পাশের দোকানে যান।'

পাশের দোকানের লোকটি খাতাখানা ছুঁতেই চায় না। এরা বই ছাপে বটে, কিন্তু শুধু নাটক নবেল। যাত্রার পালা কি কেউ পড়ে। যাত্রাই দেশ থেকে উঠে গেল মশাই, থিয়েটারও ওঠে-ওঠে।

আরেকজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল। সে এগিয়ে এসে বলল, 'যাত্রার পালা লিখেছেন নাকি? দাদা বেশ গুণী ব্যক্তি দেখছি। য়্যাক্টোও করেন নাকি? মাথার বাব্‌রি চুল নেই কেন? তা চেঁচিয়ে দু'চার ছত্র একটু পড়ুন দেখি, শুনি।'

প্রথম লোকটি বলল, 'কেন ভদ্রলোককে মিছিমিছি বিরক্ত করছ নৃপেন? আমরা এসব বই ছাপি না। কে ছাপে জানি না। তবে আপনি বটতলায় খোঁজ করে দেখতে পারেন। সেখানে হয়ত দু'চার ঘর এখনও আছে যারা যাত্রা পালাগান ছাপে।'

বটতলা কোথায় নীরদ চিনেন না। দোকান থেকে বেরিয়ে ফুটপাতে যে লোকটা বই ছড়িয়ে বসেছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আন্দাজে আন্দাজে সে একটা নির্দেশ দিল, নীরদ সেটা মনে রাখতে চেষ্টা করলেন। তখন আর সময় ছিল না। ঠিক করলেন পরদিন একবার যাবেন।

নারকেল গাছটার পাতার আড়ালে বসে একটা পেঁচা স্ত্রীর কাছে সারা দিনের জমাখরচের হিসাব চাইল, নীরদ চমকে উঠলেন। এই গলিটা একেবারে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, কোন ঘরে আলো নেই। মোড়ের বড় বাড়িটার

আস্তাবলে ছুটো ঘোড়ার কোঁস কোঁস শব্দ শোনা যাচ্ছে, ঝাঁপ বন্ধ করে পানওয়ালাটা এই মাত্র রাস্তায় দাঁড়াল।

শহরটা জেগে আছে তবু। সদর রাস্তায় আলো এখনও জলছে, এখনও বাজছে দু' একটা ত্বরিতগতি মোটরের হর্ন। মাঝে মাঝে আলো মাঝে মাঝে চাকা চাকা অন্ধকার। গ্রামে এমন হয় না। সন্ধ্যা হতেই উঠোনে উঠোনে তুলসীমঞ্চে দীপ জলে, শেয়াল ডেকে ওঠে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে। তারপর এক সময়ে হঠাৎ সব নিথর হয়ে যায়। তারপর যেটুকু আলো থাকে সে জোনাকির হৃতনিদ্র চোখের মিটিমিটিতে, যেটুকু হৃৎস্পন্দ থাকে সে ঝিঁঝি পোকার অক্লান্ত কণ্ঠসাধনায়। মাঝে মাঝে দু'একটা ব্যাঙ ঝুপঝাপ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কান পেতে থাকলে সেটুকুও শোনা যায়।

শহরের মত নয়। এখানে এরা মাটির দম বন্ধ করেছে বুকের ওপর ইঁট-পাথর চাপিয়ে, বাতাস বিষ করেছে ধোঁয়ায়, আকাশের নীলের উপর পোঁচের পর পোঁচ কালি ঝুলিয়েছে। এমন কড়া শাসন, তবু তো অখণ্ড একটা রূপ নিল না কলকাতা, এখানে আলো, ওখানে অন্ধকার, পাড়াগুলি বিচ্ছিন্ন কয়েকটি দ্বীপের মত ; রাত নিশুতি হলে সেটা টের পাওয়া যায়।

ঘুমে চোখ ভেঙে এসেছে নীরদের, তবু উপরের দিকে চেয়ে দেখছেন হালকা মেঘের রুমালে চোখ বেঁধে তারাদের কানামাছি খেলা। আশ্চর্য এই, দুরন্ত শিশু যেমন মাকে ঠেলে দেয়, কলকাতা তেমনি দূরে সরিয়ে দিয়েছে আকাশকে, তবু পর করে দিতে পারেনি। ছেলে ঘুমলে মা চুপে চুপে হাত বুলিয়ে দেন তার কপালে, শহরটা ঘুমলে আকাশও রোজ চুপি চুপি নেমে আসে নিচে, অতল কোমল ক্ষমা দিয়ে মূঢ় শিশুটিকে ঢেকে দেয়।

১৩

পরদিন নীরদ সকালে উঠে অতসীকে বললেন, 'সুধাকে আমি নিয়ে যেতে চাই।'

অতসী অবাক হয়ে বলল, 'ওমা, কেন?'

নীরদ মাথা চুলকে ইতস্তত করে বললেন, 'ওর মার ইয়ে শরীরটা ভাল না।

'তাতে সুধা গিয়ে কী করবে। হাঁড়ি ঠেলবে? কেন, আপনি হাতা-খুন্তি ধরতে পারেন না? আপনারই তো ধরা উচিত। দায়িত্ব যখন আপনার, দায়ও আপনার।'

নীরদ শুধু মাথা চুলকোতে লাগলেন, অতসীকে বাধা দিলেন না, শেষে অতসী নিজেই এক সময় শ্রান্ত হয়ে বলল, 'বেশ যান নিয়ে। এখানে মানুষ হচ্ছিল, ওখানে গিয়ে ফের তো জংলী, অসভ্য হবে।'

জংলী, অসভ্য কথা দুটোয় নীরদ আঘাত পেলেন, তবু প্রতিবাদ করলেন না। অত্যন্ত সঙ্কুচিত কণ্ঠে বললেন, 'আবার তো ফিরে আসবে। এই—এই বিপদটা কেটে গেলেই আবার পাঠিয়ে দেব।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন চুক্তিপত্রে সই করে দিচ্ছে, অতসী এমন মুখভঙ্গী করল। গম্ভীর গলায় বলল, 'বেশ।'

নীরদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মাথার তালু চাপড়ে তেল দিতে লাগলেন। এখনও এখানকার সব কাজ মেটেনি, আজ একবার বটতলাতেও যেতে হবে। যদি খাতাটার একটা গতি করা যায়। যাক, সেসব তো পরের কথা, আপাতত তাঁর মেয়েকে যে ফেরত পাচ্ছেন, এই ঢের। মেয়ে তাঁর, তবু এখানে তাঁর জোর নেই। এখানকার মাটিতে পা দিয়ে তাঁর নিজেরই ভরসা নেই, মাঝে মাঝে জুতো দিয়ে ঠোকর দিয়ে ঠাহর করতে হয়, ঠিক আছে কি

না। ইঁদুর যেমন খুঁড়ে খুঁড়ে সুড়ঙ্গ তৈরী করে মাটির নিচে, এই শহরের মানুষও তেমনি গর্ত করে ফোপরা করে ফেলেছে সবটা, এখানকার পীচ বাঁধান রাস্তায় হাতী চলতে পারে না, নীরদ এরকম একটা কথা শুনেছিলেন।

একবার গাঁয়ের মাটিতে পা দিলে নিশ্চিন্ত। টানাটানির সংসার, সুধাকে নিয়ে গেলে হয়ত আরও একটু কষ্ট হবে। হ'ক। তবু তাঁরই মেয়ে, দায়িত্ব যেমন তাঁর, দায়ও তাঁর। অতসী ঠিকই বলেছে। সুধাকে নীরদ আর ফিরে আসতে দেবেন না।

নীরদ বেরিয়ে গেলেন প্রথম, খাতা বগলে নিয়ে, তার অল্প পরে গেল অতসী। শশাঙ্ক বাজারে বেরিয়েছে কোন্ ভোরে, এখনও ফেরার নাম নেই, দিদিমা রান্নাঘরে।

এই সুযোগে সুধা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। দুটো বাড়ির মাঝখানে যেখানে নারকেল গাছটার শিকড়, সারা দিন আবর্জনা আর ছাই জমা হয়, কাক আর কুকুরে কাড়াকাড়ি করে বাসি খাবার ঠুকরে ঠুকরে খায়, সেখানে পৌঁছে সুধা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল। অন্যদিন নাকে আঙুল দিয়ে এক লাফে ডিঙিয়ে যেত, দম ছাড়ত একেবারে নূপুরদের দরজায় পৌঁছে, আজ সুধার পা সরল না।

আজই শেষ। কাল তো সুধা এখানে থাকবে না। এমন সময় সে হয়ত পাড়ি দিয়েছে রেলগাড়ি চড়ে, অনেক দূরে পৌঁছে গেছে। শরীরের ভিতর পচাগলা নাড়িভুঁড়ির মত এই গলি, অহরহ শুধু টকটক, তীব্র একটা গন্ধ ছড়ায়। তবু সুধার বমি এল না, বুক ভরে আঘ্রাণ নিল একবার, হাত বাড়িয়ে ছুঁতে চেষ্টা করল নারকেল গাছটার গুঁড়ি। যে-শহরটাকে সে ভালবাসেনি, যে-শহরটা তাকে ভালবাসেনি, তাকেই ছেড়ে যেতে, কে বলবে, সুধার এই বুক-টনটন ব্যাথা কেন।

এতদিনের মধ্যে সুধা প্রথম নূপুরের মার মুখোমুখি পড়ে গেল। লাল টকটকে শাড়ি, সিল্কের। ময়ূরপাখা রঙ ব্লাউজের হাতা, মাথায় ছোট ঘোমটা। সুধা জড়সড় হয়ে গেল, নিচু ভীতু গলায় বলল, 'নূপুর ?'

'তুমি বুঝি নূপুরের বন্ধু? এস, ভিতরে এস।'

ডাক্তার চৌধুরীকেও সুধা সেদিন প্রথম দেখল।

সিঁড়ির পাশেই নূপুরদের বসবার ঘর, রোজ সুধা সেখানে বন্ধ দেখেছে, আজ দেখল খোলা। মাথার উপর পুরোদম একটা পাখা ঘুরছে, অর্ধশয়ান ভদ্রলোকটির হাতে ইংরেজি কাগজ, মুখে চুরুট, পুরুফ্রেম চশমায় ঢাকা চোখে ভ্রূকুটি কৌতূহলের চেয়ে বেশি বিরক্তি। সন্দেহ নেই, ইনিই ডাক্তার চৌধুরী। সামনে ছোট্ট একটা টুলে উল আর কাঁটা। ইনি নিশ্চয় বুনছিলেন না, তবে কে। নূপুরের মা-ই বুঝি তবে। সোফায় পাশাপাশি বসে দুজনে গল্প করছিলেন, একজনের ছল উলবোনা, আরেকজনের ছুতো কাগজপড়া, সুধা এসে পড়াতে নূপুরের মা উঠে গেছেন, ডাক্তারবাবু ঈষৎ বিরক্ত, কাগজটা নাড়াচাড়া করছেন।

'ওপরে যাও, নূপুর আছে।'

এই ঘরটার ঠিক উপরেরটাই নূপুরের।

সেই ঘরে ঢুকতে গিয়ে সুধার আরেকটা ধাক্কা লাগল। মেজের ওপর কান পেতে শুয়ে আছে নূপুর, সুধা যে চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়েছে, টের পায়নি। শীর্ণজানু, চলচ্ছক্তিহীন যে মেয়েটা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না, অহরহ শুয়ে শুয়ে সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে খোনা গলায় নালিশ জানায়, সে আজ কেন নিচে নেমেছে—তার চেয়ে কী করে নেমেছে, ভেবেই সুধার বেশ অবাক লাগল।

হঠাৎ, নূপুর বুঝি টের পেল, ঘরে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। ধড়ফড় করে উঠে বসল, হাঁটু গুটিয়ে পায়ের আঙুল পর্যন্ত ফ্রক টেনে দিল। বিব্রত, অপ্রতিভ মুখে বলল, 'এস। কতক্ষণ এসেছ?'

'এখখুনি।'

'নিচে দিয়ে এলে?' আসবার আর কোন পথ নেই, তবু নূপুর জিজ্ঞাসা করল। —'মা'র সঙ্গে দেখা হল? ডাক্তারটা এখনও আছে, না গেছে?'

'আছে,' সুধা বলল, 'তুমি নিচে নেমেছ যে?'

'এমনি।' অসহায় শিশুর মত দু-হাত বাড়িয়ে দিয়ে নূপুর বলল, 'আমাকে

কোলে তুলে ফের বিছানায় উঠিয়ে দেবে ভাই? শরীরটা কেমন অবশ হয়ে গেছে, নড়তে পারছি না।'

সুধা মনে মনে বলল, নেমেছিলে কী করে, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করল না, দু-হাত দিয়ে নূপুরকে সন্তর্পণে তুলে ধরল। ওর কাঁধে মাথা রেখে নূপুর সুধার কান নামিয়ে আনল ওর মুখের কাছাকাছি, ফিসফিস করে বলল, 'মিছিমিছি নামিনি ভাই, ওদের কথা শোনা যায় কিনা পরখ করে দেখছিলুম। তুমি কিছু শুনতে পেলে?'

সুধার হাঁটু দুটো থরথর করে কাঁপছে, নূপুর বয়সের তুলনায় এত হালকা, তবু কপাল ঘামে ভেসে গেছে। বিছানায় এলিয়ে পড়ে নূপুর বলল, 'এটুকুতেই হাঁপিয়ে পড়েছ ভাই, অথচ নিশীথ আমাকে—' একটা বালিশের কোণে দাঁত বসিয়ে নূপুর দম নিল, তারপর কথাটাকে সম্পূর্ণ করল, 'পাখির মত তুলতে পারে, বলের মত লুফতে পারে।'

সুধাও বসল বিছানায়, জামার হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

নূপুর বলে গেল, 'আমি যে সব কিছু টের পেয়েছি, মা কী করে সেটা জেনে গেছে। আজকাল তাই ওরা আর ওপরের ঘরে বসে না, নিচের ঘরেই ওদের আড্ডা হয়েছে। হক, আমার কী। আমার পথ ঠিকই আছে। শুধু ভয়—'

নূপুর হঠাৎ থেমে গেল. নীরক্ত-নীল চোখ দুটিতে সুধা আতঙ্কের ছায়া স্পষ্ট দেখতে পেল।

'কিসের ভয় তোমার নূপুর?' আরও কাছে সরে এসে সুধা জিজ্ঞাসা করল।

'আমি তো ওদের পথের কাঁটা হয়ে আছি. আমাকে ওরা মেরে ফেলতে পারে। ধর, খাবারে বিষ মিশিয়ে, কিংবা ওষুধে,—পারে না?'

'দুর, মা কি তা কখনো পারে!'

আতঙ্কে-হিম গলায় নূপুর বলল, 'পারে, পারে। অমন মা সব পারে। ভালবাসার জন্যে মানুষ না পারে, এমন কাজ নেই। আমি বইয়ে পড়েছি।' হঠাৎ নূপুর যেন হিংস্র হয়ে উঠল, ভয় মুছে গেল নীল নিষ্প্রভ মুখ থেকে, বলে

উঠল, 'আমি পারি না? সুযোগ পেলে আমিও পারি ওর খাবারে বিষ মেশাতে। শুধু নিশীথ আমাকে একবার মুখের কথা দিক।' আবার দেখতে দেখতে নূপুরের কণ্ঠ থেকে নিষ্ঠুরতা মিলিয়ে গেল, আকুল, ঝরঝর কেঁদে ফেলল। —'কিন্তু ওরা আমার সঙ্গে এমন শত্রুতা কেন করছে সুধা, কেন আমাকে পুরোপুরি মানুষ হতে দিচ্ছে না। ওদের সুখের অন্তরায় হয়েছি বলে? কিন্তু একবার আমাকে মুখ ফুটে সব কথা কেন বলেনি মা, লুকুতে গিয়ে ঘা আরও দগদগ করে তুলল কেন? আমি তো বাধা দিতুম না। এখন যদি বলে—এখনও যদি সুবিধা পাই, ডাক্তারবাবুর পা দু'খানা ধরে বলি, আমাকে সারিয়ে দিন। যা চান তা পেতে আমাকে চিরকাল খোঁড়া করে রাখবার দরকার নেই। নিজেরা সব কিছু পাবেন বলে আমাকে সব কিছু সাধ থেকে বঞ্চিত করবেন না। এই ভুল চিকিৎসার লুকোচুরি ঘুচিয়ে দিন—দোহাই আপনার ডাক্তারবাবু।' উপুড় হয়ে নূপুর সুধারই পা দু'খানা চেপে ধরেছে, সুধার শরীর আড়ষ্ট অসাড় হয়ে উঠেছে, কিন্তু পা দু'খানা টেনে নিতে পারছে না।

অনেকক্ষণ পর সুধা নিচে নেমে এল। সিঁড়ির মুখ থেকেই পা কাঁপছিল, কী জানি আবার যদি মুখোমুখি পড়ে যায় নূপুরের মার। মাঝামাঝি পর্যন্ত নেমে এসে উঁকি দিয়ে দেখল বাইরে কেউ নেই; দরজা বন্ধ, বোধ হয় ভিতর থেকে ভেজান। বাকী ধাপ কটাও সুধা চোখ বুঁজে দম বন্ধ করে নেমে এল, আর দু' পা গেলেই সদর দরজা, তবু সুধা দাঁড়িয়ে গেল সেখানে। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, তার পর তার মনের মধ্যেই কে যেন ছি-ছি করে উঠল। এর নাম তো আড়িপাতা। না বলে পরের জিনিস নেওয়া যেমন চুরি, না বলে পরের কথা শোনা তেমনি আড়ি।

তা ছাড়া, ওরা যদি বেরিয়ে পড়ে এখুনি, দরজা খুলেই দেখতে পাবে সুধাকে। কী করবে সুধা তখন। মাথা নিচু করেও পালাবার পথ পাবে না। তার চেয়ে এই ভাল, এখনও দরজা বন্ধ আছে, এখনও সুধা সরে পড়ুক।

'এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ সুধা?'

চমকে তাকিয়ে সুধা দেখল নিশীথ। কড়কড়ে পাতলুন, পাতলা কামিজ, মণিবন্ধে ঘড়ি।

'আপনি এখন?'

'আমি তো ডাক্তার। রুগীর বাড়ি আসতে ডাক্তারের আবার ক্ষণ লাগে নাকি! আরেকজন ডাক্তারকে দেখনি, তিনি তো সিনিয়র, তবু সর্বক্ষণই আছেন?'

ঠোঁটে আঙুল রেখে সুধা ইশারায় ভেজান দরজাটা দেখিয়ে দিলে।

হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে নিশীথ হেসে বলল, 'নেই। এখুনই দু'জনে হাওয়া-গাড়ি করে চলে গেছেন, টের পাওনি। উঁকি দিয়ে দেখ, এখনও রাস্তায় ধোঁয়া আর পেট্রলের গন্ধ পাবে।'

'আমি বাড়ি যাব নিশীথবাবু।'

'যাবেই তো।' উদাস গলায় নিশীথ বলল, 'হে ভবেশ, হে শঙ্কর, সবারে দিয়েছ ঘর, আমাকে দিয়েছ শুধু পথ। আমিও বেশি দিন পথে পথে ঘুরব না সুধা। ঘর একটা পাবই, কী বল?'

'জানি না, পথ ছাড়ুন।'

নিশীথের মুখ থেকে পরিহাসের মুখোসটা খসে পড়ল। আহত স্বরে বলল, 'কিন্তু আমি যে তোমার সঙ্গেই দেখা করতে এলাম সুধা।'

'মিথ্যে কথা। আপনি নূপুরের কাছে—। আপনি নূপুরকে ইঞ্জেকসন দিতে এসেছেন।'

পকেটে হাত দিয়ে নিশীথ সিগারেটের প্যাকেটটা খুঁজল। একটা বের করে কী ভেবে সেটা আবার রেখে দিল। বলল, 'মিছে কথা। আমি এসেছিলাম তোমার কাছে। প্রমাণ চাও? তুমি আজকালের মধ্যেই চলে যাবে এখান থেকে, ঠিক কি না।'

চলে যাবার কথাতে সুধার বুকের অন্তস্তল অবধি শিউরে উঠল, এই নোংরা অন্ধকার দুর্গন্ধ শহরটাকে ঘৃণাই করেছে, তবু সে কী করে অলক্ষ্যে এত আপন হয়ে গেছে নিজেই টের পায়নি। মুগ্ধ, আচ্ছন্ন কণ্ঠে সুধা বলল, 'ঠিক।'

'আর আসবে না?'

প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করবার সময় নিশীথ সুধার হাত স্পর্শ করেছিল, সুধার পা টলে উঠল, গাঁয়ে কাঁটা দিল। একবার বলে বলল, 'না।' আবার তাড়াতাড়ি শুধরে বলল, 'ক'দিন পরেই ফিরব।'

'এবারকার মত এই শেষ দেখা আমাদের?'

মাথা নিচু করে সুধা বলল, 'হ্যাঁ।'

ওর হাত ছেড়ে দিয়ে নিশীথ বলল, 'এই আমার কার্ড, সুধা। ঠিকানা লেখা আছে। যদি কখনও কোন প্রয়োজন হয়, চিঠি দিও।'

ছাড়া পাবার জন্যে সুধা তখন সব কিছু কবুল করতে পারে। বলল, 'আচ্ছা।'

নিশীথ সঙ্গে সঙ্গে ওদের বাড়ির দরজা অবধি এল। চৌকাঠে পা দিয়ে সুধা পিছন ফিরে চাইল একবার, তারপর নিমিষে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

নিশীথও চলতে শুরু করেছিল। দাঁড়িয়ে থেকে লক্ষ্য করলে দেখতে পেত, সুধা চলে যায়নি, দরজার আড়ালে থেকে কবজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছে ওকেই। কোথায় যায় নিশীথ, ফের নূপুরদের বাড়ির পথ ধরে কি না। নির্লজ্জ, দুঃসাহসী যে লোকটাকে সুধা পছন্দ করে না, যার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেই বাঁচে, সেও যেন স্পর্শের রোমাঞ্চ দিয়ে সম্মোহিত করেছে সুধাকে, আর আশ্চর্য, সব সুখ বঞ্চিত যে মেয়েটা পাশের বাড়ি দিনরাত বিছানায় পড়ে পড়ে ককায়, তাকেও সুধার বিচিত্র, অনাসক্ত একটা সুখের শরিক হিসাবে হিংসা।

১৪

কয়লাগুঁড়ো আর আলকাতরাঢালা সাপ-পিছল পথ এঁকেবেঁকে মিলিয়ে গেল, অনেক দূরে ঘোলাজল গঙ্গা একবার দেখা দিয়েই চকিতে অন্তর্হিত, বৈদ্যুতী তারে তারে ফাঁসলাগান কলকাতা ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ছে। তবু আকাশে বাতাসে যারা ধোঁয়ার কালিতে শহরের কলঙ্ক রটায় সেই চিমনিগুলো অনেক দূর পর্যন্ত এল সঙ্গে সঙ্গে।

গাড়ির জানালায় বসে সুধা তন্ময় হয়ে দেখছে।

নীরদ বললেন, 'চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়বে, মুখ ফিরিয়ে ব'স।'

মুখ ফেরাবে কি, সে-কথা সুধার কানেই গেল না।

লাইনের বেড়ি পরান চাকাগুলো দু'পায়ে সব থেঁৎলে ছিটকে বেরিয়ে পড়তে চায়, পারে না, ক্ষুব্ধ রোষে দাঁতে দাঁত ঘষে, শিকলে শিকলে ঝনঝন শব্দ, কামরাটা বারে বারে দুলে যায়, সুধা কেঁপে ওঠে, তবু সরে না। এই অস্থির, অনিশ্চিত উন্মত্ততার মধ্যে তার চুপচাপ বসে থাকাই তো বিচিত্র। গুম গুম শব্দ হল একবার, গাড়ি একটা ছোট পুল পার হল বুঝি।

নীরদ আবার বললেন, 'সরে বস।' সুধা তবু জানালাটা আঁকড়ে বসে রইল। একটু আগেও তো এমন অস্থিরতা ছিল না। শেয়ালদা ইস্টিসনের দমবন্ধ ছাউনির নিচে এই গাড়িটাই কেমন নির্জীব শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কত লোকের ঠেলাঠেলি ভিড়, উর্দিপড়া কুলিগুলোর মাল নিয়ে ছুটোছুটি, বিদায় দেওয়া-নেওয়া, ছলছল চোখ ফিরিওয়ালা, আপেল, আঙুর, গরম চা, খবরের কাগজ (কী খবর আছে আজ)। পূর্ণিমার চাঁদের মত বড় ঘড়িটার কাঁটা টক টক সরে যাচ্ছে। চলি তা হলে, এখনই, আর একটু দাঁড়াও, এখনও পাঁচ মিনিট বাকি আবার কবে দেখা হবে? পুজোয়? না ক্রিসমাসে। সে তো ঢের দেরি।

আবার কবে দেখা হবে। জানালার পাশে বসে ম্রিয়মান আলোয় সুধা শিয়ালদা স্টেশনটাকেই যেন মনে মনে প্রশ্ন করল।

জবাব দেবে ইস্টিসনটার সে সময় কই। এই তো গার্ড বাবুকে দেখা গেল, হাতে নিশান, রেলের আরেকজন লোককে কী যেন বললেন, তার পর বাঁশী বাজালেন। ইঞ্জিন থেকে তার তীব্র, তীক্ষ্ণ প্রতিধ্বনি এল; কামরাটা দুলে উঠল, গাড়ি এবার চলবে।

সেই থেকে নীরদ বলছেন, সরে বস।

টিনের ছাতে লটকানো পাখাটা যেন আরও জোরে জোরে ঘুরতে শুরু করল, বৈদ্যুতিক আলোগুলো দপ দপ কেঁপে উঠল, একটা কুলি ছুটছে সঙ্গে সঙ্গে, ভাগো, নেহি আউর আঠ আগ্নি দিজিয়ে, তব্ চার—কমসে কম চার—, গিয়ে চিঠি দিও, দেব।

যে মুহূর্তে ছাউনির বাইরে এল অমনি বিকট উল্লাসে শিষ দিয়ে উঠল গাড়িটা, এইবার ছাড়া পেয়েছে, উর্ধ্বশ্বাস, উধাও গতি এইবার।

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কামরাটা কঠিন হয়ে গেল, সুধা সরে বস, নীরদ আবার বললেন।

একটা অন্ধ গান শুরু করেছিল, সে-গান কেউ শুনল কেউ শুনল না, কেউ পয়সা দিল, কেউ দিল না। সেই অবসরে কলকাতা মুছে গেল একেবারে।

কিশোরের ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণ রেখার মত লাইনের দু'ধারে শ্যামচিহ্ন ফুটছে একটু একটু করে, পানা পুকুর একটি দুটি, কাপড় কাচা ভুলে গিয়ে ধোবার ক'টি ছেলে গাড়িটার দিকে নির্নিমেষ চেয়ে আছে। টেলিগ্রাফের খুঁটি ছেড়ে একটা মাছরাঙা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, গাড়িটাও ঝাঁপিয়ে পড়বে নাকি পিছনে পিছনে, বাধা পেল, আবার শোনা গেল দাঁতে দাঁতে রুষ্ট ঠোকাঠুকি, শিকলে শিকলে ঝনঝন, কামরা দুলে উঠল। অনেকক্ষণ পরে সুধা বুঝি টের পেল এই দোলানিরও একটা ছন্দ আছে, অস্থিরতাও নিয়ম মেনে চলে। এক দুই তিন চার, এক দুই তিন চার, ডাইনে বাঁয়ে, ডাইনে বাঁয়ে। এক দুই…এক দুই… গুণতে গুণতে সুধা ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভেঙে দেখল বেলা গড়িয়ে এসেছে, পড়ন্ত সূর্যের আলো জানালা দিয়ে সোজাসুজি ওর মুখে এসেছে। বাইরে সেই এক দৃশ্য, মাঠের পর মাঠ, মাঠের শেষে বন, মাঝে মাঝে বিল, কাঁটা ঝোপ, খেজুর-বাবলা গাছ। সকালে ভাল লাগছিল, এ বেলা সুধা বিরক্ত হয়ে উঠল। স্নান হয়নি, রুক্ষ চুলগুলো বাতাসে উড়ছে, মুখটা কেমন ঘাম-চিটচিটে, জামা-কাপড় গুঁড়ো গুঁড়ো কালিতে ভরে গেছে। নীরদকে সুধা জিজ্ঞাসা করল, 'আর কত দেরি বাবা।'

নীরদ ঢুলতে শুরু করেছিলেন, সচকিত হয়ে তাকালেন বাইরে। টেলিগ্রাফের খুঁটিতে মাইলের অঙ্ক পড়লেন। 'তাই তো আর বেশি বাকী নেই রে। একশো চল্লিশ মাইল চলছে, আর খানিকটা গেলেই পৌঁছে যাব। একটা মোটে স্টেশন আছে মাঝখানে।'

একশো চল্লিশ মাইল! সুধা সংখ্যাটা মনে মনে অনুভব করতে চেষ্টা করল। তার যত বয়স তাকে যদি মাসের হিসাবে ফেলা যায়, তারপর টেনে নিয়ে যাওয়া যায় এই সমান্তর দুটি লাইনের উপর দিয়ে, তবে হয়ত এই দূরত্বের একটা কিনারা পাওয়া যাবে। এত পিছনে ফেলে এসেছে কলকাতাকে, মাত্র এই ক' ঘণ্টায়? ভাবতেও অবাক লাগল। এই তো, এক্ষুণি ছিল সেই নিরাকাশ রুদ্ধশ্বাস শহরটায়, রুগ্ন দেহে প্রস্ফুট নীল শিরার মত যার সারা গায়ে সরু সরু গলি, তার একটা গলির এপারে থাকে খিটখিটে মা নিয়ে তরুণী এক মাস্টারনী, ওপারে অহরহ বিছানায় শুয়ে কামনাতুর, পঙ্গু একটা মেয়ে ছটফট করে। পরিপূর্ণ হয়ে বেঁচে থাকার লালসা তার, কিন্তু শক্তি নেই, জীবনের পাত্রে চুমুক দিতে পারেনি, লোলুপ জিহ্বা দিয়ে পেয়ালার চারপাশ শুধু লেহন করছে। তার শরীরের অর্ধেকটা জর্জর করে রেখেছে মা আর প্রৌঢ় এক ডাক্তার মিলে, তার মনটাকে লুব্ধ করেছে ছোকরা এক ডাক্তার, বিকৃত, বিচিত্র সুখের স্পর্শ দিয়ে।

ছায়াছবির মত সুধার মনে ভেসে উঠল ছবি, একটার পর একটা, অসংলগ্ন, তবু স্পষ্ট। মাথার নিচে বালিশের স্তুপ, আধশোয়া নূপুর, বুক অবধি চাদরে ঢাকা, দু'পাশে বই ছড়ান, আলমারীতে থাকে থাকে সাজান পুতুল, পরম

আগ্রহে নূপুর সেগুলো ধরতে গেল, পরমুহূর্তে কী গভীর বিরাগে ফেলে দিল সব। ছড়িয়ে দিল বই, পুতুল ভাঙল, ক্ষোভে রোষে ঘৃণায় নূপুর অস্ফুট গলায় বলে উঠল, রক্ত নেই, মাংস নেই, এ-নিয়ে কী করব। রক্ত। মাংস। ধীরে ধীরে নূপুর শব্দ দুটি উচ্চারণ করল, প্রতি অক্ষরে যতি দিয়ে দিয়ে। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে ঝরঝর কেঁদে ফেলল।

সেই দু'হাত নূপুর সরাল যখন, সুধা দেখতে পেল নূপুরের মাকে। দরজা ভেজান, মাথার উপর বনবন পাখা, ডাক্তার চৌধুরী, ফিসফিস গল্প। ডাক্তার চৌধুরীকেও দেখল সুধা, ভিজে গলি, আধ-অন্ধকার, টিপ টিপ বৃষ্টি, এক হাত স্টিয়ারিংয়ে, আর এক হাত—না, নূপুরের মা সে-গাড়িতে ছিল কিনা সুধার ভাল মনে নেই। মিছিলের মত সবাই এল একে একে, নিশীথ, চকোলেটের বাক্স, ইঞ্জেকসনের সিরিঞ্জ। জাহাজের মাস্তুলের আলো, ভুতুড়ে কেল্লা, রাত এক প্রহর, পাশে নিঃশব্দ ফুলমাসি। আর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠল হাসপাতালের একটা ছবি, সারি সারি বেড, ধবধবে চাদর, কড়া ওষুধের ঝিম-ধরান গন্ধ, নীলু মামা। কী রোগা হয়ে গেছে নীলু মামা, হাসতে গেলে গালের গর্ত দুটিই গভীর হয় আর একটু, চোখের কোলের কালি আরও স্পষ্ট করে ধরা পরে, তবু নীলু মামা হাসল, লজ্জিত, ত্রস্ত, মৃত্যুভয়বিবর্ণ। হাত দুটি প্রসারিত করে বলল, Out damned spot, out I say,···all the perfumes of Arabia—তার পরেরটুকু তোমার মনে আছে, অতসী? কোথায় ছিলেন আদিত্য মজুমদার, সামনে এসে সব কিছু আড়াল করে দাঁড়ালেন। গৌর বর্ণ, দীর্ঘ দেহ, সর্বশুক্ল। মুখে শিশু হাসি কিন্তু সেই হাসির শুভ্র উত্তরীয়ের প্রান্তে ক্রূরতার আঁকাবাঁকা কাল পাড়। সব শেষে এলেন নীরদ, ময়লা কামিজ, হাঁটু অবধি ধুলো, কিন্তু সঙ্কোচ নেই, ফুলমাসি বা ছোটমামার শ্লেষে ভ্রূক্ষেপ নেই, অধীর, তীব্র, গভীর বিশ্বাসে বলে উঠলেন, তোমরা ভাল বলছ শহরকে? ভালবেসে কেউ এখানে আসে না, আসে খাবারের লোভে, বেঁচে থাকার তাড়ায়। কুকুর আস্তাকুড়ে মুখ দেয় দেখনি? এও, তেমনি।

ধীরে ধীরে গাড়ির গতি মন্দ হয়ে এল, দোলানি কমল, তারপর হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেন একেবারে থামল।

নীরদ বললেন 'আয় সুধা, এখানে নামি।'

তোরংটা কাঁধে নিয়েছেন নীরদ, বিছানা বগলে। নিচে নেমে সুধা বলল 'একটা কুলি নিলে হত না বাবা?'

নীরদ হেসে উঠলেস।—'তুই একেবারে শহুরে হয়ে গেছিস সুধা, এটুকু তো মোটে পথ। কুলি নিয়ে করব কী। অন্ধকার হয়ে এসেছে, তুই শুধু সাবধানে আমার পিছে পিছে আয়।'

স্টেশনটা হল সদর। এখানে ইস্কুল, কাচারী, গঞ্জ। সুধাদের গ্রাম আরও ক্রোশ দুই। সন্ধ্যা হয়নি, তবু চারদিক এরই মধ্যে স্তব্ধ হয়ে এসেছে। যাত্রী বলতে সুধারা দু'জনেই। যার হাতে নীরদ টিকিট দিলেন সে নমস্কার করে বলল, 'আজ ফিরলেন? খবর সব ভাল?'

নীরদের দু'হাত জোড়া, প্রতিনমস্কার করতে পারলেন না, মাথাটা নোয়ালেন একবার। বললে, 'ভাল। আপনাদের?'

লোকটি বললে, 'চলে যাচ্ছে।'

এ-আলাপের কোন উদ্দেশ্য নেই, না খবর দেওয়া, না নেওয়া, তবু গ্রামাঞ্চলের রীতি এই। দেখা হলে মুখ ফেরান পাশ কাটান নেই, কথা থাকুক বা না থাকুক, একটু দাঁড়িয়ে যাবেই, দু'চার কথা হবেই। শহুরে মানুষ হলে শুধু চোখে হেসে কাজ সারত।

ছাউনির বাইরে একটা লোক নীরদকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। নীরদ বললেন, 'কে, বিপিন? এখানে?'

লম্বা বাব্‌রি লোকটার, পাঞ্জাবীর বোতাম বাঁ ধারে। হাত বাড়িয়ে বললে, 'দিন, আমাকে দিন।'

নীরদ কুলি করতে রাজী হননি, কিন্তু এই লোকটার হাতে অনায়াসে বিছানা বাক্স সমর্পণ করলেন।

বিপিন যেতে যেতে বলল, 'এখানে গানের বায়না নিয়ে এসেছি যে।

বাজারে কী মস্ত তেরপল পড়েছে, একবার দেখে আসবেন স্যার। ছ'টা ডে-লাইট ভাড়া করেছে।'

নীরদের চোখের মণি লুব্ধ হয়ে উঠল। বল কী ছটা?

স্টেশনের বাইরে একটা মিঠাইয়ের দোকানে গিয়ে ওরা বসল। নীরদ সুধাকে বললেন, 'একটু খেয়ে নে। তারপরে বিপিন, সব খবর বল। আমাকে বাদ দিয়েই তবে তোমরা বায়না নিলে?'

বিপিন জিভ্ কেটে বলল, 'ছি ছি। হঠাৎ পাওয়া গেল। আপনার জন্যে বাবু তো কলকাতা তার করে দেবার কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু ঠিকানা জানা নেই—'

তার করে দেবার কথা উঠেছিল, এতেই নীরদ খুশী। আর জেরা করলেন না। বললেন, 'কী, কী পালা করবে বল।'

পদ্মপাতায় ক'রে মিস্টি দিয়ে গেল একটা লোক. সুধা ঘাড় গুঁজে খেতে লাগল। একটু একটু করে ভাঙে, খায়, এদিক ওদিক চায়। বাবার সঙ্গে যে লোকটা গল্প করছে, সে একসঙ্গেই দুটো মিষ্টি মুখে পুরে দিল, ঢক ঢক জল খেয়ে নিল এক গ্লাস। দেখাদেখি নীরদও তাই করলেন।

পারল না শুধু সুধা। ফুলমাসিদের বাড়ি এত তাড়াতাড়ি কেউ খায় না, ধীরে ধীরে গ্রাস তোলা নিয়ম। একটু খাবে, একটু পাতে পড়ে থাকবে, তার নাম খাওয়া।

তা ছাড়া রুচিও বিগড়ে গেছে। একটু দূরেই একটা গনগনে বড় উনুন, একটা লোক কড়ায় কী জ্বাল দিচ্ছে, তার সর্বাঙ্গে দরদর ঘাম, কোমরে জড়ান গামছায় নামমাত্র হাত মুছে আরও দুটো করে মিষ্টি দিয়ে গেল ওদের পাতে।

সুধা হাত গুটিয়ে বসে রইল।

বিপিন বলল, 'কী হল খুকি?'

সুধা জবাব দিল না। নীরদ লজ্জিতকণ্ঠে বললেন, 'মেয়ে আমার খুঁতখুঁতে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নে সুধা, বাড়ি যেতে রাত হয়ে যাবে।'

ওদের গ্রাম আরও দুই ক্রোশ।

বিপিন একটু পরে নমস্কার করে বিদায় নিল। নীরদ গরুর গাড়ির ছইয়ের ভিতরে ঢুকেই টান টান হয়ে শুয়ে পড়লেন, চোখ দুটি সঙ্গে সঙ্গে আধবোঁজা হয়ে গেল। গুনগুন গান শুরু করে দিলেন।

গাড়োয়ান চেনা, সে গরুর লেজে বার দুই মোচড় দিলে, পাচন বাড়ি দিয়ে অনিচ্ছুক পশু দুটোকে তাড়া দিলে, গ্রাম্য মেঠো পথে চাকা গড়াতে শুরু করল।

রামচন্দ্র, সে রাস্তা কি রাস্তা। এখানে খানা ওখানে খন্দ। সুধার চোখেও ঢুলুনি এসেছিল, সে মাঝে মাঝে চমকে উঠতে লাগল। নীরদের ভ্রূক্ষেপ নেই, ফাঁকা মাঠ পেয়ে তিনি গলাটাকে একেবারে বে-রাশ করে দিলেন।

গাড়োয়ান মাঝে মাঝে জিভ দিয়ে চুক চুক একটা শব্দ করে, সে ভাষা শুধু পশু দুটোরই বোধ্য, মাঝে মাঝে বলে, 'আহা-হা। গলাটা আরেকটু ছেড়ে দেন কত্তা। কী মিঠে গলা, আহা-হা।'

সমঝদার পেয়ে নীরদ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

দু'ধারে ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি সবুজ ক্ষেত, দুধটসটসে শীষ, এবার ফসল ভাল হবে। গান হঠাৎ থামিয়ে নীরদ বললেন, 'এবার ফসল ভাল হবে, না রে?' গাড়োয়ান বললে, 'ধান তো ভালই উঠেছে কত্তা, রবিও মন্দ হবে না।' পথে একটা গ্রাম পড়ল, কাঁসি আর শাঁখ বাজিয়ে পুজো হচ্ছে কোথায়, নীরদ বললেন, 'আজ পূর্ণিমা, নারে?'

গাড়োয়ান বললে, 'এজ্ঞে। কত বড় চাঁদ উঠেছে দেখছেন না।'

'রসকদমের মত, না?' নীরদ নিজের উপমায় নিজেই হাসলেন, উৎসাহের ঝোঁকে বললেন, 'তুই খুকিকে নিয়ে এগো দিকিনি, আমি পাশে পাশে হেঁটে যাব।'

গাড়োয়ান হাঁ হাঁ করে উঠল। 'অমন কাজও করবেন না আজ্ঞে। জায়গাটা ভাল নয়।'

'ভাল নয় কি রে। আমার পাশের গাঁ, আমি চিনিনে? কী আছে এখানে, ভূত না প্রেত।'

পাচন বাড়িটাই কপালে ঠেকিয়ে গাড়োয়ান বললে, 'তাঁরাও আছেন,

বিশেষ সামনের ওই পঞ্চবটীতলায়। কিন্তু সেকথা বলিনি। এখানে পরশু একটা লোককে কেটেছিল।'

'কেটেছিল, বলিস কি রে। দা দিয়ে? ডাকাত?'

'আজ্ঞে না। পায়ের কাছে কুটুস করে, রাতে নাম নেবো না, লতা। লোকটা একেবারে নীলবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।'

'ফু: ওসবে আমার ভয় নেই। তুই আমাকে একটা ছোট লাঠি দে, আমি ঠক ঠক করে ঠিক এগিয়ে যাব।'

গাড়োয়ান সেকথা শুনল না, গ্রামের সীমানায় ভাল রাস্তা পেয়েছিল, জোরে গরু দুটোকে হাঁকিয়ে দিল। চাকার মধ্যে লাঠিটাকে গলিয়ে দিয়ে মাঝে মাঝে শব্দ তুলতে লাগল, ফর্‌-র্‌-র।

পঞ্চবটীতলা ছাড়িয়ে গেল, মজে যাওয়া একটা পুকুর পাড়ে বট-অশ্বথ-আমলকী গাছের পাতায় পাতায় অন্ধকার একটা এলাকা, দিনের বেলা গাছের গুঁড়িতে সিঁদুরের দাগ দেখা যায়, রাতে ডালে ডালে কাক শকুনের বাসা থেকে নানা শব্দ ওঠে, লতায় লতায় জটিল ফাঁস, কোটরে কোটরে ছমছমে অন্ধকারের পুঁজি। এই পঞ্চবটীতলা, প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার, ভয়ের শেষ পরিখা, কিন্তু এখনও বড় মজবুত ঘাঁটি।

বিলু, পীতু, মিতুরা সব ঘুমিয়ে পড়েছিল, সুধারা যখন গিয়ে পৌঁছল, তখন একমাত্র মল্লিকা জেগে।

ওদের সাড়া পেয়ে মল্লিকা হারিকেনটা জ্বালল, চিনতে পেরেছে, তবু দরজার আড়াল থেকে উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করল, 'কে?'

নীরদ বললেন, 'দরজা খোল, আমি।'

দরজা খুলে মল্লিকা এক পাশে সরে দাঁড়াল, নীরদ বললেন, 'সুধাকেও নিয়ে এসেছি।'

প্রণাম করবে বলে সুধা মাথা নোয়াল, মল্লিকা নিস্তেজ গলায় বলল, 'ভিতরে আয়।'

একটা ঘটি নিয়ে নীরদ কলতলায় হাত মুখ ধুতে চলে গেলেন, মল্লিকা তখনও-চুপ, একটু দূর থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে মেয়েকে। মাথায় বেশ একটু ঢ্যাঙা, আয়ত কৃষ্ণ চোখ দুটি ঘিরে কালি, এই মেয়েটিকেই কি মল্লিকা মাত্র ক'মাস আগে অতসীর হাতে তুলে দিয়েছিল? সেই বটে, তবু সে নয়, এক হয়েও এ যেন একটু আলাদা। এ-সুধাকে মল্লিকা চেনে না, একান্ত আপন, তবু পর, নাড়ীর সম্পর্ক, তবু কাছে টেনে নিতে কোথায় যেন লজ্জা। বড় হবার লক্ষণ সুধার শরীরে এখনও কুঁড়িমাত্র, তবু চোখের দৃষ্টিতে কী পরিণত প্রশান্তি, মণি দুটো কৌতুক-কৌতূহলে দীপ্ত। মল্লিকা কেমন সঙ্কুচিত হয়ে গেল, সে যেমন করে দেখছে সুধাকে, সুধাও তেমন করে, ওর নতুন পাওয়া সব-বুঝি চোখ দুটি দিয়ে চিরে-ছিঁড়ে দেখছে না তো মল্লিকাকে?

নীরদ ফিরে এসে ঘটিটা সুধার হাতে বাড়িয়ে দিলেন, 'যা হাতমুখ ধুয়ে আয়।'

সুধা নীরবে হাত বাড়িয়ে ঘটিটা নিল, বারান্দায় পা দিতে দিতেই শুনতে পেল নীরদ গান ধরেছেন, বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটিরবাসী। দেখিব বিরহ-বিধুর আননে মিলনমধুর হাসি॥

মল্লিকা চাপা গলায় বলল, 'থাম। মেয়ে বাইরে, তোমার লজ্জা করে না?'

নীরদ অবাক হয়ে বললেন, 'লজ্জা, সুধাকে?'

'করে, করে।' মল্লিকা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমার এই অবস্থা। ওকে নিয়ে না এলেই ভাল করতে।'

নীরদ বললেন, 'এই অবস্থা বলেই তো নিয়ে এলাম। তোমার অসুবিধে হচ্ছিল।'

'আমার অসুবিধে!' মল্লিকা বিষণ্ণ হাসল, 'সে কতই যেন ভাবছ তুমি। এখানে এতগুলো আছে, তাদেরই খেতে পরতে দিতে পারি না, মেয়েটা সুখে ছিল, ওকে আবার এর মধ্যে কেন টেনে আনলে তুমি।'

নীরদ চট করে কোন জবাব দিতে পারলেন না। খানিক পরে প্রসঙ্গ বদল করে বললেন, 'এ-কদিন তোমার কোন অসুবিধা হয়নি তো?'

'থাক। আমার ভাবনা তো তোমার কত!'

৮০

আহত গলায় নীরদ বললেন, 'কেন মল্লিকা, আমি তো মেজ কর্তাকে বলে গিয়েছিলাম। তিনি লোক পাঠিয়ে খোঁজ খবর নেননি?'

বিচিত্র ভঙ্গীতে হাসল মল্লিকা।—'নিয়েছিলেন। লোক পাঠিয়ে খবর নেবেন কেন। তিনি তিন দিন নিজেই এসেছিলেন।'

'তিন দিন এসেছিলেন, মেজ চৌধুরী নিজে?' নীরদ এত অবাক হলেন যে গুনগুন করতেও ভুলে গেলেন। আবার কী জিজ্ঞাসা করতে যাবেন, কিন্তু ঠিক তখনই সুধা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দরজার আড়াল থেকে বলল, 'আমাকে একটা জামা ছুঁড়ে দাও তো মা, গাড়ির এগুলো বদলে ফেলি।'